ভূমিকা

মূল উপন্যাসটি তামিল ভাষাতে লেখা হলেও 'কল্লোল ধ্বনি'কে নিছক তামিল প্রদেশের উপন্যাস বলা যায় না। ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলি এই বইয়ের ঘটনাস্থল। সেদিক দিয়ে একে সর্ব-ভারতীয় উপন্যাস আখ্যা দেওয়াই সমীচীন হবে।

দক্ষিণ ভারতের রাজমপেট্টাই গ্রাম থেকে শুরু করে সুদূর উত্তরাপথ অব্দি এ বইয়ের চরিত্রদের ঘোরাফেরা। তবুও কাহিনীর বিন্যাস কোথাও অগোছালো হয়নি।

উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারত উভয়েই যে এক অখণ্ড ভারতেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ— এ উপন্যাস সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ এ উপন্যাসে ভিড় করে এসেছে, আবার ভাবনাচিন্তা দিয়ে এক সমধর্মিতাকেই প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে।

পরলোকগত 'কল্কি' তাঁর এই উপন্যাসে এক নতুন শৈলী অনুসরণ করেছেন। এ উপন্যাসের নায়ক আর খলনায়ক একই চরিত্র হওয়ায় দ্বিধাগ্রস্থ পাঠক ভেবে স্থির করতে পারেন না যে চরিত্রটিকে তিনি কী দেবেন— রোষ না মমতা। এমনি নানান রঙের নতুন প্রয়োগ-কুশলতায় বইটি সমৃদ্ধ।

উপন্যাসটির আর একটি বৈশিষ্ট্য— ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কয়েকটি বিশেষ অধ্যায় এর আখ্যানভাগে স্থান পেয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে একে ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলা যায়।

মহাত্মা গান্ধীর সম্মোহনী আকর্ষণ কেমন করে দেশের জনমানসকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগযজ্ঞের পথে টেনে নিয়ে এল, এ যুগের ছেলেমেয়েরা এ বই থেকে তার কিছু কিছু আভাস পাবেন। এ উপন্যাস সম্পর্কে লেখক নিজে মন্তব্য করেছেন যে তাঁর সমস্ত রচনার

ভেতরে এই বইটিই গণচিত্তে দীর্ঘস্থায়ী স্বাক্ষর রাখবে। যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে এ উপন্যাস অনায়াস বোধগম্য। তার মানে, অনুবাদে রসহানি ঘটবেনা।

'ওলাই-ওসাই' অর্থাৎ 'কল্লোল ধ্বনি' উপন্যাসের ভূমিকায় স্বয়ং লেখক যা বলেছেন, তার কিছু অংশ এখা'ন উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বরং তাঁর কৌতুকরসঘন লেং'ন ভঙ্গীর রসাস্বাদনের সুযোগ লাভ হবে।

"পুস্তকের শক্তি সম্পর্কে মহাজনদের বিবিধ আপ্তবাক্য আছে। 'পুস্তকম হস্তভূষণম্' উক্তিটি তো বহুল প্রচলিত। আলমারীর অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রেও বই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অভিজ্ঞতায় বলে, অনিদ্রা-রোগের এমন অভ্রান্ত মহৌষধ আর কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। শোনা যায়, বেশি চা-কফি খেলে কারুর কারুর ঘুম ছুটে পালায়। তাঁরা একবার বই হাতে নিয়ে দেখবেন, নিদ্রাদেবী দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরবেন। পুস্তকের মহিমা বর্ণনে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

"বিজ্ঞজনে গ্রন্থপ্রাপ্তির তিনটি চিরাচরিত পন্থার নির্দেশ দেন। ভিক্ষে করা, ধার করা আর চুরি করা। এগুলি ছাড়া আর একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত চতুর্থ পন্থা— পয়সা দিয়ে খরিদ করা। একমাত্র রেল সফরের দীর্ঘ ক্লান্তিকর সময় যাপনের সময় আমাদের নাচার হয়ে এই চতুর্থ পন্থা অবলম্বন করতে হয়। রেলপথের ভ্রমণে অনেকের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ঝাঁকুনিতে অনেকের ঘুম চটে যায়। তাই মনে হয়, হাতে একখানা বই থাকলে সময় কাটত। সেদিক দিয়ে, রেলওয়ে লোকের পাঠাভ্যাসে পরোক্ষে পরিপোষণ যোগায়। সেই কারণেই বড় বড় রেলওয়ে স্টেশনে বই বিক্রির ভাণ্ডার দেখা যায়। গ্রন্থপ্রাপ্তির প্রচলিত তিনটি পন্থা অবলম্বনের সুযোগ রেলযাত্রায় বড় একটা পাওয়া যায় না। অগত্যা চতুর্থ পন্থাই গ্রহণ করতে হয়।

"একবার রেল সফরের সময়ে আমাকেও এমনি বিপদে পড়তে

হয়েছিল। 'ঘুম যখন আসছেনা, তখন একটা বই-ই পড়ে ফেলি' এই ভেবে ত্রিচিরাপল্লী জংশনের বুকস্টলে একটা বই কিনতে গেলাম। দোকানে যত বই ছিল সব কটার ওপর চোখ বুলিয়ে, শেষকালে তিনরঙা ছবিওলা চমকদার একটা বই খুঁজে বার করলাম। বিখ্যাত উড্‌হাউসের বই। উড্‌হাউস্ হলেন কৌতুকরসের বাদশা লেখক। ইংরেজদের বোলচালের ওপর চুটকি লেখায় সিদ্ধহস্ত, পাঠকদের গড়াগড়ি খাওয়ানোয় তার জুড়ি নেই। তার সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্র আর তাদের কাহিনীর জাল বেছানোয় অনন্য পটুত্ব তার স্বভাব ধর্ম। 'হাসি পায় তো বহুত আচ্ছা। নইলে ঘুম তো পাবেই' এইকথা ভেবে আমি পৌনে ছ'টাকা দিয়ে তিনশো পৃষ্ঠার সেই মোটা বই কিনে এনে রেলগাড়ির কামরায় এসে সেঁটে বসলাম। মলাটে ছাপার হরফে লেখা রয়েছে— এ যাবৎ এই বইয়ের সাতাশ লক্ষ তিরিশ হাজার কপি বিক্রী হয়েছে। 'পয়সা দিয়ে কিনে পড়া পাঠকের সংখ্যাই যখন এত, তখন অন্য তিন পন্থার পাঠক সংখ্যা না জানি কত হবে? আহা, ইংরিজি ভাষার লেখকরা কী ভাগ্যবান! তাঁদের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে আমি বইয়ের পাতা ওলটাই। পড়তে গিয়েই আটকে গেলাম। এক প্যারা পড়তেই মনের অস্থিরতা বেড়ে গেল। এক পৃষ্ঠা পুরো করে দুয়ের পাতায় যেতেই চাঞ্চল্য দূর হয়ে গেল। ওহো, এ যে পড়া বই। এহে, পড়া বই কিনে দু'দুবার পয়সা নষ্ট করলাম! ভারী মুখ্যু তো আমি! পৌনে ছ'টা টাকা! নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে আমি বইটা আছড়ে ফেলে দিই। কিন্তু বেচারী বইয়ের কী অপরাধ! বই পড়ে আমার হাসবার কথা। তা নয় উলটে বইটাই আমার রকম সকম দেখে হাসছে। শুধু হাসি নয়। কথাও বলতে থাকে আমায় ডেকে— "খামোখা আমায় আছাড় মারলে কেন দাদা? তুমি তো নিজেও একজন লেখক? তা দেখ, তোমার বই ভুল করে কিনে কেউ যদি আছড়ে ফেলে দেয়, তোমার কী রকম লাগে?"

"এইসব সাতপাঁচ তত্ত্বকথার ঠেলায় ঘুম যা-ও আসছিল, একেবারে

দৌড়ে পালাল, তল্লাটে রইলনা। সময় কাটাবার দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। তখন নিজের পেঁটরা খুলে কাপড় চোপড় নামিয়ে খুঁজতে লাগলাম যদি সময় কাটাবার মতন কিছু মিলে যায়। মিলেও গেল— পেঁটরার একেবারে তলা ঘেঁসে একখণ্ড কম্ব রামায়ণ। বইটা বের করে কম্বরের কবিতায় মন দিলাম। সময় হুহু করে কেটে যেতে লাগল। কিন্তু কাটছে যে তা টেরও পেলাম না।

"হাজার বছর আগে কম্বর এই বই লিখেছেন। আমি নিজে বই-খানি কম করেও একশ বার পড়েছি। তবুও কবিতাগুলো পুরনো হয় না। এ বই ছুঁড়ে ফেলে দেবার কথা মনেও আসে না। যতবার পড়ি ততবারই নতুনত্বের টাটকা স্বাদ পাই। প্রাচীন যুগের মনীষীদের অমর মহাকাব্য আর হাল আমলের সাহিত্যিকদের মরশুমী লেখা আমার চোখে পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যায়।

"কম্বর-পুণ্যস্মৃতি সমারোহে আয়োজিত এক সভায় আমি এই ঘটনার উল্লেখ করেছিলাম। উত্তর ভারতে যেমম তুলসীদাসের হিন্দী রাম চরিত, দক্ষিণেও তেমনি তামিল ভাষায় রামায়ণের প্রণেতা মহাকবি কম্বর। সভাশেষে এক শ্রোতা-প্রবর আমার কাছে এসে বল্লেন— 'আপনি তো মশায় আমাদের সবাইকে একেবারে নিরেট মুখ্যু বলে প্রমাণ করে দিলেন।'

'সে কি কথা, কই আমার তো এমন কথা মনে পড়ছে না। প্রমাণ করা তো আদালতের কম্ম। আমি কি ও রকম ধৃষ্টতা করতে পারি!'— আমি বললাম।

'তা নয়। ব্যাপারটা হল, আমরা তো আপনার বই বেশ যত্ন করেই পড়ি, তারপর সযত্নে তুলেও রাখি। কয়েকখানি বই দু-তিন বার করেও পড়েছি। অথচ আপনি বলছেন আপনার বই একবার পড়ে জঞ্জালে ফেলে দেওয়া উচিত··· ।'

'কী জানেন!'— আমি সতর্ক হই। বলি, 'ওটা আমি বিনয় করে বলেছি। ও কথা ধরবেন না। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে বলুন? বল্লবর বা কম্বর কি বই লেখার সময়ে ভেবেছিলেন যে

তাঁদের বই হাজার হাজার বছর পরেও পড়া হবে? ভাবেন নি। থিয়েটারের বই দরকার বলেই সেক্সপিয়ার নাটক লিখতে বসেছিলেন। দেখুন কী থেকে কী হয়ে গেল। তিনি আজ বিশ্বের চিরঞ্জীব কবি! আবার বার্নাড শ'র কথাই ধরুন না। তিনি তো নিজেকে সেক্সপিয়রের চেয়ে বড় বলে মনে করতেন। অথচ তাঁর মরার পরে কেউ আর তাঁর নামও করে না। তাঁর বাসভবন কিনে স্মৃতিশৌধ করার চেষ্টা হয়েছিল। তাও লোকের তেমন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি বলে সে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বলছি, সাহিত্যিকের জীবদ্দশায় তাঁর কৃতিত্বের সঠিক মূল্যায়ণ হয় না। তাই বলছিলাম, যে···।'

'তবু আপনার কী মনে হয়— আপনার মৃত্যুর পরে আপনার কোন রচনা আপনার নাম রাখতে পারবে?'— শ্রোতা আবার সপ্রশ্ন হলেন— 'ধরুন, একশ বছর পরে···'

আমি বললাম— 'আপনার এ প্রশ্নের উত্তর এখন আমি কী করে দিই? একশ বছর পরে জিজ্ঞেস করবেন, তখন বরং ভেবে চিন্তে বলব।'

"আমি প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু প্রশ্নটা আমার মগজে ঘুরপাক খেতে লাগল এবং মনে তোলপাড় করতে লাগল। কোন নতুন গল্প উপন্যাসে হাত দিতে গেলেই— আমার অমুখ লেখাটা জনচিত্তে কতদিন স্থায়ী হবে, কতবার পড়বার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, ভাবতে গেলে আর লিখতে কলম সরত না। প্রশ্নকর্তা বন্ধুটি যেদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন সেই দিন থেকে নিয়ে এই সেদিন অবধি এই এক চিন্তা আমার ভেতরে তোলপাড় করেছে।

"তামিলে প্রবাদ আছে, কাকও তার নিজের ছানাকে সুন্দর দেখে। নিজের ছেলেকে কানা বলতে কার মন সরে? এ যুক্তি বেশ বোঝা যায়। তা বলে কাককে আমি নির্বোধ ভাবি না। তার ফুলের মতন শ্যামলা রঙা ছানাকে ফেলে সোনার সোনালিপনার কদর করা উচিত— এ যুক্তি আমি মানি না। আমি বরং বলব মানুষই ভ্রান্ত মূল্যবোধে ভোগে। সে-ই তার প্রিয় সন্তানের চেয়ে তুচ্ছ

সোনা হিরাকে বেশি কদর করে। সোনার চেয়ে সন্তানের দাম কম করে ধরে এক মানুষই। উপরোক্ত প্রবাদ একটা সত্যই সিদ্ধ করে যে, পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যেই তার স্বীয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করার একান্ত প্রাকৃতিক গুণ বর্তমান।

"অবিশ্যি এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থকারদের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য, বলা শক্ত। প্রতিটি লেখার ক্ষেত্রেই তার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেটিই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রের ব্যতিক্রম বাদ দিলে, লেখক যদি যত্ন করে তার লেখা পড়েন, তা হলে ঐ ধারণা তার কতদূর বজায় থাকবে তা বলা যায় না।

"আর সব কিছুর মত সাহিত্যস্রষ্টারও উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটে। দেহের বৃদ্ধি রুদ্ধ হবার পরেও মনের বিকাশ রুদ্ধ হয় না, বরং বাড়ে, বুদ্ধির স্ফূরণ হতে থাকে— এই-ই স্বাভাবিক। কাজেই লেখক তার সাত আট বছর আগের লেখা পড়তে গিয়ে তাতে অজস্র ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পাবেই। 'ছি ছি, এ সব কী আবোল তাবোল লিখেছি আমি' ভেবে অনুশোচনা করাও বিচিত্র নয়। এ রকম অনুভূতি আমার নিজেরও বার কয়েক হয়েছে। এ রকম অবস্থায় পড়ে আমি মনকে এই বলে বুঝ দিয়েছি যে সে একটা কাল গেছে, তখনকার লেখা সেই কালের রুচি মাফিক ছিল, আজ লিখলে অন্যরকম করে লিখতাম।

"আবার কখনো কখনো এমন ভাবনাও এসেছে যে, অমুক বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ না বেরোলেই ভাল।

"এই সব সাত সতের ভাবনা আমার আগে থেকেই লেগে ছিল। তারও পর সেই বন্ধুটির প্রশ্ন মনকে আরো মন্থন করতে থাকল। আমি যেন আতান্তরে পড়ে গেলুম।

'কল্লোল ধ্বনি' উঠে সেই ভাবটা দূর করে দিয়ে গেল। প্রথমে এই উপন্যাস 'কল্কি' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে ছাপাবার কথা চিন্তা করে দ্বিতীয়বার পড়তেই বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, আমার কোনো রচনা যদি

পঞ্চাশ-একশ বছর পরমায়ু পাবার উপযুক্ত হয়ে থাকে তবে সে এই 'ওলাই-ওসাই' ওরফে 'কল্লোল ধ্বনি'।

সত্যি কথা বলতে গেলে 'কল্লোল ধ্বনি' আমি আবার কবে লিখলাম? এ কাহিনী লিখেছে ললিতা আর সীতা, তারিণী আর সূর্য, সুন্দর রাঘবন আর পট্টভিরামন— কাহিনীর চরিত্রেরা! তারাই তাদের নিজেদের গরজে একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে, অন্তরঙ্গ ভাবনা-চিন্তা আশা-আকাঙ্খা চিত্ত বিক্ষেপ আর অন্তর্দ্বন্দ্ব— হৃদয় উজাড় করে উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়ে রেখে গেছে। তারা তো আমার কাছে কাল্পনিক চরিত্র নয়। তাদের যেন আমার মতই রক্ত মাংসের শরীর। তারা আমার মতই জীবনের সুখ-দুঃখের সক্রিয় শরিক। ওদের মধ্যে একমাত্র সীতাই জননী কস্তুরবা'র সন্ধানে চলে গেছে। বাদ বাকি সবাইতো এখনো জীবন্ত। জানি না আবার করে কোথায় তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!…"

এ উপন্যাস-লেখার আগে 'কল্কি' উপন্যাসের ঘটনাস্থলগুলির সর্বত্র নিজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নতুন দিল্লী, পাণিপথ, কর্নাল, কুরুক্ষেত্র… সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে পাঞ্জাবের শরণার্থীদের শোচনীয় দুর্দশা নিজের চোখে দেখেছেন। তাঁর লেখা সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলিই তাঁর নিজের চোখে দেখা, না দেখে লেখেন নি। ফলে, তাঁর লেখা পড়ে পাঠক চট করে এটা বুঝতে পারেন না যে তাতে ঐতিহাসিক তথ্যের মাত্রা কতটা, কতটাই বা লেখকের কল্পনা। তাঁর এই সমন্বয়ের পরিমিতি বোধ এত নিখুঁত যে ঐতিহাসিক গবেষণারত পণ্ডিতও তার ভুল বার করতে পারেন না।

'ওলাই ওসাই'কে খানিকটা সংক্ষেপ করবার প্রয়োজনে কিছু কাটছাঁট করার দরকার ছিল। কিন্তু মন উঠল না। এমন সুখ-পাঠ্য বই! এর কোথায় কাটব? তবু, অনুবাদের দিকে নজর রেখে, নিরুপায় হয়ে বেশির ভাগ সুখশ্রাব্য সংলাপ বাদ দিতে হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'ওলাই-ওসাই'য়ের রুশ সংস্করণে যথাযথ অনুবাদ করা হয়েছে, তার বহু সংস্করণ বেরিয়েছে, লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রীও হয়েছে। এ উপন্যাস সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কারও অর্জন করেছে।

আনন্দী রামচন্দ্রন্

এক

রাজম পেট্টাই গ্রামের ‘অগ্রহার’, মানে বামুনপাড়ায় অদ্ধেকের ওপর বাড়িঘর পোড়ো হয়ে গেছে। বাড়ি বলতে যে ক’ঘর এখনো রয়েছে তার মধ্যে ‘পট্টমণি’ বা প্যাটেল অর্থাৎ মোড়ল কিট্টাবা আয়ারের বাড়িটাই দেখবার মতন, তার মধ্যে খান তুই ঘর তো একেবারে জমকালো গোছের।

ঘরের সামনে বৈঠকখানার চকমেলানো রকে বসে সরস্বতী আম্মাল্ মেয়ের চুলে বিনুনি বেঁধে দিচ্ছিল। কেশবিন্যাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু ললিতার আর তর সইছে না। উতলা হয়ে পড়ছে—‘মাগো আর কতক্ষণ ধরে চুল বাঁধবে? তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও না।’

“না, মোটেই তাড়াতাড়ি করব না। যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ ধরে বাঁধব। কী এমন রাজকার্য পড়ে রয়েছে তোমার? এই চড়চড়ে রোদ্দুরে এখন পোস্টাপিসে ছুটতে হবে, কেমন? ডাকে কিছু এলে পালিয়ে যাবে না। বালকেষ্টা পিওন বাড়ি চেনে। ছটফট করবে না একদম। চুপ করে বসে থাক।”

সরস্বতী মেয়ের বেণী বাঁধা শেষ করে ধীরেসুস্থে খোঁপা বাঁধার তোড়জোড় করতে যেতেই ললিতা এক ঝটকায় বিনুনিটা মার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েই সদর দোরের দিকে ছোটে।

“ললিতা, এই ললিতা। কথা শুনে যা। এলি? শীগ্যির ভেতরে আয় বলছি। এক্ষুনি বাড়িতে না ঢুকলে, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। এ বাড়িতে আর পা দিতে পাবে না মনে রেখ।”— সরস্বতী গজগজ করতে থাকেন।

কিট্টাবাইয়ার বাড়ি ঢুকলেন। বাপকে আসতে দেখে ললিতা একটু ইতস্ততঃ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। ললিতার তনুশ্রীতে পুষ্পলতার লাবণ্য। শৈশবের সুষমা এখনো অম্লান তায় বিকচ কৈশোরের সরল শরমের হিল্লোল।

স্বামীকে আসতে দেখে সরস্বতী উঠে দাঁড়াল। কিট্টাবা স্ত্রীকে ডেকে বলেন— "কী হয়েছে কি সরো ? এত চেঁচামেচি কিসের ? মেয়েটার ওপর দিনরাত্তির মেজাজ গরম করা তোমার যেন এক স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সোহাগের বেটির ওপর মেজাজ করা ছাড়া আর আমার কাজটা কী ? তোমার আদর পেয়ে পেয়েই একেবারে মাথায়..."

"বল বল, বল-না। থামলে কেন ? আমার আদর পেয়েই একেবারে মাথায় উঠেছে। তোমার শাসনে থাকলে ঠিকঠিক মানুষ হত। আমি অমানুষ করে তুলেছি। তা বলি, এত শোরগোল কিসের ?"

"হাজারবার পাখিপড়া করে বুঝিয়েছি— হুট্ হুট্ করে পোস্টাপিসে দৌড়োবি নি। তা কিছুতেই কথা কানে নেবে না। বলি, চিঠিপত্তর এলে কি রাস্তা থেকে খোয়া যাবে ? পিওন পেয়াদা কি বাড়ির পথ চেনে না ? এত বাড়াবাড়ি কিসের ? এই পোষ মাস পড়েছে। যে করেই হোক, এই বছরেই ওকে বিদেয় করা চাই।"

"তা কোরো। তা এখনই এত পাড়া মাথায় করছ কেন ?"

"বিয়ের যুগ্যি মেয়ে হুট্ বলতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবে ?"

"তা কী হয়েছে কি তাতে ? ডাকঘর তো এখান থেকে দু' কদম রাস্তা। মেয়েদের পরদার আড়ালে নজরবন্দী করে রাখায় দিন কি আর আছে নাকি ? যাক যাক। যা রে ললিতা, আমার নামে কিছু থাকলে নিয়ে আসিস।"

বাপের মুখ থেকে এইটুকু শোনার অপেক্ষায় ছিল ললিতা।

একবার অপাঙ্গে মায়ের দিকে তাকিয়েই খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে হাওয়ার মিশে গেল।

"ঢের ঢের লোক দেখেছি। কিন্তু আদর দিয়ে মেয়ের মাথা খেতে তোমার মতন এমন আর কাউকে দেখি নি। এবার বম্বে থেকে ঘুরে এসে বাপ বেটি যেন একেবারে হাওয়ায় উড়ছেন। এত ভাল নয়, বুঝলে ?—" সরস্বতী আবার গজগজ করতে থাকেন।

"খুব ভাল, খুব ভাল। ঠিক রাস্তাতেই চলা হচ্ছে। তুমি দয়া করে জিভের ধারটা একটু কম করলেই বাঁচি। এদিকে তো বল লেখাপড়া জানা জামাই করার সাধ। তা মেয়েকেও যে সেইরকম চালাক চটপটে করে তুলতে হয় সেটা কি বোঝ ?"

তাঁদের দাম্পত্য সংলাপের মধ্যেই সদর দরজায় পায়ের সাড়া আর গলা খাঁকারির আওয়াজ পাওয়া যায়। সরস্বতী একটু পিছিয়ে থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। আগন্তুক কিট্টাবাইয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সীমাচ্চু আয়ার।

"আজ সকালে মাদ্রাজ থেকে আমার পিসতুত ভাই কল্যাণ সুন্দরম্ এসেছে। আসার পথে খবরের কাগজ এনেছে। তাতে জোরাল খবর··· বেজায় জোরাল খবর···" বলতে বলতে বাড়ির ভেতর ঢোকেন সীমাচ্চু আয়ার।

"কি খবরটা কী মশায় বলেই ফেলুন না—" কিট্টাবা প্রশ্ন করেন।

"বিহার প্রদেশে প্রবল ভূমিকম্প হয়েছে।"

"এঁ, সেকি, তাই নাকি !"

"হুঁ, ভয়াবহ ভূমিকম্প ! কত যে প্রাণহানি হয়েছে, আর কত ঘরবাড়ি যে নষ্ট হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কাগজ জুড়ে ঐ একটাই খবর। হ্যাঁ, কাগজঅলাদেরও বলিহারি যাই।— ও কিট্টাজী, আপনার ওদিকে অন্দরমহলে ডাক পড়েছে মনে হচ্ছে যে।"

থামের আড়াল থেকে সরস্বতী বহুক্ষণ যাবৎ স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন, সীমাচ্চু সেটা দেখতে পেয়েই কিট্টাজীকে ডেকে দিলেন।

"আরে সরো, এদিকে এস-না। সীমাচ্চু কি আমাদের বাইরের লোক নাকি ?"

উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে সরস্বতী বলেন— "ভূমিকম্পর কথা শুনছি, মেয়েটা ওদিকে একলা বাইরে বেরোল। একবার চট করে বেরিয়ে দেখ-না, নিজে যাও কি কাউকে পাঠাও।"

বামুনপাড়া পেরিয়ে কিছুদূর এগোলেই বড় রাস্তা। সেই সড়ক ধরে রশিখানেক পথ গেলেই ডাকঘর। ললিতা পড়ি-মরি করে একছুটে ডাকঘরে এসে হাঁপাতে থাকে। এতটা পথ আসতে তার মিনিট পাঁচেকও লাগে নি। হাঁপাতে হাঁপাতেই জিজ্ঞেস করে— "পোস্টমাস্টারবাবু! আমার নামে কোন চিটি টিটি এসেছে নাকি ?"

ডাকবাবু মাথা তুলে দেখে বলেন, "কে, ও মালক্ষ্মী, তুমি ? একটু বোস। ডাকের থলি এখনো খোলা হয়নি। দেখে নিই, নিয়ে বলছি।"

ডাকবাবু দ্রুত মেলব্যাগ খুলে চিঠি সর্ট করে নেন। বলেন— "এই নাও তোমার চিঠি।"— বলে ললিতার হাতে তিনখানা চিঠি ধরিয়ে দেন। দু'খানা তার বাবার নামে, একখানা তার নিজের।

ললিতা চিঠি নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। ওর আর তর সয় না। ডাকঘরের দোরে দাঁড়িয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে পড়তে থাকে—

দাদর, বোম্বাই
14/1/1934

স্নেহের বোন ললিতা,

…ললিতা,…

গত রবিবার তোমায় যে চিঠি লিখেছিলাম, আশা করি ইতিমধ্যে সে-চিঠি তুমি পেয়েছ। চিঠিটা লিখতে গিয়ে আমার খুব খুশি খুশি লাগছিল। তোমায় চিঠি লিখতে দেখে আমার মার সে কি খুশি ! আমার গালে চুমু খেয়ে আদর করে মা বললেন— 'আহা বাছা,

তোর আর ললিতার এমনি ভাব যেন সারাজীবন থাকে।' বলতে বলতে মার চোখে জল এসে গেল। দেখে আমার ভারী অবাক লাগল। মনটা ভারীও হয়ে গেল। বললুম— 'কী হয়েছে মা, তোমার চোখে জল কেন?' চোখ মুছে মা ভারী গলায় বললে— 'কিছু না রে সীতা। এ দুনিয়ায় আমার তো কোন মনের মতন সখী নেই। তোর কপাল ভাল তাই একটা সত্যিকার সই পেয়েছিস। এই কথা ভেবেই চোখে জল এসে গিয়েছিল আর কি।'

জানিস ভাই ললিতা। আমার সেই চিঠি লেখার পরের দিনই মা বিছানায় পড়ল। মা বললে— 'এ তো মামুলী জ্বর। দুদিনে সেরে যাবে।' তার কথা সত্যি ভেবে আমি আর ডাক্তারকে খবরও দিলুম না। শেষকালে তিন দিনের দিন বাবা ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তার এসে বললে— 'টাইফয়েড। রুগী দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্ন করে করে ভেতরে ভেতরে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এঁর সময়মত চিকিৎসা করান নি কেন?' আমার বুকে যেন কাঁটা বিঁধতে লাগল রে। দিনের পর দিন মার উপোস করে থাকা, বাবার বেপরোয়া চালচলন— সব কথা আমার এক এক করে মনে পড়ে গেল। ললিতা। আজ বুঝি আর এসব কথা লিখে কোন লাভ নেই। মার স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছে। একমাত্র ভগবানের দয়া থাকলে তবেই বাঁচবে। ডাক্তারও বাবাকে সেই কথাই বলে গেছেন।...কী জানি ভগবানের মনে কী আছে? বল তো ললিতা, ভগবান কি দয়া করবেন? নাকি আমাকে অনাথ করে, পথে ভাসিয়ে দিয়ে— মাকে নিজের কাছে টেনে নেবেন?

বাবা মামাবাবুকে আলাদা চিঠি দিয়ে আসতে লিখেছেন। তুইও বলিস। মামা এলে হয়তো মা বেঁচে যেতে পারে। আসছে সপ্তাহে আবার তোকে চিঠি লিখতে পারব কিনা কী জানি! চিঠি লিখি আর না লিখি তোর স্মৃতিতে সবসময় আমার বুক জুড়ে আছে জানবি।

তোর প্রিয় সখি— সীতা

সীতার চিঠি পড়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ললিতা বাড়ি ফেরে। দেখে কিট্টাবা আয়ার চমকে ওঠেন। তারপর ধীরে ধীরে মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করেন— "ললিতা, কাঁদছিস কেন মা? চিঠিতে কী লিখেছে?" ললিতা অতিকষ্টে কান্নার বেগ সামলে বলে— "বাবা, পিসিমার শরীর খু' খারাপ হয়ে পড়েছে। সীতা লিখেছে। তোমার নামেও চিঠি এসেছে।"

ললিতার হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে পড়তে কিট্টাবা আয়ারের চোখ জলে ভরে ওঠে। চিঠি পড়া শেষ করে ঘরের ভেতরে এসে সোফার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে।

দুই

রাজম পেট্টাইয়ের কিট্টাবায়ার বাপের একমাত্র ছেলে। অখণ্ড কাবেরীর তীরে তার বাপের স্বোপার্জিত টাকায় কেনা বেশ কয়েক একর 'নান্‌চাই' বা ধানী জমি ছিল, আর ছিল গাঁয়ের প্যাটেলগিরি। কিট্টাবা এই দুইই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। বেজায় উর্বরা জমি, সোনা বুনলে সোনা ফলে। তা সে জমিতে সোনা অবিশ্যি বোনা হত না কোনদিন। বোনা হত সোনার চেয়েও দামী ধানের, 'চম্পা' ধানের বীজ, আর কলা, পান আর আখ। বাবা থাকতে থাকতেই দুই বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তারপর সংসারের বল্‌গা কিট্টাবার হাতে এলেও সংসারের কোন বড় খরচের কাজকর্ম আর পড়ে নি। তবে, দান-দাক্ষিণ্য, সার্বজনিক সেবাধর্ম, বন্ধু-বান্ধব পাড়াপড়শির দায়বিপদে সাহায্য, ছেলেপুলেদের লেখাপড়া ইত্যাদি পুণ্যকাজে মুক্তহস্তে খরচ খরচা করতে থাকায় পৈতৃক জমিজেরাতের বিশেষ কিছু স্ফীতি-বৃদ্ধি ঘটতে পায় নি। তবে হ্যাঁ, কন্যা ললিতার বয়সে প্রতি বছরই একটু করে বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। তাতে কোন কমতি নেই।

গতবছর মেয়ের বিয়ে নিয়ে কিট্টাবায়ার তেমন মাথা ঘামাতে পারেন নি। কারণ তাঁকে সপরিবারে বোম্বাই যেতে হয়েছিল। বোনেদের একজন কিট্টার বড়। কাছাকাছি এক গ্রামে এক ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির ঘরে বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট বোন রাজম্মই বোম্বাইয়ে থাকে। ছেলেবেলা থেকেই রাজম দাদার বড় আদরের বোন। অনেক সাধ আহ্লাদ করে ছোটবোনের বিয়ে দিয়েছিল কিট্টাব। তার উৎসাহ উল্লাসের অন্ত ছিল না। কিন্তু

রাজমের বিবাহভাগ্য ভাল ছিল না। বিয়ের পরে পরেই জামাই দুরাইস্বামী বোম্বাইয়ের রেলদপ্তরে ভাল চাকরী পেয়ে চলে যায়। এর কিছুদিনের মধ্যেই রাজমও পতির কর্মস্থলে সংসার করতে যায়।

কিন্তু অল্পদিনের ভেতরই বোঝা গেল যে রাজমের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের সৌভাগ্যের হয় নি। তবে সে বোঝা আভাসে ইঙ্গিতে বোঝা। কোন কিছু ধরাছোঁয়ার নাগালে পায় নি কিট্টা। রাজম স্বাভিমানী মেয়ে। তার সুখদুঃখের কোনো বহিঃপ্রকাশ কোন সময় টের পাওয়া যেত না। বোম্বাই আর রাজমপেট্টার মধ্যে ব্যবধান এতই বেশি, যে ইচ্ছে করলেই যাতায়াত সহজ নয়। আস্তে আস্তে চিঠিপত্রও একসময় হ্রাস পেয়ে যায়। কখনো কখনো একান্তে বসে কিট্টাবায়ার নিশ্বেস ফেলে ভেবেছে— বোন্‌টা কেমন আছে কে জানে?

এমনি সময় গেল বছর রাজমের চিঠি এল। মর্মে মোচড় লাগে সে চিঠি পড়লে। রাজম লিখেছে, এত বছর ধরে মনের কষ্ট মনেই পুষে রেখেছি শুধু এই আশায়, যে একদিন এর থেকেই মুক্তি পাবই। কিন্তু ছুটি আর আজ পর্যন্ত পেলাম না। দিনের পর দিন আমার শরীর ভেঙে পড়ছে। যত শীঘ্র পার এসে একবার আমায় দেখে যেতে পার তো ভালো হয়।

বৌ ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে তাই গেলবার কিট্টাবায়ার বোম্বাই গিয়েছিল। দাদর স্টেশনে ভগ্নিপতি দুরাইস্বামী নিতে এসেছিল।

বোম্বাইয়ে পিসির বাড়িতে ললিতা আর ছোট ভাই শুণ্ডুর দিন বেশ আনন্দেই কেটেছিল। সীতার মত প্রাণের সখি পেয়ে ললিতা আনন্দে অস্থির হয়ে পড়েছিল। তারা দুজনেই দিব্যি গেলেছিল যে সারা জীবন কেউ কাউকে ভুলবে না। সীতা ললিতার চেয়ে এক বছরের বড়।

কিট্টাবায়ার দেখতে পেল রাজমের জীবন পুরোপুরি নিরাশা আর ঘনবিষাদে ভরা। কিন্তু তার স্পষ্ট কোনও কারণ আবিষ্কার করতে পারল না। দুরাইস্বামী বাড়িতে খুব কম সময়ই থাকেন।

যখন আসে, অত্যন্ত হাসিমুখ, মিষ্টভাষী, শিষ্টাচারে কুশল। তবে বেশির ভাগই রাত্তিরের দিকে বাড়িতে থাকতে পারে না। বলে, অফিসে 'রাতের ডিউটি' থাকে।

কিট্টাবায়ার যেমন আশঙ্কা করেছিল, রাজম তেমন কিছু শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে নি। দেখেশুনেও তেমন দুর্বল বা ক্ষীণদেহ মনে হয় না। বরং চলাফেরায় বেশ চটপটে, ঘরগেরস্তালীর কাজে বেশ ক্ষিপ্রই দেখাল তাকে।

কিট্টাবায়ারের প্রশ্নের জবাবে রাজম বলল— "আমার শরীরে কিছুই হয় নি দাদা। আসলে তোমাদের অনেকদিন দেখিনি তো। দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল, তাই ঐরকম চিঠি দিয়েছিলাম। ওরকম করে না লিখলে কি আর আসতে!"

কিট্টাবায়ার বোনের কথায় সহজে ভুলল না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সবকথা জানার চেষ্টা করল।

"বল তো রাজম, দুরাইয়ের কোনোরকম বদ-খেয়াল টেয়াল নেই তো? মানে এই…মদ-টদ…"

"মদ আছে, জুয়া আছে, ঘোড়দৌড় আছে, আরো কত কি আছে? দাদা ওসব কথা ছেড়ে দাও, পোড়া ঘায়ে আর ওসব কথা বলে নতুন করে নুন ছিটিয়ে কী হবে?" বলতে বলতে হঠাৎ রাজমের চোখের কূল ভেঙে বন্যা নামে। কিট্টাব বোনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ভুলিয়ে ভালিয়ে সবকথা জেনে নেয়। কেবল জুয়ার নেশাই নয়, মেয়েমানুষের আসক্তিও তার স্বামীর পুরোদস্তুর আছে। এসব কথা খোলাখুলি বলে নি রাজম। তার কথার আভাস থেকে আন্দাজ করে নিয়েছে কিট্টাব। তারপর চুপ করে গেছে। বড় ভাই হয়ে বোনের মুখ থেকে আর এসব কথা শুনতে চায়নি।

সীতা বোম্বাইয়ের শহুরে সভ্যতার আওতায় জন্মেছে, বড় হয়েছে। ললিতা গ্রামের মেয়ে। যে যার পরিবেশ অনুযায়ী চালচলনে অভ্যস্ত। সীতার কানের কাছে একগুচ্ছ কোঁকড়া চুলের অলকদাম, তার মুখের আকর্ষণকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তার কথনকুশলতা

এককথায় অপূর্ব। ললিতার মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোতে না বেরোতেই সীতার মুখ দিয়ে শব্দের ফুলঝুরি ঝরে। কনভেণ্টে পড়ে, কথায় কথায় ইংরিজির জরি-ঝালর ললিতা শোনে আর হকচকিয়ে যায়। সবার ওপর ললিতার চেয়ে বছরখানেকের বড় হওয়ায়, সীতার সঙ্গে যৌবনের অর্ধস্ফুট উচ্ছ্বাসগুলি মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে।

সব দেখেশুনে সরস্বতীর মন বেজার হয়ে ওঠে। সব বিষয়ে সীতার ললিতাকে ছাপিয়ে যাওয়া তার পছন্দ নয়। তবে নিজের মেয়ের চেয়ে ননদের মেয়ে যে বেশি রূপসী তাতে তার সন্দেহ ছিল না। বোম্বাই থেকে ফিরে তাই সে মেয়ের প্রসাধনের দিকে কড়া নজর দিয়েছিল।

তিন

কিট্টাবায়ার এবার দ্বিতীয় পত্র খোলেন। আধখানা পড়েই বলে ওঠেন—'ছি ছি! দুপাতা ইংরিজি পড়ে মাদ্রাজ শহরে গিয়ে বসলেই কি লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়! হস্তি দীর্ঘ্য জ্ঞান থাকে না। দাম্ভিকের একশেষ!'

স্বামীর অনুযোগ শুনে সরস্বতী আম্মাল প্রশ্ন করেন—'কার চিঠি? কী লিখেচে?'

"লিখেছে পুরনো মাম্বলমের এক বুদ্ধির বৃহস্পতি।"

"ও তাই বল, তোমার ছোটমামা লিখেছেন। তা কী লিখেছেন?"

"সীমাচ্চু বলেছিল না যে মাদ্রাজের পদ্মাপুরমে একটি ভাল ছেলে আছে? তাই তার সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিয়ে জানাতে বলেছিলুম। তা তিনি গিয়ে পাত্রর মা-বাপের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। তারা বলেছে মেয়েকে মাদ্রাজে এনে দেখাও। যেমন তারা আহাম্মক তেমনি ইনিও। এক আহাম্মকে বলেছেন, অন্য আহাম্মকে আমায় তাই লিখেছেন—'মেয়ে এনে দেখাও।' এদের কাণ্ডজ্ঞান কোথায় থাকে বল দিকি। লিখেছে ললিতাকে একবার এখানে আনতে পারলে ভাল হয়। ভালমন্দর তুই বুঝিস কী রে?"—কিট্টাবায়ার গজরাতে থাকেন।

"তা সে যাই হোক, অত রাগারাগি করা উচিত নয় তোমার। ছোটমামা তো তেমন মানুষ নন যে কিছু না বুঝেসুঝে লিখবেন। মেয়েকে আমরা নিয়ে গেলেও তো আর সরাসরি বরের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলছি না। বরং আমার কথা শোন, পাশের বাড়ির সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় স্থির কর।"

পাশের বাড়ি মানে সীমাচ্চু আয়ার। সীমাচ্চুর নাম নিলেই যে স্বামীর রাগ জল হয়ে যাবে সেটা সরস্বতীর জানা। হলও তাই। কিট্টাবায়ার তাড়াতাড়ি কিছু নাকেমুখে গুঁজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পাড়ার পশ্চিম কোণে সীমাচ্চু ওরফে শ্রীনিবাস আয়ারের বাড়ি। বাড়ির বাইরে রকে জনা তিনেক তৈরী হয়ে বসে আছেন। সীমাচ্চুর হাতে তাসের প্যাকেট। পঞ্চু আয়ার আর আপ্পা দুরাই শাস্ত্রী 'স্বদেশ মিশন' কাগজের এক-একখানা পাতা বিছিয়ে বসে খবর পড়ছেন। কিট্টাবকে আসতে দেখে খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলে শাস্ত্রী বলেন— "আসুন আয়ার মশায়, বিহারের খবর শুনেছেন? ভূমিকম্পের খবর?'

"ভূমিকম্প হোক না হোক আর-একটা ব্যাপার নিশ্চিত হতে চলেছে। খবরে ছেপেছে মহাত্মা গান্ধী আমাদের প্রদেশে পদার্পণ করবেন।"— পঞ্চু আয়ার কাগজের মোটা হরফে ছাপা হেড লাইন আঙুল দিয়ে দেখায়।

"কেন আসছেন জান কি? সমস্ত মন্দিরের দরজা পতিতদের জন্যে খোলাতে আসছেন। ভূমিকম্পের আর অপরাধ কী? এরকম অনাচার চলতে থাকলে শুধু ভূমিকম্প কেন, ঝড় তুফান হবে, মুষলধারে বরষা হবে, বান ডাকবে, প্রলয় হয়ে যাবে— মহাপ্রলয়। সর্বস্ব ভেসে যাবে। ত্রিভুবনের নামগন্ধ থাকবে না দেখো।"

"আরে ছি ছি ছি, শাস্ত্রীজী, একি করছেন দাদা। বেদ পাঠ করা পবিত্র মুখ দিয়ে এইসব দুর্বাক্য, শাপশাপান্ত করছেন। একবার যদি ফলে যায় তো আমাদের কী হাল হবে বলুন দিকি।" —পঞ্চু আয়ার কায়দামাফিক এক হাত নেয়।

"সীমাচ্চু, আমি একটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শ নিতে এসেছিলুম"— কিট্টাবায়ার কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

"ওহো, তা এতক্ষণ বল নি কেন? এস এস, ভেতরে এস।" সীমাচ্চু কিট্টাবকে নিয়ে ভেতরে যায়।

বোম্বাই আর মাদ্রাজের চিঠির সারাংশ ব্যক্ত করে কিট্টাব বলে—'এখন এ ব্যাপারে তোমার কী মত বল।'

সীমাচ্চু তার মতামত ব্যক্ত করে।

মাদ্রাজ নগরীর নতুন পল্লী পদ্মাপুরমে রায়বাহাদুর পদ্মলোচন শাস্ত্রীর নিজস্ব বাড়ি। শাস্ত্রীজী তাঁর কক্ষে বসে তাঁর ছেলে সুন্দর রাঘবনের কথা চিন্তা করছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে ছেলের চিন্তায় তাঁর মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। বড় ছেলে শংকর নারায়ণের ব্যাপারে একে তো আগেই তিনি হতাশ হয়েছেন। এমনিতে শংকর খুবই বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছেলে। স্কুল কলেজে কোনদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয় নি। আইন পাস করে ওকালতির পেশা নিয়েছে। তার শ্বশুর ব্যাঘ্রম্ আয়ার নামকরা 'লায়ার'। শ্বশুরের জুনিয়র হয়ে শংকর প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে। ফলতঃ বেটা বাপের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তার কাছে এখন শ্বশুর-মন্দিরই স্বর্গলোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানেই থাকে। তার বেশভূষা চালচলন আর কেতায় একেবারে ভোল পালটে গেছে। প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতি পুরোপুরি ত্যাগ করে সে আধুনিক কেতাদুরস্ত পোশাক-আষাকে পরিপাটি সভ্যভব্য সেজে বৌয়ের কথামত জন্মদাতা বাপমাকে ইদানীং পাড়াপড়শি ভাবতে শুরু করেছে।

ছোট ছেলে সুন্দর রাঘবনও দাদার মতই বুদ্ধিমন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা তার বাঁ হাতের খেলা। বি. এ.তে অর্থশাস্ত্রে অনার্স ছিল। তাতে সারা প্রদেশে প্রথম হয়েছে। সে যে-বছর পাস করে বেরোয়, সে বছর ভারত সরকারের অর্থনীতি নিয়ে কাগজে খুব গরমাগরম আলোচনা চলছিল। 'এক টাকায় আঠারো পেন্স না ষোলো পেন্স?' তার ভালমন্দ নিয়ে বাদবিতণ্ডা আর জোর গবেষণা চলছিল। সুন্দর রাঘবনও ঐ বিষয়ে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখে কাগজে ছাপতে দিয়েছিল। তার লেখা 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল। তার চিঠি দেশের বড় বড় অর্থনীতিজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু

তাই নয়, ভারতসরকারের অর্থদপ্তরের কর্মকর্তাদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দপ্তরের প্রধান অধিকর্তা সুন্দরকে একটা চিঠি লেখেন। চিঠি পেয়ে সে দেখা করতে যায়। সাক্ষাৎকারের ফল ভারতসরকারের রেভিনিউ দপ্তরে সুন্দর রাঘবনের একটি সোনার চাকরী লাভ।

কাজেই ছোট ছেলেকে নিয়ে গর্ব করার অত্যন্ত ন্যায়সংগত কারণ পদ্মলোচন শাস্ত্রীর হাতে মজুতই রয়েছে। অথচ তিনি তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দুশ্চিন্তার কারণ কী?

কারণ অন্য কিছু নয়। কারণ হল বিবাহ-ঘটিত।

সচরাচর মেয়ের বিয়ে নিয়েই বাপ-মাকে চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখা যায়। পদ্মলোচনের কি সবই উল্টো? এমন হীরের টুকরো ছেলের বিয়ে নিয়ে বাপের মাথাব্যথা! তাঁর ভয়ংকর দুর্ভাবনা—ছোটছেলে সম্ভবতঃ এমন কিছু করে বসবে, যাতে তার আচরণের তুলনায় বড় ছেলের আচরণ লক্ষগুণ ভাল বলে বিবেচিত হবে। তাঁর চেয়ে তাঁর সহধর্মিণী কামাক্ষী আম্মালের আশঙ্কা-উদ্‌বেগ আরো বেশি।

সুন্দর রাঘবন। সাড়ে পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মানানসই পেশল দেহ। দৃপ্তদর্শন যুবক। মুখকান্তি সৌম্য। ভাস্কর্যশিল্পের উত্তম উৎকর্ষের নমুনা। সযত্ন-কর্তিত কেশদামে চিরুনির বিচরণ-বিন্যাসও কম সযত্ন নয়। পরনে উত্তম পোশাক। টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে সুন্দর রাঘবন।

টেবিলের ওপরে কার একটা চিঠি এসেছে তার নামে। তারই একটা অসমাপ্ত জবাব। লিখতে লিখতে ফেলে রেখেছে। তার তলায় সেদিনের কাগজ। বারবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে সুন্দর। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো একখানা ছবিও দেখা যাচ্ছে— টেবিলের শোভা বাড়াচ্ছে। সুন্দরের হাতে নীল রঙের ঝর্না কলম। মুখে হতাশা ক্রোধ আর বেদনার অপসৃয়মাণ জলছায়া। বুদ্ধিদীপ্ত চোখে দূরের স্বপ্ন আর তন্দ্রালু ছায়া ফেলেছে। কিছুতেই চিঠির জবাব লিখতে পারছে না সুন্দর। হার মেনে আবার একবার সেটা পড়তে বসে সুন্দর রাঘবন।—

জি. আই. পি. মার্গ
21/1/1934

নমস্কার !

বোম্বাইয়ের ঠিকানায় লেখা আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার চিঠি যখন এল, তখন আমি ট্রেনের জন্যে রওনা হচ্ছি। তাই এ চিঠি ট্রেন থেকেই লিখছি।

আমি আপনার কাছ থেকে সরে আসার পর আপনার মনের অবস্থা আপনার চিঠিতে স্পষ্ট চিত্রিত হয়েছে। আমি সেজন্যে দুঃখিত। তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে করজোড়ে মিনতি করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ভুলে যান।

পৃথিবীতে আপনার মত যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত কাজের অভাব নেই। আপনি কাজের মধ্যে মনকে একাগ্র করুন. মনের স্থিরতা ফিরে আসবেই।

বিশ্বাস করুন আপনার মায়ের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাঁর পুত্রবধূ হবার সৌভাগ্য আমার হল না, তারজন্যে তাঁর প্রতি আমার ভক্তিতে কম পড়বে কেন ? তাঁর সৌম্য মাতৃমূর্তি যতবার আমার মনে আসে আমার মনে হয় যেন সনাতন ধর্মের শরীরী প্রতিমূর্তিকেই প্রত্যক্ষ করছি। আমার মত একটা পতিতা মেয়ের পায়ে পড়ে তিনি কেঁদে বলেছিলেন— 'মেয়ে আমার ভিক্ষেটা পূরণ কর··· আমার মনের বাসনাটা পূর্ণ হতে দে।' আমি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ভগবান আমাকে আমার পণরক্ষার শক্তি দেবেন, আমি জানি। পৃথিবীর জীবনের বোঝা যখন ভারী হয়ে উঠবে, তাঁর ভরসাতেই আমাকে চলতে হবে।

বোম্বাইয়ের ঠিকানায় লেখা চিঠি, আর তার আগে আমায় লেখা আপনার সমস্ত চিঠি আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি। ওসব আর জমিয়ে রেখে লাভ কী বলুন ? আমার অনুনয়, আপনিও তাই করবেন। আমার সব পুরনো চিঠির সঙ্গে এই চিঠিটাও পুড়িয়ে

ফেলবেন। আপনার কাছে আমার যে ফোটো আছে, সেটাও সেই আগুনেই ভস্ম করে দেবেন। কেমন ?

বিহারের ভূমিকম্পের খবর নিশ্চয় কাগজে পড়েছেন। নিদারুণ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত বিহারের মানুষগুলির আজ একান্ত সেবার প্রয়োজন। বিহারের নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদজীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকে আর্তত্রাণ শিবিরে সেবাব্রত নিয়ে চলেছে। বোম্বাইয়ের স্বেচ্ছাসেবকমণ্ডলের প্রথম দলে ভর্তি হয়ে আমিও বিহার রওনা হয়েছি।

আপনাকে আমার সানুনয় প্রার্থনা— আমাকে ভুলে যান।

তারিণী।

সুন্দর রাঘবনের মতন প্রখর মেধার ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন পরীক্ষায় কড়া কড়া প্রশ্নের জবাব লিখতে যার অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য কোনদিন ব্যাহত হয় নি— সামান্য একখানা চিঠির জবাব লিখতে সে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে আজ! কেবল ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে!

পদ্মাপুরম। মাদ্রাজ
24/1/1934

'তারিণী দেবী,

ট্রেনের কামরায় বসে লেখা আপনার কৃপাপত্র পেলাম। আপনার পত্রবাণ পড়ে আমার বুকের ভেতরটায় কীরকম ঘটেছে, একটু জানতে চান? তা যদি জানতেন— যাক সে কথা। সেসব কথা এখন আর লিখেই-বা কী লাভ?··· ইস্পাত, পাথর আর সনাতন ধর্মের কঠোর নিয়মকানুন তোমার নির্দয় হৃদয়ের কাছে ননীর মত নরম। আমার যন্ত্রণার খতিয়ান বোঝবার ক্ষমতা নেই তার।...'

এর বেশি আর একটা কথাও লিখতে পারে নি সুন্দর রাঘবন। এখানে এসেই তার কলম থমকে থেমে গেছে। আর এগোয় নি। হাজার হাজার চিন্তায় ডুবে গেছে সে। এই সময় দোরের কাছে কে যেন ডাকল— 'স্যর।'

রাঘবন উত্ত্যক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ওপরের বারান্দা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে। প্রশ্ন করে—'কে ?'

দুই আগন্তুক একসাথে মাথা তুলে তাকাল। রাজম পেট্টাইয়ের প্যাটেল কিট্টাবাইয়ার আর তার পুরনো মাম্বলমের বাসিন্দা ছোট মামা সুব্বা আয়ার।

সুব্বা আয়ারের মুখ দেখেই রাঘবন বুঝতে পেরেছে ইনি তার বাবার পরিচিত ব্যক্তি। "ওহো। বাবার কাছে এসেছেন! দাঁড়ান দরজা খুলে দিতে বলছি।"—বলে রাঘবন ভেতরে চলে যায়।

"আরে আসুন, আসুন। আপনি! আমি বলি কে না কে আবার এল। আজকাল যা হয়েছে, সদর দরজা খুলে রাখবার জো নেই। যতরাজ্যের নিষ্কম্মা-অকম্মার ঢেঁকিরা দোর খোলা পেলেই কুকুরের মতন ঢুকে পড়বে।" পদ্মলোচন শাস্ত্রী এইসব সুনির্বাচিত শব্দাবলী দিয়ে আগন্তুকদের স্বাগত জানালেন এবং বৈঠকখানা মহলের ভেতরে নিয়ে গেলেন।

"বসুন। বাঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন বসুন সুব্বায়ারজী, সংকোচ করবেন না। সোফায় আরাম করে বসুন। আপনি বসলে কি সোফাটা ক্ষয়ে যাবে? এরকম কোমলমতি মানুষদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আপনারা জানেন কিনা জানি না, আমি যখন রামনাথপুরম্ জেলায় সাবজজের কাজ করি, সেই সময় একবার এক ধনীর বাড়ি গিয়েছিলাম। বললে বিশ্বাস যাবেন না, সে বাড়ির থামগুলোর গায়েও গেলাপ্ পরানো। কালো কষ্টিপাথরে তৈরী থামগুলো। এক-একটা থামের পেছনে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তা বলুন দিকি এমন ভাল কারিগরি, এমন দামী জিনিস বানিয়ে তারপর তাকে ঢেকে রাখার কী মানে হয়? ভাববেন না গল্পকথা, একেবারে ষোলো আনা খাঁটি সত্যি।—আরে একি, আপনি এখনো দাঁড়িয়ে? বসুন না?" পদ্মলোচন শাস্ত্রীর অনর্গল বাক্যস্রোতের তোড়ে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসও বোধহয়

যথেষ্ট বাধা পাচ্ছিল। সুব্বায়ার আর কিট্টাবাইয়ার ধীরেসুস্থে নিরিবিলি জায়গা দেখে বসে পড়ে।

এইসময় একবার নিঃশ্বেস নেবার জন্যে শাস্ত্রী থামতেই সুব্বা আয়ার ফাঁক বুঝে সেই সুযোগটা কাজে লাগাল—

"গত রবিবার তো সর্বজ্ঞ সঙ্ঘে ভাগবতের ব্যাখ্যা ভাষ্য হয়েছিল না? তাতে সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল কী জানেন? ভাষ্যকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আপনি যে দু এক কথা বলেছিলেন, সেইটাই সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল। একেবারে মাপাজোখা কথায় আপনি সারকথা বলে দিয়েছিলেন। ভাষণ দিতে হলে এইরকম! আর সবাইকার বলা, বলার জন্যেই বলা!"

কিন্তু শাস্ত্রীজী সে বান্দা নন যে খোশামুদির দুটো শব্দ শুনেই গলে জল হয়ে যাবেন। উলটে বললেন— আরে মশায়, আপনার মতন কম করে নব্বই জন এসে আমাকে ইতিমধ্যে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। বলেছে আমি শ্রেষ্ঠ বক্তা। কিন্তু সত্যি কথা যদি জানতে চান তো বলি কেউই আমার বক্তব্যের বিন্দু বিসর্গ বোঝেন নি। বুঝবে কী করে?— বাদ দিন ওসব কথা। আরে হ্যাঁ, সুব্বা আয়ারজী, আপনার সঙ্গী ভদ্রলোকের তো কোন পরিচয়ই জানলুম না। অথচ তখন থেকে আবোল তাবোল বকে চলেছি। আপনি তো ওঁর পরিচয়ই দিলেন না। ওঁকে দেখে তো বেশ সম্ভ্রান্ত লোক মনে হচ্ছে। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কী, ঠিক বলছি না?"

"যা বলেছেন। হ্যাঁ এঁর কথা আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম। ইনিই রাজম্ পেট্রাইয়ের প্যাটেল কিট্টাবইয়ার। একবার মাদ্রাজে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করে যাবার কথা লিখেছিলাম। তাই এসেছেন।"— সুব্বা আয়ার পরিচয় দেন।

"দেখুন দিকি কী অন্যায়। আপনি মশায় কীরকম লোক বলুন তো। গোড়াতেই বলবেন তো যে অমুক ব্যক্তি এসেছেন।··· থাক থাক্। বড়ই আনন্দ পেলাম আপনার দেখা পেয়ে। তা হলে

আপনিই কিট্টাবায়ারজী। য়ঁ্যা! তা গ্রামের পটেলগিরি ছাড়া জোতজমি, লেনদেন ইত্যাদি কীরকম···”

“সবই আছে আপনার দয়ায়। কাবেরী উপত্যকায় ষাট একর ধানের জমি— সব জমিই দোফলা।”

“বাঃ বাঃ শুনলেও আনন্দ হয়! তা জোতদার মশায় কি কোন কাজে মাদ্রাজ এসেছেন, নাকি শহর দেখতে?”

“আজ্ঞে মাদ্রাজ শহর ওঁর আগেই দেখা। সে কথা যদি বলেন তো বোম্বাই শহরও দেখে এসেছেন। এবারে আসা মেয়ের পাত্র সন্ধানে।”

“ওহো। তাই বলুন। মেয়ের বর খুঁজতে বেরিয়েছেন। তা সুব্বায়ার মশায় কি আজকাল ইনস্যুরেন্সের সঙ্গে সঙ্গে ঘটকালির কাজেও নেমেছেন নাকি?”

“তা নয়। গতবার আমাদের যখন দেখা হয়, তখনই এ নিয়ে কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে। আপনি এবং আপনার স্ত্রী বলেছিলেন মেয়েকে এনে দেখাতে পারলে ভাল হয়। মনে আছে আপনার?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে বটে। কিন্তু একটু আস্তে বলুন। ছেলে ওপরের ঘরেই রয়েছে। কথাটা এখনই ওর কানে না যাওয়াই ভাল।··· আমার তো এখনো তাই ইচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাকে বরং খানিকটা ‘মডার্ন’ই বলতে পারেন। ছেলেমেয়ে পরস্পরকে দেখে পছন্দ করুক। শাস্ত্রেও তো তাই বলে। আজকাল যৌতুক-টৌতুক নিয়ে যেসব কথা হয় সেসব তো নন্‌সেন্স— নিরর্থক। আমার ওসব দুচক্ষের বিষ। ওসব শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব্যাপার। আমি আমার ছেলের জন্যে বরপণ হাঁকলেই হাঁকতে পারি— তিরিশ হাজার দাও, কি পঞ্চাশ হাজার দাও। কিন্তু···”

সুব্বা আয়ার কথায় বাধা দেন— “সেসব কথা আপনার বলার দরকারই হবে না শাস্ত্রীজী। মেয়ের বিয়ের জন্যে ত্রিশ হাজার টাকা কিট্টাবায়ার আলাদা করে রেখেই দিয়েছেন। লোক-লৌকিকতার দিক থেকে কোনো ত্রুটি হবে না। আপনাকে সবরকমে সন্তুষ্ট করে দেবেন

"লৌকিক বা সামাজিক ক্রিয়ার কথা ছেড়ে দিন মশায়। বিবাহ হল পরম বৈদিক ক্রিয়া। অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে হবার পরেই ব্রাহ্মণ বৈদিক ক্রিয়ার অধিকারী হয়। তবে কী জানেন, ছেলেমেয়ের মত না নিয়ে বিয়ে স্থির করার যুগ আর নেই। সে কাল কেটে গেছে।— ভাল কথা, মীরাসদার মশ'য় তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসেছেন নাকি ?"

কিট্টাবায়ার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার মুখ খোলার সুযোগ পায়। বলে—"মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু এবার সম্ভব হল না। আমার ছোট বোন বোম্বাইয়ে থাকে। হঠাৎ চিঠি পেলাম তার অসুখ। তাকে দেখতে একবার বোম্বাই যাব। আপনি বলেন তো বোম্বাই থেকে ফিরে গ্রাম থেকে মেয়েকে নিয়ে আসি।"

"তাড়াতাড়ি কিসের ? সুবিধে সুযোগ-মত আনবেন। এই তো সবে পোষ মাস পড়েছে। তবে একটা কথা। ছেলে ছুটিতে বাড়ি এসেছে। ছুটি ফুরোবার আগেই তার বিয়ে দিতে চাই। বেশি দেরি করা যাবে না। ছেলের মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"— কথা বলতে বলতে শাস্ত্রীজী হাঁক পাড়েন —"কামাক্ষী ! একবার এদিকে এসো।"

"এই যে, আসি।" অন্দরমহলের দোরের কাছ থেকে বামাকণ্ঠ শোনা গেল।

"এস এস, তোমারই অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।" শাস্ত্রী বলেন। শাস্ত্রী গৃহিণী ঘরে আসতে সুব্বা বলেন— "আসুন। আমি সুব্বা আয়ার। ইনি রাজম পেট্টাইয়ের কিট্টাবাইয়ার। এঁর কথা আপনাদের তো আগেই বলেছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। কী ! মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন ?"— কামাক্ষী আম্মাল জিজ্ঞেস করেন।

"এবারে আনতে পারেন নি। বোম্বাই থেকে বোনের অসুখের খবর পেয়ে দেখতে যাচ্ছেন। এক কাজ করুন, আগে বরকনের

জন্মকুণ্ডলী বিচার করে নিন, তারপর পাকা কথা হয়ে যাক, তারপর মেয়ে এনে দেখিয়ে দিতে আর অসুবিধে কী ?"

"পাকা কথা আবার কী ? মোটে কথাই হল না যেখানে ? আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন। মেয়েকে এনে আগে ছেলেকে দেখাতে হবে এই হচ্ছে কথা। ছেলের যদি মেয়ে পছন্দ হয়ে যায়, তখন আর বলাবলির কিছুই নেই। শুভমুহূর্ত দেখে বিয়ের লগ্ন গোনা।"— কামাক্ষী দেবী রায় দিলেন। কামাক্ষী দেবীর মুখের কথা ফুরোবার আগেই ওপরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

রাঘবন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। কথাবার্তা ওর কানে গেছে। তার মুখের ওপর কিছুক্ষণ আগের সেই বেদনা আর চিন্তার কুটিল ছায়া নেই। তার বদলে মুখে রয়েছে হালকা হাসির রঙ। সিঁড়িতে পায়ের সাড়া পেয়ে এঘরের চারজনেই সিঁড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন।

কিট্টাবায়ার রাঘবনের দিকে অপলকে তাকিয়েছিল। তার সৌম্য-গম্ভীর কান্তি আর মুখে মনীষার আলোর আভাস দেখে কিট্টাব মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। মনে মনে ভাবছিল 'এ ছেলেকে জামাই করতে পারলে আমারও সৌভাগ্য, মেয়েরও পরম সৌভাগ্য।'

ঘরে ঢুকে রাঘবন একবার চারজনের দিকেই তাকায়। বলে— "মনে হচ্ছে কারুর বিয়ের কথা হচ্ছিল।"

"কারুর বিয়ের কথা আবার কী ? তোমায় বিয়ের কথাই হচ্ছিল।"— শাস্ত্রী ছেলের মুখের ওপর কথাটা বেশ সাহস করেই ছুঁড়ে দেন। বাইরের লোকের সামনে রাঘবন মর্যাদা রেখেই চলবে, ও কথা তাঁর জানা আছে।

"আচ্ছা, এই কথা। তা আমায় কিছু না বলেই আমার বিয়ে দেবার ইচ্ছে নাকি ?" —রাঘবন বলে।

"তোমায় ব'লে, তোমার মত নিয়েই যা করবার করা হবে বাবা। বিয়ে তো আর ছেলেখেলার কথা নয় যে হুট করে কিছু করা হবে। একবার হলে তো আর বদলানো যাবে না। আর তুমিও নাবালক

নও যে তোমার মন না জেনে আমরা কিছু করতে যাব।”—কামাক্ষী ছেলেকে বোঝান।

“অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার কী দরকার?”—শাস্ত্রী হেস্তনেস্ত করার পক্ষপাতী। বলেন, “সোজাসুজি বলে ফেলাই তো ভাল। রাঘব, শোন! আমাদের সুব্বা আয়ার মশাই রাজম পেট্টার মীরাসদার মশায়ের কথা বলেছিলেন না? ইনিই সেই ভদ্রলোক কিট্টাব আয়ার। ইনি মেয়ের জন্যে পাত্র সন্ধান করতে এসেছেন। তোমাকে ডেকে পাঠাবার কথাই আমি ভাবছিলাম, এমন সময় তুমি নিজেই এসে পড়লে। ভালই হল। তুমি তোমার মনের কথা বলে দাও। তারপর বাদবাকি কথা ‘সেটেল্’ হয়ে গেলে ইনি মেয়েকে এখানে এনে দেখাতে রাজি আছেন। সম্ভ্রান্ত বংশ, গোত্রেও মিল আছে। তোমার মার আর আমার তো এ সম্বন্ধ খুবই পছন্দ। এখন তুমি বল যা বলতে চাও। এঁকে মিছিমিছি ঘোরাবার তো কোন মানে হয় না। ‘হ্যাঁ’ ‘না’ যা হোক স্থির করে বলে দেওয়াই ভাল।’—শাস্ত্রী কথা শেষ করেন।

রাঘবনের ঠোঁটে এতক্ষণ যে হাসিটুকু খেলা করছিল, এবার সেটা অন্তর্হিত হয়ে যায়। গম্ভীর মুখে বলে—“বাবা, আমায় যদি বিয়ে করতে হয় আমি ওঁর গ্রামে গিয়ে ওঁর মেয়েকে দেখে আসব। ওঁর মেয়েকে এখানে এনে দেখাবার কোন প্রয়োজন নেই।”

রাঘবনের কথার জবাব দেবার সাহস ঘরের কারুর ছিল না। সেও উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ঘরের পেছন দিকের দরজা দিয়ে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে যায়।

ছেলে চোখের আড়ালে চলে যাবার পর কামাক্ষী কিট্টাব আয়ারের দিকে তাকিয়ে বলেন—“আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ছেলেকে পথে আনার ভাবনা আমার। আপনি চলে যান, বোম্বাইয়ের কাজ সেরে ঘুরে আসুন!”

পদ্মলোচন শাস্ত্রীর বাক্যবন্যা আবার শুরু হবার আগেই ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে।

চার

দেবীসদনের খিড়কির দিকে আর-একটা রান্নাঘর ছিল। তার সামনাসামনি কামাক্ষী আম্মালের পুজোর ঘর। দুয়ের মাঝখানে একটা বিশাল হলঘর। হলঘরের মাঝামাঝি একটা দোলনা। সেই দোলনায় বসে দোল খেতে খেতে রাঘবন মায়ের প্রতীক্ষা করছিল। তার মনটাও তার মতন দুলছিল।···

সেবার নয়াদিল্লীর অর্থদপ্তরের প্রধান অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে রাঘবনের মনে হল একবার করাচী ঘুরে গেলে মন্দ কী? সে বছর করাচীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসেছে। অধিকাংশ ভারতীয় যুবকের মত রাঘবনও স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি ছাত্রাবস্থায় একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করে এসেছে। সমাজ-সংস্কারের উৎসাহও তার প্রবল ছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষ থেকে জাতিভেদ দূর করতে পারলে রাষ্ট্রীয় উন্নতি হওয়া সম্ভব।

তাই দিল্লীর কাজ শেষ করে সে করাচী চলে গিয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে দর্শক হিসেবে যোগ দিল। কিন্তু অধিবেশনের কাজকর্ম দেখে দেশের উন্নয়নকামী নেতাদের ওপর তার শ্রদ্ধা বাড়ল না। 'পৃথিবী দিনকের দিন কত এগিয়ে চলেছে। আমেরিকার 'ফোর্ড' কোম্পানির কারখানায় মিনিটে তিনশো খানা করে গাড়ি তৈরী হচ্ছে। আর এই প্রখর যন্ত্রযুগে বসে এঁরা চরখা নিয়ে মাথা ফাটা-ফাটি করছেন। ঘণ্টায় তিনশো গজ সুতো কাটার সংকল্প নিচ্ছেন। হে ভগবান! এইসব নেতার নির্দেশ পালন করে এদেশের উন্নতি হবে। সে কোন্ কালে?'— ভেবে রাঘবন একেবারে দমে যায়।

সেখান থেকে উঠে রাঘবন উড়ো জাহাজ দেখতে চলে গেল। উড়োজাহাজ তখন নতুন উঠেছে। ·যন্ত্রযুগের সর্বোত্তম প্রতীক বিমানপোত দেখার জন্যে তখন করাচীর নবনির্মিত বিমানবন্দরে মানুষের ভিড় থৈথৈ করে। পাঁচ টাকা ভাড়ায় পাঁচ মিনিটের জন্যে করাচীর আকাশে বেড়িয়ে আসা যা। গোটা করাচী শহর দেখিয়ে আনবে— আকাশপথে।

সেদিনও তামাশা দেখার জন্যে প্রচুর লোক জড় হয়েছে। রাঘবন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে প্রায় তার গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়েছিল তিনটি মহিলা। তাদের একজন মাঝবয়সী, বাকি দুজন যুবতী। একজনের গায়ের রঙ শামলা, ছোটখাট মোটাসোটা গড়ন— বিশেষ সুন্দরী বলা যায় না। কিন্তু অন্যজন···? অবর্ণনীয়া রূপসী। অঘ্রানের ভোরে ঘাসের ডগায় টলমল করা মুক্তোরঙা শিশিরের ফোঁটার মতন তার চোখের মণিদুটো টলটলে।

"আপনি কি মাদ্রাজী?"

সুন্দরী মেয়েটির মধুক্ষরা কণ্ঠ রাঘবনের কানে সুধাবর্ষণ করে। কথা ক'টি যেন কথা নয়, কবিতার মধুনিষ্যন্দী পঙক্তি। কোথায় লাগে শেলী-কীট্স! রাঘবন জবাব দেয়। যুবতীটি আবার প্রশ্ন করে—"আপনিও বুঝি উড়োজাহাজে চড়বেন?"

"হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো এলুম।"— রাঘবন চট ক'রে জিজ্ঞেস করে— "আপনিও চড়বেন তো?"

"আগে আপনি যান, ঘুরে এসে বলবেন হাওয়াই সফর কেমন লাগল, তারপর···" মেয়েটি জবাব দেয়।

মেয়ে দুজন পরস্পরের নাম ধরে ডাকছিল। রাঘবন জানতে পারল সুন্দরীটির নাম তারিণী, তার সঙ্গিনী নিরুপমা। তাদের কথাবার্তায় এও বুঝল যে তারা দুজনেই করাচী কংগ্রেসের স্বেচ্ছা-সেবিকা হয়ে এসেছে আর অধিবেশন শেষ হবার পর ওর মতন তারাও শহর দেখতে বেরিয়েছে।

রাঘবন বিমানে চড়ে ঘুরলেও তার মন আটকে রইল মাটিতে। সেখানেই ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বিমান মাটিতে নামতেই রাঘবনের চোখ চলে গেল মেয়েদের জায়গায়। তারিণী উৎসুক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কেমন লাগল আকাশ-সফর?" সত্যি কথা বলতে গেলে রাঘবনকে বলতে হয় যে আকাশ কোথায়, আমি তো এতক্ষণ এইখানে মাটি ছুঁয়েই ছিলুম। কিন্তু সে সত্য গোপন করল, বলল, "ভারী চমৎকার। এবার আপনি চড়ছেন তো?"

তারিণী হতাশ হয়ে ঘাড় নাড়ল—"না। এরা দুজন ভয় পাচ্ছে আর আমাকেও যেতে দিচ্ছে না।"

"ভয় পাবার কী আছে? এতে যে বেশি সীট নেই, নইলে আমি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যেতাম। কিন্তু এতে পাইলট ছাড়া কেবল একজনই বসতে পারে!"— রাঘবনের স্বরে নৈরাশ্য ফুটে ওঠে।

"চল এবার যাই" তারিণীর সঙ্গিনী তাড়া দেয়। তারিণী রাঘবনের দিকে তাকায়, বলে—"এবার আমাদের যেতে হবে।"

তারপর তিন মহিলা প্রতীক্ষমাণ ট্যাক্সির দিকে পা বাড়ায়। ওরা ট্যাক্সিতে চড়ার পর, রাঘবনের মনে হল— তারিণী যেন ওর দিকে চেয়ে আছে। ভুল দেখল কি? কিন্তু না। ভ্রম হবে কেন? সত্যিও তো হতে পারে।

আকাশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পর রাঘবনের সমুদ্রযাত্রারও শখ হল। করাচী কংগ্রেসের দর্শনার্থীরা অনেকে সমুদ্রপথে বোম্বাই ফিরছিলেন। রাঘবনও একটা টিকিট কেটে সিন্ধিয়া কোম্পানির একটা জাহাজে উঠে বসল। জাহাজটা ছোট, সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষেই চলে। মালমশলা আসবাবপত্র বিছানা-পেঁটরা বাসন-কোসন, কাপড়চোপড় আর খাবারদাবার জিনিসে বোঝাই। লোকে লোকারণ্য। ভিড়ে, চেঁচামেচিতে নরক গুলজার। প্রচণ্ড চীৎকারে কর্ণপটহ তো ছোট জিনিস, ওর ভয় হতে লাগল যে জাহাজটাই না ফেটে পড়ে। দুহাতে মাথা টিপে রাঘবন ককিয়ে ওঠে—"ভগবান,

এ আমার কী দুর্বুদ্ধি হল? আটত্রিশ ঘণ্টার দীর্ঘ রাস্তা এখন কেমন করে কাটাব?" কিন্তু ভগবান তার বিলাপ শুনেই আরামের ব্যবস্থা করে দিলেন। জাহাজ ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে যে মেয়েরা উঠে আসছিল, তাদের দিকে চেয়েই রাঘবনের মুখ এক মুহূর্তে উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। নরকতুল্য জাহাজ এক মুহূর্তে অপ্সরভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সামনেই তারিণী, রাঘবনকে দেখে তার দুচোখ বিস্ময়-বিস্ফারিত। রাঘবন ভাল করে সে চোখের ভাষা পড়ে দেখল বিস্ময়ের চেয়ে আনন্দের মাত্রাই সেখানে বেশি।

রাঘবনের এই প্রথম বোম্বাই যাত্রা। তারিণী বোম্বাইয়েরই বাসিন্দা। উত্তর ভারতের জীবনচর্যা সম্পর্কে রাঘবনের অনেক কৌতূহল ছিল। তারিণীরও জিজ্ঞাসা ছিল দক্ষিণ ভারতের জীবন সম্পর্কে। কাজেই পরস্পরের কথা বলার অনেক বিষয়বস্তু। কথায় কথায় রাঘবন জানল তারিণী তামিল জানে। সোনায় সোহাগা! রাঘবনের সৌভাগ্য সীমাহীন।

জাহাজে তারিণীদের মত আরো অনেক দেশসেবিকা ছিল। নিরুপমা রূপে তারিণীর কাছে ম্লান হলেও, তার গলা অতুলনীয়। দেশানুরাগদীপ্ত নানান গানে তার অদ্বিতীয় দক্ষতা। অন্য মেয়েরাও নিরুপমার নেতৃত্বে স্বদেশী গানের ঐকতানে জাহাজ ভরিয়ে দিচ্ছিল। 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' আর ইকবালের জনপ্রিয় রচনা 'সারে জঁহা সে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামারা' গাইছে সব মেয়েরা মিলে। রাঘবনের এ এক বিচিত্র অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। এরা যেন গন্ধর্ব-লোকের সুরকন্যার দল। এ গান যেন কিন্নরলোকের গান। সব গানের অর্থ বুঝতে পারছিল না রাঘবন। তারিণী বুঝিয়ে দিল। শিহরণ জাগে রাঘবনের অঙ্গে গানের মর্মার্থ শুনে। "তাই তো! সত্যিই তো!" রাঘবন মুগ্ধ। বলে—"বিশ্বের সেরা দেশ এই রমণীয় ভারতভূমি— যেখানে তোমার মত সুন্দরীর জন্ম। পৃথিবীতে আর কোন দেশ নেই এর সঙ্গে যার তুলনা চলে।" শুনে মুখ

টিপে হাসে তারিণী। গালে টোল পড়ে তার। রাঘবন মুগ্ধ আবেশে তাকিয়ে দেখে— 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য', চোখে পলক পড়ে না তার।

...

এসব বছর তিনেক আগের কথা। সেই থেকে তারিণীতে রাঘবনেতে চিঠি লেখালেখি। তারপর সম্পর্কটা নিছক চিঠির কাগজেই সীমিত রইল না। একবার রাঘবনকে আপিসের কাজে বম্বে যেতে হল। তারিণী তাকে এলিফেন্টা দ্বীপের অনুপম গুহা-চিত্র দেখিয়ে আনল। আবার তারিণী যখন দিল্লী গেল— দিল্লী রাঘবনের কর্মস্থল— ঐতিহাসিক নগরীর প্রাচীন কেল্লা, আকাশচুম্বী মসজিদ আর মোগল বাদশাদের স্মৃতিজড়িত মর্মরপ্রসাদের চাঁদনী-ধোয়া চত্বরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাঘবন তাকে অনেক কথা বোঝাল। তাদের অন্তরঙ্গতা বাড়ল।

সংক্ষেপে, এই তিনটে বছর রাঘবনের জীবনের স্বর্ণযুগ। একদিকে চাকরীতে ধাপে ধাপে উন্নতি, শনৈ শনৈ তুঙ্গশীর্ষে উঠে চলা। বিভাগীয় বড়কর্তা ইংরেজ। সে তাকে বিলেতে নিয়ে যেতে চায়। অন্যদিকে প্রেমের কল্পলোকের স্বপ্নছায়া বিছানো পথেপথে আনন্দ মৌমাছির মত গুঞ্জরণ করে বেড়ানো। পায়ের তলায় সোনার পরাগ, কানে দিনরাত খালি বীণার গুঞ্জন, আর কুহু-কাকলি!

সেসব দিন কি তবে অবসান হয়ে গেল? এত দ্রুত। কেন গেল? কী করে গেল? রাঘবন কিছু বুঝতে পারে না, তার বিশ্বাস হতে চায় না কিছু।

অতিথিরা চলে যাবার পর কামাক্ষী অন্দরমহলে যান। রাঘবন চিন্তাক্লিষ্ট মুখে হ্যামকে মৃদু মৃদু দুলছিল। কামাক্ষী দেয়ালের গায়ে ঠেসান দেওয়া চেয়ারে এসে বসলেন। রাঘবন কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে মার মুখোমুখি সোজা তাকিয়ে বলে— "মা। তুমি আর বাবা দুজনে মিলে আমার জীবনটা বরবাদ করে দিতে চাও? আমায় সুখী হতে দেবে না বলে পণ করেছ, তাই না? বাবার মত তুমিও কি স্বার্থপর হয়ে উঠলে?"

রাঘবনের মুখ থেকে এরকম রাগের কথা শুনবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল কামাক্ষী। তাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অবিচল শান্ত স্বরে জবাব দিল :—

"রাঘব! তোমার বাবার কথা তুমি তাঁকেই জিজ্ঞেস কোরো। সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার নিজের কথাই আমি বলতে পারি। যেদিন থেকে তোমার জন্ম হয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই চব্বিশ বছরের মধ্যে তোমাকে সুখী করার চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা আমি কোনদিন করি নি। তুমি বড় হয়েছ, কর্তব্য বুঝতে শিখেছ। তাই স্বার্থপরতার কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না।"

কথা বলতে বলতে কামাক্ষীর চোখ জলে ভরে ওঠে।

"আমার সুখই যদি তোমার কাম্য হবে, তবে তারিণীকে কেন ওভাবে তাড়ালে?"—রাঘব রুষ্ট স্বরে প্রশ্ন করে।

"ছিছি··· এ তুই কী বলছিস রে? ঐ মেয়েটাকে আমি তাড়িয়েছি? তুই বুঝে দেখ দিকি, তাড়ালে যাবার মত মেয়ে কি সে? তা ছাড়া তোর ওপর যদি ওর টানই থাকবে, আমি বললেই চলে যাবে? একটু ভেবে চিন্তে কথা বলবি না?"

মার কথা শুনে রাঘব একটু চিন্তায় পড়ে যায়। তারপর বলে, "সত্যিকথা বল তো, আমার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে কী কী হয়েছে?"

"সে আর কী বলব বাছা! সে মেয়ের যা সব কথার ছিরি, তা আমার মুখে আনার সাধ্যি নেই। বলে কত কী কল্পনা করে এসেছিল, তারপর এবাড়ির ছিরি দেখে নাকি ও দশহাত দমে গেছে। আমার মুখের ওপর তোর বাপকে আর আমাকে বেআক্কেলে গেঁয়ো বলে গেল। তা সে আমাদের যাই বলুক আর যাই ভাবুক কিছু আসে যায় না। তাতে আমার কোন খেদ নেই। কিন্তু তোর ওপর তার ধারণাটা কি জানা আছে তোর? তা জানলে আর তুই কথা তুলতিস না। সে মেয়ে তোমায় বলে উজবুক, নিরেট আহাম্মক। রাঘব, আমার বাপু এসব সহ্য হয় না, তা তুমি যাই

বল। সে কী চেটাং চেটাং কথা মেয়ের। তোমার সম্পর্কে বলছে— তুমি নাকি শাড়িপরা মেয়ে দেখলেই হ্যাংলার মতন তার পেছনে দাঁত বের করে ঘোরো। তুমি যখন জানতেই চাইছ তখন বলি, তোমাকে যাতে আমি বুঝিয়ে সুজিয়ে পথে আনি সেই কথা বলতেই তার মাদ্রাজে আসা। আমি আর কাঁহাতক বরদাস্ত করি বল তো?"— কামাক্ষী কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন, আঁচল দিয়ে বারবার চোখ মুছতে থাকেন।

রাঘবন রাগে আগুন হয়ে ওঠে। কিন্তু রাগটা কার ওপর, তারিণীর ওপর না তার মার ওপর, কিছুতেই ধরতে পারে না।

হঠাৎ তারিণীর চিঠিতে লেখা একটা কথা মনে পড়ে যায়। বলে, —"হয়েছে হয়েছে, চুপ কর। কান্নাকাটি থামাও। একটা সোজা কথার জবাব দাও দেখি। তুমি কিসের জন্যে তারিণীর পায়ে ধরেছিলে, আর কী তোমার উদ্দেশ্য ছিল, কী চেয়েছিলে?"

"ও, সে কথাও লেখা হয়েছে! বাব্বাঃ মেয়ে বটে একখানা, ধন্যি! জানি না আরো কত কাণ্ড সাজিয়ে গুছিয়ে লিখেছে! তা হোক, আমার কী। আমি তো আর কিছু বানিয়ে বলছি না। যা বলব, সত্যিই বলব। আমার সঙ্গে যেরকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলতে লাগল তা শুনে আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি তাকে বললুম যে মা, আমি তো ভগবানের কাছে সর্বদাই প্রার্থনা করি যে যাই কর ভগবান আমার ছেলে যেন সুখী হয়। তা জাতপাঁত কুলশীল চালচলন তোমার সব আলাদা হলেও তুমি আমাদের ভাষায় কথা বলতে পার এইই আমার অনেক। তবে মা, আমার একটাই প্রার্থনা আমার ছেলেকে যেন পর করে দিয়ো না। তোমাদের দুজনের যেখানে ভাল লাগে সেখানেই থাক, আমাকেও একটু জায়গা দিয়ো। তোমাদের সেবা করেই আমি ধন্য হব। ব্যস আমাকে এই একটা ভিক্ষে দাও। আমি তোমার পায়ে পড়ছি। এই কথা বলে আমি সত্যিই তার পায়ে হাত দিয়েছিলুম। বাবা রাঘব, জানি আমার কথা বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে শক্ত, তবে আমি কিন্তু সত্যি বলছি

আমি জানি না কেন সে মেয়ে এত তাড়াতাড়ি এবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তবে একদিন কে একজন এসে দোরে কড়া নাড়ল। বলে, তারিণীদেবী এখানে আছেন? শুনেই সে তড়াক করে গিয়ে সেই লোকটার সঙ্গে কী খানিক ফুসফুস গুজগুজ করে একটা খামের চিঠি নিয়ে ফিরে এল। তারপর চিঠিটা পড়তে পড়তে বললে—"আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। আপনার ছেলের কোন ক্ষতি করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" পরক্ষণেই ডিঙি মেরে লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ ফেলে ফেলে সদরে গিয়ে, গাড়ি তৈরীই ছিল তাতে চড়ে বসল। হাওয়াগাড়িও সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল।··· হ্যাঁ যাবার সময়ে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা ভুলে ফেলে গেছে বোধহয়। আমি যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছি। দেখতে চাও তো দেখতে পার।'— এই বলে কামাক্ষী উঠে গিয়ে আলমারী থেকে একটা খাম বের করে এনে ছেলের হাতে দিল। রাঘবন কম্পিতচিত্তে চিঠিখানা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলল :

"প্রিয়তমা! আমার কাজ আশাতীত দ্রুততায় শেষ হয়ে গেছে। আজ সন্ধের মেলেই বোম্বাই রওনা হয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে যদি তুমি হোটেলে আসতে না পার তো সোজা রেলস্টেশনে চলে এস। তোমার টিকিট কেনাই থাকবে। রাঘবন সাহেবের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় কদ্দূর জমল। রাঘবনের দুহাজার টাকা জরিমানা তো আগেই হয়েছে। আরো কিছু দণ্ড লাগাতে পার তো বলা যায় না, ভালমন্দ কিছু হয়ে যেতেও পারে।"

পড়েই রাঘবনের চোখ থেকে আগুনের ফুলকি ছুটতে থাকে। তার বুকের ভেতর থেকে একটা আগ্নেয়গিরি অনর্গল অগ্নিবমন করতে থাকে। ঘন ঘন জ্বলন্ত নিঃশ্বাস বইতে থাকে। রাঘবন অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়।

"আমার মতন বেকুব সত্যিই ভূভারতে নেই। তারিণী এই একটা

কথা ঠিকই বলেছে। আমার জন্যে তোমাকে সেই মেয়েটার পায়ে পড়তে হয়েছে, ছিছি, আমি তোমায় কী লাঞ্ছনাই করেছি। মা, তুমি হলে আমার দেবতা। আজ থেকে তুমি যা বলবে তাই করব। যে মেয়ে ঠিক করবে তাকেই বিয়ে করব। তোমার মনে কক্ষনো দুঃখ দেব না।"—সুন্দর রাঘবন প্রায় শপথ বাক্য উচ্চারণ করে।

পাঁচ

বোম্বাই নগরীর দাদর অঞ্চলে এক অখ্যাত গলি, সেই গলির ঠিকানা খুঁজে বার-করা সহজ নয়। সেই গলির ভেতরে এক আরো অজানা বাড়ি। সেই বাড়ির চারতলায় তিনখানি কামরা আর স্নানাগার-সমন্বিত এক বাসায় কিট্টাবাইয়ারের বোন রাজম্মাল গত বিশবছর থেকে বসবাস করছে। ঐ একই বাড়িতে সে তার দাম্পত্যজীবনের সুখদুঃখের বিশটি বছর অতিক্রান্ত করেছে। ঐ ঘরেই তার কয়েকটি শিশু সন্তানকে যমের মুখে সঁপে দিয়ে বুক ভেঙে কেঁদেছে। ঐ ঘরেই একদিন স্বামীর সঙ্গে সোহাগসুখ ভোগ করেছে। আবার ঐ ঘরেরই একান্ত নির্জনতায় স্বামীর বিভ্রান্তিকর আচরণে উত্ত্যক্ত পীড়িত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছে।

ঐ তিন কামরার একখানি কামরায় রাজম্মাল আজ শয্যাশায়ী। রোগশয্যায় কুড়িটি দিন কেটেছে। আর কোনদিন বিছানা ছেড়ে উঠবে কিনা কেউ বলতে পারে না।

এদিকে গত এক বছর যাবৎ সীতার স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বছর খানেক ধরেই রাজম ভাবছিল কী জানি কীরকম ঘরে মেয়ে পড়বে, ঘরের কাজ অল্পবিস্তর শিখে রাখা ভাল— এই ভেবে সে মেয়েকে হেঁশেলের কাজ শিখিয়েছিল। আজ তার সেই শিক্ষা বড়ই কাজে লাগছে।

নিজেদের ভাগের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সীতা উৎসুক চোখে গলির দিকে তাকিয়েছিল। কামরার ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক ভেসে আসে—"সীতা !"

"আসি মা।" সীতা জবাব দেয়।

"বাইরে যেন কার থামার আওয়াজ হল না রে ?"

"না মা। ও কার আর-কোথাও যাচ্ছে। এখনো সময় যায় নি। ট্রেন হয়তো সবে এসে পৌঁচেছে। স্টেশন থেকে বাড়িতে আসতে মিনিট পনেরো তো লাগবেই। এত উতলা হলে কি চলে ?"—সীতা মার মনের কথার জবাব দেয়।

ইতিমধ্যে আবার কারের শব্দ শুনে সীতা দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে ওদের বাড়ির দরজায় কার এসে দাঁড়াল।

"মা, মামা এসে গেছেন। আমি নিচে গিয়ে নিয়ে আসি।"—উল্লাসে চীৎকার করে সীতা লাফ দিয়ে সিঁড়িতে নামে। সে দোতলায় পৌঁছবার আগেই হাতে ব্যাগ নিয়ে আগন্তুকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। সীতা দাঁড়িয়ে পড়ে। নিঃশ্বাস ফেলে বলে—'ডাক্তারবাবু: গাড়িতে আপনি এলেন ? আমি ভাবলুম আমার মামা বুঝি গ্রাম থেকে এলেন।"

"তাই নাকি! তোমার মামার বুঝি আজ আসবার কথা ? দেখা যাক্, তোমার মামা এলে হয়তো তোমার মার শরীর সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।"

সীতা ডাক্তারের হাত থেকে হ্যাণ্ড ব্যাগটা নেয়। দুজনে মৌন মুখে ওপরে উঠে আসে।

ডাক্তার রুটিন মাফিক থার্মোমিটার দিয়ে রুগীর জ্বর দেখেন। তারপর পিঠে নল লাগিয়ে পরীক্ষা করেন। সরু টর্চ জ্বেলে গলনালীর অভ্যন্তরে সমাচার পাঠ করেন। এসব পর্ব শেষ করে চিরকুটে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখছেন এমন সময় দুরাইস্বামীর সঙ্গে কিট্টাবায়ার ঘরে ঢুকল।

রাজমের চেহারা দেখে কিট্টাব স্তম্ভিত। অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা নিয়েই ও গ্রাম থেকে বেরিয়েছিল। মাদ্রাজে শাস্ত্রীর বাড়িতে হবু জামাইয়ের মুখ দেখার পর আর সুব্বা আয়ারের আশ্বাসবাণী শোনার পর— যে এই ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে একেবারে নিশ্চিত হবেই— তার উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠা খানিকটা কমে গিয়েছিল। বরং

খানিকটা উৎসাহই এসেছিল মনে। মনের সেই উৎসাহই ওর মনকে যেন বুঝ দিচ্ছিল—'রাজমের শরীর নিশ্চয়ই তেমন খারাপ হয় নি। সামান্য জ্বরটর হয়েছে হয়তো।'

এখন রাজমের দীর্ঘরোগশ্রান্ত জীর্ণদুর্বল শরীরের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। সজল নেত্রে ডাক্তারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে—"কেমন বুঝছেন ডাক্তারবাবু ?"

"আর কী ? আপনি এসে গেছেন এবারে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমার মনে হয় আপনার বোনের দৈহিক অসুখের চেয়ে মানসিক অসুস্থতাই বেশি। এবার তো ধরেই নিয়েছেন যে ওঁর অসুখ আর সারবে না। এরকম চিন্তা থাকলে আমি হাজার ওষুধ দিলেও তো ফল হবে না।" ডাক্তার উঠে দাঁড়ান। দুরাইস্বামী তাঁকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে যায়।

কিট্টাবায়ার এতক্ষণ চোখের জল চেপে রেখেছিল। এবার বাঁধ ভেঙে যায়। ছোটবোনের শিয়রে বসে সে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে। তারপর গামছায় চোখ মুছে বলে—"কোথায় তোকে বোঝাব, তা না কেঁদেকেটে তোর মনটা আরো ভারী করে দিলুম। আসলে আমার কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, এতদিন তোর খবর নিই নি কেন ?"

"তোমার কোন দোষ নেই দাদা। তুমি এতদিন খোঁজখবর নিলেও আমার কিছু হত না। এ আমার ভাগ্যের দোষ, তুমি কী করবে ? তুমি যদি না আসতে পার, তা হলে আমি কী করব তাই ভেবে মরছিলাম। ভালই হল, তুমি এসে পড়েছ। আমার মনের ভেতরের কতকগুলো কথা তোমায় বলতে পেরে এবার হালকা হব। তারপর শান্তিতে চোখ বুজতে পারব। ভগবানের চরণে স্থান পেয়ে বাঁচব।"

বোনের কথা শুনে কিট্টাবায়ারের বুক ফেটে যায়। কোনমতে কান্নার বেগ সামলে বলে—"পাগলী কোথাকার, তোর কী এমন হয়েছে যে আজেবাজে বকছিস ? কিছু হয় নি। ভগবান সব ঠিক

করে দেবেন। আবার ভাল হয়ে উঠবি। সীতার বিয়ে দিবি, নাতিনাতনীর মুখ দেখবি।"

রাজম হাসে। সে হাসিতে নিরাশার বেদনা। আসন্ন মৃত্যুর ঘন বিষাদছায়ায় এক লহমার হাসির আলো মুহূর্তের জন্যে ঝলমলিয়ে উঠে আবার নিবে যায়।

একফাঁকে রাজমের চোখ পড়ে মেয়ের ওপর। দোরের পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সীতা নিঃশব্দে অঝোরে কাঁদছে। তাকে ইশারায় কাছে ডেকে বলে— "সীতা। চুপ কর। মামা কত কষ্ট করে এতদূর থেকে এলেন। কফি করে খাওয়াবি না?"

"এক্ষুনি করে আনছি।" সীতা একছুটে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

সে চোখের আড়ালে চলে যাবার পর রাজম বলে—"দাদা! পরে আর সময় পাব কিনা জানি না। তোমাকে যা বলবার সেটা এখনই বলে নিই। কিন্তু তার আগে একটা কাজ আছে। সঙ্গে বাক্স-পেঁটরা কিছু এনেছ তো? সেটা আমার হাতের কাছে নিয়ে এস।"

রাজমের ব্যস্ততার কারণ বোঝে না কিট্টাব। বলে— "বাক্স তো এনেছি। সেটা বাইরের ঘরে রয়েছে। কিন্তু এখনই সেটা এখানে আনার কী দরকার? থাক-না।"

"আছে দরকার, দাদা। বিনা কারণে বলছি না। আমার কথা শোন। আর বাক্সটা আনার আগে মুখ বাড়িয়ে দেখ, তোমার ভগ্নীপোতও ডাক্তারের সঙ্গে গাড়িতে উঠছে কিনা। ও প্রায়ই ডাক্তারের সঙ্গে যায় ওষুধ আনতে।"— রাজম এক নিঃশ্বাসে কথা বলে চলে।

"শোন, বোনটি। অসুস্থ শরীর। এরকম একদমে এত কথা বলিস নি। আমি তো আজকের ট্রেনেই বাড়ি ফিরে যাব বলে আসি নি। দুটো দিন যাক। ধীরে সুস্থে কথা বলা যাবে'খন।"

কিট্টাবায়ারের কথা শেষ হবার আগেই রাজম বলে ওঠে—"সময়

বেশি নেই দাদা। কথাটা ভীষণ জরুরী। সময় থাকতে থাকতেই বলে নিতে চাই।"

কিট্টাবায়ার দেখল ওর সঙ্গে তর্কাতর্কি করা বৃথা। সে বারান্দায় গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল রাজমের কথাই ঠিক। তুরাইস্বামী ডাক্তারের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর কিট্টাবায়ার বারান্দা থেকে বাইরের ঘরে গিয়ে তার বাক্সটা রাজমের শোবার ঘরে নিয়ে এল।

রাজম বললে— দাদা "দোরটা খিল দিয়ে বন্ধ কর। আর বাক্সটা আমার কাছে নিয়ে এস।"

কিট্টাবায়ার খুব অবাক হলেও রাজম যা যা বলল তাই তাই করল।

রাজম চট করে বিছানায় উঠে বসল। মাথার নীচ থেকে একটা বালিশ তুলে তার ওয়াড়টা খুলে ফেলল। তারপর বালিশের খোলের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে তুলোর ভেতর থেকে প্রথমে তুটো টাকার তোড়া, তারপরে একটা অপরূপ সুন্দর দামী রত্নহার বার করল। বললে—"দাদা, এই তোড়ায় তুহাজার টাকা আছে। এই টাকাটা আর এই হারটা তুমি সাবধানে তোমার বাক্সর ভেতরে রেখে দাও।··· তাড়াতাড়ি কর।"

কিট্টাবায়ারের মনে কিছুটা দ্বিধাসংশয় এলেও কিছু বলতে পারল না। খানিকটা যেন স্বপ্নের ঘোরের মধ্যেই সে যন্ত্রচালিতের মতন টাকা আর গয়না বোনের হাত থেকে নিয়ে নিজের বাক্সে রাখল। তারপর তার গায়ে ভাল করে তালা লাগাল। তারপর বোনের দিকে ফিরে বসল।

"দাদা, এবার তোমায় কটা কথা বলব। এ কথা তুমি ছাড়া আর কাউকে বলতেও পারি না। তোমাকে এ কথা বলে যেতে না পারলে আমি মরেও শান্তি পাব না।"

"শোন্, রাজম্। তুই বড় বেশি কথা বলছিস। কথারও কোন মাথামুণ্ডু নেই। তুই একটু চুপ করে শুয়ে থাক দিকি। আমি

তোর কোন কথা শুনতে চাই না।" কিট্টাবায়ার বোনকে বাধা দেবার চেষ্টা করে।

রাজম একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। ক্লান্তিটা খানিকটা কম হতেই আবার মুখ খোলে—

"তুমি শুনতে না চাইলেও আমায় বলতেই হবে। ঐ দুহাজার টাকা সীতার বিয়ের জন্যে রেখ। রত্নহারটাও ওকে বিয়ের সময় দিয়ো। সীতার বিয়ের ব্যবস্থাও তোমাকেই করতে হবে দাদা। তুমি ওকে তোমার সঙ্গে গাঁয়ে নিয়ে যাও। সেখানেই খোঁজখবর করে ওর জন্যে একটা ছেলে দেখে ওর বিয়েটা দিয়ে দিয়ো। তুমি কথা দাও, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। আর বলা যায় না, সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হলে হয়তো ডাক্তারের কথামত সেরেও উঠতে পারি।"

"হ্যাঁরে রাজম, এটা একটা কথা হল? সীতা কি আমার পর? আমি তাকে নিরাশ্রয়ে ভেসে যেতে দেব? ললিতা আমার মেয়ে, আর সীতা আমার মেয়ে নয়? ওর বিয়ের জন্যে সম্বন্ধ দেখা, ভাল ঘর-বরে ওর বিয়ে দেওয়া এসব তো আমার কর্তব্য। ওর বিয়ে খুব ধূমধাম করেই হবে, তুই নিজের চোখে দেখবি, আনন্দ করবি, সব হবে। সেসব নিয়ে তুই ভাবিস নি। কিন্তু কথা হল, সীতার বিয়ের জন্যে তুই আলাদা করে টাকা জমাচ্ছিস, তোর স্বামীকে না জানিয়ে, কেন রে? ধর যদি জানতে পারে তো কী ভাববে, সে কথা কি ভেবে দেখেছিস? তোকেই বা কী ভাববে, আর আমার ওপরেই বা কী ধারণা জন্মাবে তার? তোর এসব ব্যাপার আমার মোটেই পছন্দ নয়।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। বুঝিয়ে বলছি। বিশ্বাস কর, আমি অন্যায় কিছু করছি না। সীতার বাবার একটা পয়সাও আমি চুরি করে রাখিনি। বরং তোমরা বিয়ের সময় স্ত্রীধন বলে আমায় যেসব গয়নাগাঁটি দিয়েছিলে, কিংবা ইনিও বিয়ের পরে গোড়ার দিকে যেসব গয়না আমায় দিয়েছিলেন, সবই আমি তাঁর অসুবিধের দিনে তাঁর

হাতেই তুলে দিয়েছি। ওঁর কাছে সংসার খরচের জন্যে যা পাই, তা থেকে এত টাকা বাঁচাব কী করে? বোম্বাই শহরে সংসার চালিয়ে তো দেখ নি, তাহলে বুঝতে আমার কথা। এই টাকা আর হার, ভগবানের দয়ায়, সীতার বিয়ের জন্যেই পাওয়া গেছে। সব শুনলে তোমার গল্পকথা মনে হবে। শোন দাদা, যা বলব তা কিন্তু জীবনে কোনদিন সীতার বাবাকে বলবে না। শুধু তাকে কেন, কাউকেই বোলো না। এমন-কি বাড়িতে বৌদিকেও না।...”

“আচ্ছা আচ্ছা, বলব না। ভাল হয়, তুই নাহয় আমাকেও না বললি। বেশি কথা বলতে তোর হাঁপ ধরছে, একটু চুপ করে শো না। তোকে এরকম কষ্ট দেবার জন্যেই কি আমি বোম্বাইয়ে এলুম?”

“আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না, তুমি শোন তো!’—রাজম তার অকথিত কাহিনী শুরু করে—“ঠিক কুড়ি দিন আগে আমি বিছানায় পড়েছি। একদিন সন্ধের সময় দেবীর ছবির সামনে ধূপদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করে, মাকে খুব আকুল হয়ে ডাকলাম—‘মা, আমার মেয়েটাকে দেখো। ওকে একটু দয়া কর। ওর যেন ভাল বিয়ে হয়, ও যেন সুখী হয়।’··· প্রণাম করে উঠে শরীর মন কেমন যেন ভারভার লাগছিল তাই খাটে এসে শুয়ে পড়লাম। সীতা বাড়িতে ছিল না, বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। উনিও অফিস থেকে ফেরেন নি। আমার মাথাটা খুব ঘুরছিল, চোখে যেন অন্ধকার দেখছিলাম। জোর করে চোখ বুজে খাটে শুয়ে রইলাম। তার-পর একটু ধাতস্থ হয়ে চোখ খুলতে দেখি ঘরের ভেজানো দরজাটা আধখানা খোলা। দোর খোলার শব্দেই হয়তো তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছিল।... কিন্তু দোর খুলল কে?— সীতা না সীতার বাবা? আমি ভাবছি, এমন সময় দোরটা পুরোপুরি খুলে গেল। সীতাও না তার বাবাও না। ভেতরে এল একটি মেয়েমানুষ। সম্পূর্ণ অপরিচিতা। মাথায় ঘোমটা। আমার কাছে এগিয়ে এসে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল— ‘রাজম্মাল তুমিই না?’ কুড়ি বছর এখানে আছি।

হিন্দীটা মোটামুটি ভালই বলি। তবুও চট করে জবাব দিতে পারলাম না। দোনোমোনো করছিলাম— কী জানি কে? কেনই বা জানতে চাইছে?

মহিলা এবার অধৈর্য হল—'শোন বোন, আমি একটা জরুরী কাজে এসেছি, বৃথা সময় নষ্ট করতে আসি নি। তুরাইস্বামী আয়ারের স্ত্রী রাজম্মাল তুমিই কিনা।' কোন রকমে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল—'হ্যাঁ।' 'তোমার কথায় বিশ্বাস কী?' এই বলে সে চারদিকে চনমন করে চেয়ে দেখতে লাগল। দেয়ালে আমাদের তুজনের ছবি দেখে কাছে গিয়ে ভাল করে ঠাহর করে দেখল খানিকক্ষণ। তারপর আবার আমার কাছে ঘুরে এসে বলল—'হ্যাঁ তূমিই রাজম্মাল, এতে আর কোন সন্দেহ নেই,' এই কথা বলে সে তীরের মতন দরজার কাছে চলে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। এবার আমার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের হাতব্যাগ খুলে কী যেন বার করল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—'রাজম্মা তোমায় যা বলতে যাচ্ছি, তা শুনে তুমি হয়তো অবাক হবে। কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। কথাটা বলছি। কিন্তু তার আগে এই তুহাজার টাকা আর হীরেমুক্তোর হারটা তুমি ধর। হারটা খুব দামী। এই হার আর টাকা তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে স্ত্রীধন হিসেবে আমি দিচ্ছি। ভাবনাচিন্তার বা দ্বিধাসংকোচের কিছু নেই। নাও।'…

আমার বিস্ময় যত বেশিই হোক তার মধ্যেই একটু স্বস্তির আনন্দ মিশে ছিল আবার, শঙ্কা বা অস্বস্তিও ছিল। কে, কী বিত্তান্ত, কিছুই জানি না। একটা মানুষ যেচে এসে ধনরত্ন দিয়ে যাচ্ছে। সাধছে। কিন্তু তার কথা উপেক্ষা করতে পারলুম না। সে তু-একবার জোর করে 'নাও, নিতেই হবে।' বলতেই আমি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলুম। সে বলল—'সাবধানে রাখবে।' আমি বললুম—'আচ্ছা। আমি পরে বাক্সে তুলে রাখব।' এই বলে আমি জিনিসগুলো বালিশের ভেতরে লুকিয়ে রাখলুম।… তারপর

সে বলল—'রাজম্মা! আমার এভাবে বাড়ি চড়াও হয়ে এসে তোমাকে টাকা আর গয়না দেওয়ায় তুমি খুবই অবাক হয়ে গেছ, বুঝতে পারছি। বিশেষতঃ আমি তোমার কাছে একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু তুমি আমায় না চিনলেও আমি তোমায় খুব ভাল করেই চিনি। অনেকদিন আগে আমি তোমার ক্ষতি করেছিলাম। অবিশ্যি জেনেশুনে করি নি। তবুও তারই খেসারত স্বরূপ আমার এই দান। এ দান তুমি নিজের কাছে গোপনে যত্নে রাখ। মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিও। কিন্তু ভুলেও কাউকে বোলো না যে আমি তোমাকে দিয়েছি। একান্ত প্রয়োজনে যদি বাইরের কাউকে জানাতে হয়ও, তোমার স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে। বুঝেছ?' আমি সম্মতি জানাই। 'আমার কথামত কাজ হবে তো?'—সে আবার জিজ্ঞাসা করে। এবার আমি মৌন থাকি। এবার হঠাৎ তার চেহারা বদলে গেল। ঠিক যেন শ্মশানকালী। চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। ঝট করে হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে কা একটা জিনিস বার করে। ঝকমকে ধারালো একখানা ছুরি। আমার চোখের ওপর ছুরিটা বাড়িয়ে ধরে সে বলে—'শোন রাজাম্মা। আমি ভালর ভাল মন্দের যম। আমার কথা তোমায় অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। আমি যে এখানে এসেছিলুম এ কথা তোমার স্বামী যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। যদি জানতে পারি যে তুমি তাকে বলে দিয়েছ, তা হলে আরো একদিন আমি আসব। এই ছুরি দিয়ে তোমার বুকপেট চিরে দিয়ে চলে যাব। কেউ বাঁচাতে পারবে না। খবরদার!'

তারপর চামড়ার থলিটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে চলে যেতে যেতে আর একবার আমায় শাসিয়ে গেল—'রাজম্মা, খবরদার আমার কথার যেন অন্যথা না হয়।' বলে বেরিয়ে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে তার দরজা খোলার, সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দ স্পষ্ট শুনলাম। তখন আমার ধড়ে প্রাণ এল। একবার ভাবলাম, তবে কি দুর্বল শরীরে স্বপ্ন দেখছিলাম। তারপর বালিশ হাতড়ে টাকা আর হার

পেলাম। তবে তো স্বপ্ন নয়—সত্যি ঘটনা তো। ইতিমধ্যে সীতা এসে পড়ল। 'মা কার যেন গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম, কেউ কি এসেছিল ?… একি এই অবেলায় শুয়ে আছ কেন মা ?' বলতে বলতে দোর দিয়ে ঘরে ঢুকেই সীতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—ঘরের মেঝেয় চকচকে ছুরিটা দেখে সে চমকে উঠেছে। 'মেঝের ওপর ছুরি কেন মা ? এর বাঁটটা কি অদ্ভুতরকম দেখ মা' এই বলে, ছুরিটা তুলতে যেতেই আমি বাধা দিলাম। বললাম—'না সীতা ও ছুরি ছুঁসনি।' আমার গলায় উদ্‌বেগের স্বর শুনে সীতা ছুরির কাছে না গিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আমি ছুরিটা নিয়ে কী করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না— ইতিমধ্যে সিঁড়িতে আবার হুড়দাড় পায়ের শব্দ শোনা গেল। ছুরিটা লুকিয়ে ফেলব, না কি দোরটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেব। ভেবে ঠিক করার আগেই সেই মেয়েমানুষটা ঝড়ের বেগে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঢুকে সিধে মেঝের ওপর থেকে ছুরিটা কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাতের থলিতে রেখে দিল। তারপর আমার আর সীতার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—'রাজাম্মা। এই বুঝি তোমার মেয়ে।' আমি বললুম—'হ্যাঁ।' চট করে সে সীতাকে বুকে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমু খেয়ে গালে চুমু খেয়ে অজস্র আদরের বন্যা বইয়ে দিল। তারপর 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। পুরুষদের অত্যাচার থেকে বাঁচান।' এই বলতে বলতে যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল, তেমনি করেই বেরিয়ে চ'লে গেল। সিঁড়ি দিয়ে তার পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর সীতা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—'এ পাগলীটা কে মা ?' শুনে আমি বললাম—'পাগলী নয় সীতা, খুব ভাল মেয়ে। আমার পুরনো সখি।' আমি মিথ্যেকথাই বললাম। কিন্তু কী জানি কেন সাজানো কথা বলতেই আমার কেমন যেন ভাল লাগল।…"

সব শুনে কিট্টাবায়ার মনে মনে ভাবে—'সবটাই বাছা তোমার মিথ্যে সাজানো কথা। নিরুপায় হয়ে মেয়ের কল্যাণের কথা ভেবে

স্বামীকে লুকিয়ে চুরিয়ে টাকা জমিয়েছ। এখন কী আর বলবে, তাই আমায় মনগড়া কাহিনী শোনালে।' তবে কিট্টাবায়ারের মনে বোনের বিরুদ্ধে কোন বিরূপতা এল না। সে ভাবল, 'এটা খুবই স্বাভাবিক। বরং অনুকম্পা বাড়ল— আহা রে মায়ের প্রাণ। মেয়ের ওপর মমতায় ছোট কাজ করতেও বাধে না।'

দ্বিতীয় দিন ডাক্তার এসে রোগিণীকে পরীক্ষা করে বলল— 'আজ তো স্বাস্থ্যের অবস্থা অনেকটা ভাল দেখছি।' ব্যবস্থাপত্র লিখবে বলে কলম আর প্যাড হাতে নিয়ে ওষুধের কথা ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ অন্য কী ভেবে বলল—"আচ্ছা মিস্টার দুরাইস্বামী। একটা কথা বলব ?"

"নিশ্চয়ই। অনুমতি নেবার কী আছে ? বলুন না"—দুরাইস্বামী বলে।

"আপনার স্ত্রীর জন্যে একটা খুব ভাল চিকিৎসার কথা আমার এইমাত্র মাথায় এল। আগে খেয়াল করি নি। এই বোম্বাই শহরেই তো কুড়িবছর ধরে একনাগাড়ে রয়েছেন। ক'দিনের জন্যে একটু আর কোথাও থেকে এলে ক্ষতি কী ? বলা যায় না, হাওয়া বদল করলে হয়তো আপনা থেকেই শরীরটা সেরে উঠতে পারে। আপনার সম্বন্ধী মশায় যখন গ্রামের বাসিন্দা, তখন ওঁর সঙ্গেই কিছুদিন ওঁর দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় ?"

"বেশ তো, ওঁর দাদা যদি নিয়ে যেতে চান, আমার আপত্তি কিসের ?"

"নিয়ে যেতে চাই মানে ? আমি তো একপায়ে খাড়া। আমি তো গত বছরেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। তুমিই পাঠাতে চাইলে না…"

বাধা দিয়ে দুরাই বলে— "আমায় বলবেন না, আপনার বোনকে বলুন। আমি রাজিই ছিলুম। আপনার বোনই জেদ করে যেতে চাইল না।"

"আমি তো এখনও রাজি নই যেতে"— রাজম্মা বলে ওঠে।

"আপনি এরকম জেদ ধরছেন কেন? আবহাওয়ার পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ভাল হবে।"

"ডাক্তারবাবু। বিশ বছর এক জায়গায় কাটিয়ে দিলুম। বাকি যে কটা দিন বাঁচি এখানেই কাটাতে দিন। টানা-হেঁচড়া করে আর কী লাভ?"

"আপনার খুশি। আমি জোর করতে পারি না।"—ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লেখায় মন দেয়।

ডাক্তার চলে গেলে কিট্টাবায়ার আর সীতার পেড়াপীড়িতে অগত্যা রাজম্‌কে মত দিতে হয়। সীতা খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

সেদিন রাত্তির থেকেই রাজমের স্বাস্থ্য আশাতীত রকম সেরে উঠতে থাকে। দিন আষ্টেকের মধ্যেই কিট্টাবায়ার বোন আর ভাগ্নীকে সঙ্গে নিয়ে বম্বে মেলে চেপে বসে। তুরাইস্বামী তাদের তুলে দিতে 'ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস' স্টেশনে এল।

ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কিট্টাবায়ার আর তুরাইস্বামী কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে গল্পগাছা করছে। খবরের কাগজের হকার হেঁকে যাচ্ছে— কথাবার্তা বলতে বলতে ওদের মন মাঝেমাঝে সেদিকেও আকৃষ্ট হচ্ছে—

'রজনীপুরের মহারাজার প্রাণনাশের চেষ্টা!'··· 'এক মহিলার দুঃসাহসিক প্রয়াস।'... 'ছুরি হাতে গ্রেপ্তার'··· হকার হিন্দী আর ইংরাজিতে হেঁকে চলেছে। কিট্টাবায়ার তার যৎকিঞ্চিৎ ইংরিজি জ্ঞানের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করে— "কী ব্যাপার, মহারাজাকে মেরে ফেলার চেষ্টা কেন?"— সে তুরাইস্বামীকে জিজ্ঞেস করে।

তুরাইস্বামী দায়সারা গোছের জবাব দেয়— "কে জানে, বম্বেতে এসব হুজ্জোত রোজই লেগে আছে। ভেতরের খবর কী করে জানব"... মুখে বলে বটে কিন্তু তার মুখে যেন কালি মেড়ে দেয়।

ইতিমধ্যে গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে যায়। সিটি বাজিয়ে ইঞ্জিন অল্প একটু দুলে ওঠে। তুরাইস্বামী হঠাৎ আবেগে উতলা হয়ে ওঠে।

বলে—'রাজম ! আমি যত তাড়াতাড়ি পারি চলে যাব। তোমাদের নিয়ে আসব। আমি সাবধানেই থাকব। বৃথা দুশ্চিন্তা কোরো না। —সীতা, মার ওপর নজর রেখো, দেখাশুনো কোরো। আমি যা যা বলে দিয়েছি, মনে রেখো।— কিট্টাবায়ার, বাড়ি পৌঁছেই চিঠি দিতে ভুলবেন না। ঠিক আছে, এবার দরজার ছিটকিনি ভেতর থেকে লাগিয়ে দিন।—রাজম, শরীরের দিকে নজর রেখো।"

দুরাইস্বামী অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলছিল। তার কথায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। তবে মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর— এই হল দুনিয়ার রীতি।

ছয়

দেবপট্টণমের রথবীথির ওপরে মুখোমুখি তুখানি দোতলা বাড়ি। তুটি বাড়িরই বাইরে লোহার সুদৃশ্য রেলিং ঘেরা বারান্দা। তুখানি বাড়িরই বাইরের দরজায় নেমপ্লেট। একটি নেমপ্লেটে লেখা : আর. আত্মানাথ আয়ার বি. এ. বি. এল.। অন্যটিতে : এন. দামোদরম্ পিল্লাই বি. এ. বি. এল.। তুজনেরই নামের নীচে উপাধি —এডভোকেট্।

আয়ার আর পিল্লাই তুজনের মধ্যে প্রগাঢ় মৈত্রী। তুজনেই শহরের নামজাদা উকীল। তুজনেরই বড় পরিবার। আমদানী উভয়েরই ভাল। এসব সত্ত্বেও এত বড় ইমারত তৈরী করাতে গিয়ে উভয়েরই কিছু কিছু ধারকর্জ হয়ে গেছে।

একদিন রাত্তিরে দামোদর পিল্লাইয়ের বাড়ির তেতলার ছাতে, চাঁদের আলোয় তিনজন যুবক এসে মনের আনন্দে গল্পগুজব করছে। তাদের মধ্যে একজন হল পিল্লাইয়ের বড় ছেলে অমরনাথন্। দ্বিতীয় জন—আত্মানাথ আয়ারের ছেলে পট্টভিরামন্। তৃতীয় জন—রাজম্ পেট্টাইয়ের ছেলে সূর্যনারায়ণ।

অমরনাথন আর পট্টভি বি. এ. শ্রেণীর ছাত্র, এবার ফাইনাল দেবে। তুজনেই সমবয়সী। বছর কুড়ি বয়েস। সূর্য ওদের চেয়ে বছর তুয়েকের ছোট। লেখাপড়ায় আরো কম। বেচারা এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসবে। তার বাপ একটু বেশি বয়সেই তাকে লেখাপড়া করতে দেবপট্টণম্ পাঠিয়েছে।

আত্মানাথ আয়ার কিট্টাবের উকীলও বটে আবার পুরোনো বন্ধুও। তার তত্ত্বাবধানেই ছেলেকে রেখেছে। সূর্যনারায়ণ হোটেলে

খাওয়াদাওয়া করে আর লেখাপড়ার সুবিধের জন্যে আয়ারদের বাড়িতে থাকে।

পট্টভি বলল— অমরনাথ, আমাদের সূর্য কাল ওদের গাঁয়ে যাচ্ছে, জানিস ?

অমরনাথ বলল— কই জানি না তো . তা এখন গাঁয়ে যাচ্ছে কেন ? পরীক্ষা সামনে !

"মাদ্রাজ থেকে কারা যেন 'মেয়ে' দেখতে আসছে। তাই বাবা যেতে লিখেছেন।" সূর্য স্পষ্ট করেই কথাটা বলল বটে, কিন্তু অমরনাথ ঠিক বুঝল না। বললে—"মেয়ে দেখতে আসছে তো তোমাকে ডাকছেন কেন ? তুমি কি মেয়ে ?"

পট্টভি বলে— "তুমিও যেমন। আরে গাধা, ওর বোনের বিয়ে, ও যাবে না ?"

"কার বিয়ে ? সূর্যের বোন ললিতার ? তাকে দেখতে মাদ্রাজ থেকে লোক যাচ্ছে ? সেকি হে পট্টভিরাম। আমি তো ভেবেছিলুম তুমিই ললিতার ভাবী বর।"

"ছি ছি, কী যে বকিস না ! সূর্য এখানে বসে রয়েছে—"

"বসে রয়েছে তো কী হয়েছে ? আমি কি মিছে কথা বলছি ? সত্যি কথা বলব তার ভয়টা কিসের ! আমি সূর্যকেই জিজ্ঞেস করছি। কীরে সূর্য, বুকে হাত রেখে বল দিকি, তুই জানিস না যে আমাদের পট্টভি ললিতার জন্যে পাগল ?— সে ক্ষেত্রে আবার মাদ্রাজ থেকে ললিতাকে দেখতে আসে কোন্ হিসেবে ?"— অমরনাথ ঝাঁঝের সঙ্গেই প্রশ্ন করে।

"আমাকে এসব কথা বলা বৃথা। আমি কী জানি ? আমাকে জিজ্ঞাসা করে তো আর সব কাজ হয় না। হতে পারে পট্টভির জন্মকুণ্ডলীর সঙ্গে ললিতার কুষ্ঠির মেল খায় নি।"—সূর্য সাফাই গায়।

পট্টভি বলে— "আমি যদ্দুর জানি, আমার জন্মপত্রিকা চাওয়াও হয় নি, বিচারও করা হয় নি। তবে অমরনাথ, বিয়ের ব্যাপারে

আমার মতামত তো তুমি ভালভাবেই জান। আমি তোমায় অনেক-বার বলেছি বি. এ. পাস করে নিজে অন্ততঃ শ'খানেক শ'দুয়েক টাকা রোজগার না করা পর্যন্ত বিয়ের কথা আমি মুখে আনব না।"

"আরে বাচ্চু, ওসব গল্পকাহিনী আর কাউকে শুনিয়ো। গেল বছর ললিতা আর ললিতার বাবা যখন তোমাদের বাড়িতে এসে এক হপ্তা ছিলেন, তখন তোমার সে কী ডগমগ অবস্থা, সেকি আমি ভুলে গেছি ভেবেছ? হুঁঃ আরে বাবা, তোর মনের কথা আমি খুব জানি।— সূর্য তোমায় একটা কথা বলি, যদি কিছু মনে না কর। তোমার বাবা যেটা করতে যাচ্ছেন, সেটা ঠিক হচ্ছে না। পট্টভি থাকতে তাঁর অন্য পাত্র খুঁজতে যাওয়ার দরকারটা কী? কেন পট্টভির কোন্‌টার অভাব আছে বল?"— অমরনাথ আর্গুমেন্ট করে।

সূর্য এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে সব শুনছিল। এবার মুখ খুলল— "দেখ, আমার মনের কথা যদি শুনতে চাও, তবে বলছি, বাবার এসব ব্যাপার আমারও পছন্দ নয়। আমার নিজেরও ইচ্ছে পট্টভির সঙ্গেই ললিতার বিয়ে হোক। আমার মনে হয় ললিতাও তা হলে সুখী হবে। জানি না, বাবা কেন একজন অচেনা লোকের হাতে ললিতাকে তুলে দিতে চাইছেন!"

"তোমরা অনর্থক বকাবকি করছ। এ-ব্যাপারে আমার কথাটা একটু দয়া করে শোন, তারপর যা ইচ্ছে হয় বল। আমি স্পষ্টই বলছি, ললিতার কথা নিয়ে আমি এমন কোন চিন্তা করি নি। তবে এরকম অচেনা অজানা ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়াটাও আমি আদৌ ভাল মনে করি না। একেবারে অপরিচিত একটা লোক এসে 'মেয়ে দেখবে', মেয়ের গায়ের রঙ ঘষেমেজে, নাককানের মাপজোখ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে, তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে খবর পাঠাবে— মেয়ে পছন্দ হয় নি।'— পট্টভি মতামত ব্যক্ত করে।

তার মতামত থেকেই অমরনাথ পট্টভির মনের অব্যক্ত ইচ্ছের পরিমাপ করে নেয়। বলে— "সূর্য, তুমি একটা কাজ কর। কোন-

রকম করে তোমার বোনের মুখ দিয়ে বলাও যে যে-ছেলে ওকে দেখতে আসছে, তাকে ওর পছন্দ হয় নি।"

"না, না কক্ষনো না। সূর্য এসব পাগলামি করবে না।"—পট্টভি ঘোর আপত্তি জানায়।

"সূর্য, ওর কথা ছাড়। তোমার নিজের কী মত, বল।"—অমরনাথ পট্টভির প্রতিবাদকে আমল দেয় না।

"আমি তোমার সঙ্গে একমত।"—সূর্য অনুমোদন করে।

"শুনলে তো পট্টভি? অধিকাংশের মত তোমার বিপক্ষে। কী করা যাবে?"—অমরনাথন সোল্লাসে বলে।

পট্টভি জবাব দেয়—"অধিকাংশের মত সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছেন জান তো? স্বামীজী বলেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই মূর্খ। কী, কথাটা জানতে না?"

"আরে বাপু, স্বামী বিবেকানন্দ যা বলতে পারেন, তোমার আমার কি সে কথা বলা সাজে? ভবিষ্যতে এই অধিকাংশের মত নিয়েই জগৎ চলবে দেখে নিয়ো। বহুজনের মতকে উপেক্ষা করে যে চলবে, সে দুনিয়ায় কোন উন্নতিই করতে পারবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে চল বা না চল, অন্ততঃ 'তাদের মতে চলছ' এইরকম একটা ভাণ করার কৌশলটা রপ্ত করতে শেখ, দেখবে দুনিয়ায় হেসে খেলে চলতে পারবে।"— অমরনাথ পৃথিবীর সার নীতি ব্যক্ত করে।···

বোম্বাই থেকে এসে সীতা আর তার মা হপ্তাখানেক রাজমপেট্টাইয়ে রইল। তারপর রাজম্মার বড়বোন অভয়ার বাড়িতে ক'দিন কাটিয়ে এল। ওরা যেদিন রাজমপেট্টাইয়ে আবার ফিরে এল, সেইদিনই সূর্যনারায়ণ দেবপট্টনম থেকে গ্রামে রওনা হল। পথে ওদের দেখা। বোম্বাইয়ের পিসি আর পিসতুত বোনের সঙ্গে কথায় কথায় সূর্য বেশ জমে উঠল।

রাজমপেট্টাইয়ে বাড়ির পাশেই ওদের একটা দীঘিওয়ালা বাগানবাড়ি আছে। সীতা আর ললিতা রোজই নিরিবিলিতে সেখানে গিয়ে বসত। আশেপাশে কেউ বাধা দেবার নেই। কাজেই

পরস্পর মন উজাড় করে প্রাণের কথার আদানপ্রদান চলে। দিনভর কথা বললেও কথা ফুরোয় না। সূর্যাস্ত হয়ে যাবার পরেও ফেরার কথা মনে পড়ে না। বাংলোর দীঘির সিঁড়িতে বসে দুজনের ধারাবাহিক মনের কথা অন্তহীন চলে। ওদের যুবতী মনের অথৈ রহস্যের কথা বুঝতে না পেরে সন্ধেবেলাকার নক্ষত্রেভরা অনন্ত আকাশ অগাধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

সেই একই বাংলো বাড়ি, একই দীঘির ঘাট, আজ কিন্তু কেন কে জানে কিছুতেই যেন কথা দানা বাঁধছে না, সুর কেটে যাচ্ছে। সীতা বললে—"ললিতা, আজ আমাদের এখানে আসাটা ঠিক হয় নি। মামী বোধহয় আমাদের খুঁজছে। হয়তো আমায় বকছে তোকে এখানে টেনে এনেছি বলে।"

"তোকে কেন বকবে। বকতে হয় আমায় বকুক-না। আমিও জবাব দিতে জানি।"—ললিতা উত্তর দেয়।

"খাবার পরেই মামী বলছিল তোমার বিনুনি বাঁধা আরম্ভ করে দেওয়া দরকার। কেয়াফুলে বিনুনি সাজাতে গেলে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়। তাদের তো বিকেল পাঁচটার মধ্যেই এসে পড়ার কথা। আমরা এখানে বসে থাকলে চলবে কী করে?"

"সীতা, আমার মনের কথা শুনবি? আমার এসব একটুও ভাল লাগছে না। তুই আমার চেয়ে এক বছরের বড়। বিয়ে হলে আগেই তোর হওয়া উচিত, তারপর আমার। আমার অবাক লাগছে, বাবাও এই সহজ কথাটা না বুঝে আবোল তাবোল কাজ করছেন কী করে? তা ছাড়া, এত ঘটা করে সাজসজ্জা আড়ম্বর করারই বা কী দরকার? আমি তো কিছু বুঝি না। সব যেন সাজ-সাজ রব। সব যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। ব্যাপারটা কী?— বলতে যাই মা একেবারে খেতে আসবে। সেই ভয়ে মুখ খুলি না—"

"ভয়টা আবার কিসের? আমি থাকতে তোদের ভয় কী?"—

বলতে বলতে সূর্য মঞ্চে প্রবেশ করে। তাকে এরকম আকস্মিক-ভাবে আসতে দেখে ললিতা একেবারে ফেটে পড়ে—

"এখানেও এসে জুটেছ? যাও তো। ভয়ের কথা মোটেই হচ্ছে না। কারুর কিছু ভয় নেই। কেউ তোমায় বীরত্ব দেখাতে ডাকে নি! মেয়েরা বসে কথা বলছে, তারমধ্যে বেটাছেলের কী দরকার গো?"

"আমি মোটেই বিনা দরকারে আসি নি। পিসি সীতাকে খুঁজছে। সীতা এখানে থাকলে তাকে ডেকে দিতে বলেছে, তাই এসেছি। বোম্বাই থেকে পিসেমশায়ের চিঠি এসেছে সীতার নামে।" সূর্যের মুখ থেকে এ-কথা শুনেই সীতা উঠে পড়ে। বলে—"তোমরা থাক। আমি পাঁচ মিনিটের ভেতর ঘুরে আসছি।"

সূর্যনারায়ণ কদিন থেকেই মনে মনে ভাবছে ললিতাকে তার বিয়ের ব্যাপারে দু-একটা কথা বলবে। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিল না। আজ ফাঁক পেয়েই বলল— "ললিতা, তোমায় একটা জরুরী কথা বলবার আছে। এখনই সুবিধেজনক সময়। এরপরে সুযোগ হবে কিনা বলা যায় না।"

ললিতা ঝেঁজেই জবাব দেয়— "যা বলবার বলে ফেল-না। অত ভণিতা করার কী আছে?"

"অত ঝাঁজ দেখাবারও কিছু নেই। যা বলব সেটা তোমার ভালর জন্যই বলব। আজ সন্ধেবেলায় তোমায় দেখতে আসছে। বরও আসবে। বরকে যদি তোমার পছন্দ হয়, ভাল কথা। যদি পছন্দ না হয়, পষ্টাপষ্টি খোলাখুলি বলে দেবে। কোন সংকোচ করবে না। মা-বাবার কথায় কিংবা লজ্জাসংকোচের বশে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে না। বুঝতে পেরেছ? বিয়েটা একটা মামুলী জিনিস নয় যে আজ পছন্দ না হলে কাল বদলে নেওয়া যাবে। এ হল সারাজীবনের বন্ধন। একবার হয়ে গেল তো হয়েই গেল, ব্যস। খেয়াল রেখো।"

"ঠিকই বলেছিস রে দাদা", ললিতা একেবারে নরম হয়ে যায়।—

বলে, "আমিও ঠিক ঐকথাই ভাবছিলাম। কিন্তু ধর যদি আমার ছেলেকে পছন্দ না হয়, তুই আমার পক্ষে থাকবি তো ?"

সূর্যনারায়ণ বোনকে পূর্ণ আশ্বাস দেয়— "একশো বার। তুই একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।"

এমন সময় শুণ্ডু বাগানবাড়িতে ছুটে আসে। দূর থেকেই উঁচু গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আসে— "দিদি। মা ডাকছে। বলছে তোমার বিনুনি বাঁধতে হবে, সাজগোজ করতে হবে। এক্ষুনি চলো। তিনটে বেজে গেছে, আর তুমি এখনো এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছ ? দাদার সঙ্গে গল্প করার আর সময় পেলে না ?"

—উঃ, চার আঙুলের ছোঁড়া, কীরকম বড় গলা করে চেঁচাচ্ছে দেখ !…"হ্যাঁরে শুণ্ডু, সীতা কোথায় রে ? এখানে আসবে না ?"— ললিতা ভাইকে জিজ্ঞেস করে।

"সীতাদিও তোমায় বলতে বললে, তাড়াতাড়ি বাড়িতে যেতে। ও এখন আসবে না। কেন আসবে না জান ? এইজন্যে যে এখানে মিস্টার সূর্যনারায়ণ আয়ারের পায়ের ধুলো পড়েছে। তাই সব মজা মাটি হয়ে গেছে।"—বলতে বলতে শুণ্ডু হাওয়া হয়ে যায়। সূর্যর হাতে ধরা পড়ে গিয়ে মার খাবে— এমন আহাম্মক সে নয়।

সাত

ললিতা বাড়ি আসতেই একদিকে সীতা আর-একদিকে সরস্বতী তার রূপসজ্জায় লেগে যায়। ললিতার প্রসাধনে সীতার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখে সরস্বতীর পাষাণ হৃদয়ও যেন গলে যায়। মনে মনে বলে— এবার এ ব্যাপারটা চুকলেই সীতার জন্যেও একটা ছেলে দেখতে হবে। হয়ে উঠলে দুই বোনকে একসঙ্গেই পাত্রস্থ করা যাবে। তবে শাস্তরে এ-বিষয়ে আবার কী বলেছে কে জানে? শাস্তরের অনুমতি পেলে ব্যাপারটা খুবই ভাল হয়! এক খরচেই দুটো মেয়ে পার হয়ে যাবে। নতুন করে সব-কিছু করার দরকার হবে না। চোতমাসের ভেতর যদি সব চুকেবুকে যায় তো সুবিধেই হয়। সরস্বতীর মন এত জোরে জোরে কথা বলতে থাকে যে কেউ ভাল করে কান পেতে থাকলে কানে শোনা যায়।

সীতা ক্ষিপ্রহাতে ললিতাকে সাজাচ্ছে। এ হাতের চুড়ি ও হাতে পরাচ্ছে। মাথায় ফুলের কবরীসজ্জা করছে, সিঁথি সোজা করে দিচ্ছে, কলি নামিয়ে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে, কপালের টিপটা একবার মুছে দিয়ে আবার নতুন করে পরাচ্ছে। যাতে আরো…আরো বেশি সুন্দর দেখায়।

সূর্যকে দেখে সরস্বতী বলে—“কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? এদিকে এরা ঠিক সময়ের আধঘণ্টা আগেই এসে পড়েছে। ভদ্রলোকদের খাবার পাঠাব বলে তোকে খুঁজে মরছি। তা তোর পাত্তাই নেই। সীমাচ্ছু মামা এদিকে বারবার তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন— দেরী হয়ে যাচ্ছে। শেষে শুগুকে সঙ্গে দিয়ে রাঁধুনীর হাত দিয়ে খাবার পাঠাই। এইমাত্র গেল। কোথায় যে থাকিস! যা এখনই যা

ওখানে। তোর হবু ভগ্নীপোতকে ওই নিজে হাতে খাবার আর কফি দিগে যা। যা, তাড়াতাড়ি যা।”

“আমি যাব না। অনেক লোক আছে। একটা কাজ করতে কত লোক লাগে? এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমাদের এত মাতামাতি কিসের জন্যে, ভেবেই পাই না।” সূর্য নিজের মনে গজগজ করে।

“কথা শোন একবার ছেলের। যেমন বাপ তেমনি বেটা। এই-সব গুণধরদের নিয়ে বাড়িতে কাজ করতে হবে। লোকে গায়ে থুতু দেবে, মাথা হেঁট হয়ে যাবে, বুঝলি?”— গজগজানিতে মা এককাঠি বাড়া।

সীতা বলে— “সূর্য, মার কথাটা শোন। বাড়িতে জামাই এলে তুমি দেখাশুনা না করলে আর কে করবে?”

“বাঃ বাঃ, সবাই মিলে দেখছি এখন থেকেই লোকটাকে জামাই বানিয়ে ফেললে! সে এখনো ললিতাকে চোখে দেখল না পর্যন্ত।” —সূর্য অবাক।

“দেখ না, আমিও তো সেই কথাই বলছি।”—ললিতাও দাদার দলে।

“তুই চুপ কর্।” সরস্বতী মেয়েকে এক ধমক দেন।

“সূর্য, তুমি ওরকম করলে এবার তবে আমিই যাব আর নিজের হাতে ওঁদের পরিবেশন করে আসব। বল, তাই করব? তুমি পুরুষমানুষ, কোথায় ডাঁটের মাথায় যাবে, চট করে জামাইয়ের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে, কুশল প্রশ্ন করবে— যেটা তোমাকে মানায়। তা নয়, মেয়েদের মত অন্দরমহলে বসে রয়েছ।”— সীতা সূর্যর পৌরুষে ঘা দেয়।

“বল তো মা। এবাড়িতে একটা মেয়েই আছে যার বুদ্ধি আছে। আজ তুই না থাকলে এই মেয়ে আমায় চুল বাঁধতে দিত ভেবেছিস? আমায় একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত? এখন তোর জন্যে একটা ভাল ঘর-বর দেখে চার হাত এক করে দিতে পারি, তবে শান্তি পাই।”

"তোমরা বাপু বাইরের লোকের খাতির করতেই শিখেছ— হাঁক-ডাক করে অস্থির। ঘরের লোকের কথা ভাবই না। আমাকে কেউ একবার খাবার কথা জিজ্ঞেসও কর নি, করেছ? দুনিয়াটা বড়ই খারাপ জায়গা।" বলতে বলতে সূর্য এবার বাইরের দিকে যায়।

সূর্য সীমাচ্চু আয়ারের বাড়ি গিয়ে দেখল মাদ্রাজের অভ্যাগতরা সবাই জলযোগ করছেন। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝল— পাত্রের সঙ্গে তার মা বাবা আর সুব্বা আয়ার মোট চারজন এসেছেন। শুণ্ডুও অতিথিদের সঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছে। সীমাচ্চু অতিথি সৎকারে ব্যস্ত। সূর্য গিয়ে রকের একধারে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। তাকে দেখে প্রাক্তন সাবজজ শাস্ত্রীমশায় জিজ্ঞেস করেন— "ছেলেটি কে?"

সীমাচ্চু আয়ার পরিচয় দেন—"এ মেয়ের বড় ভাই সূর্যনারায়ণ। এবার এস. এস. এল. সি. দেবে।"

সুন্দর রাঘবন এম. এ. একবার মাথা তুলে দেখে। বলে— "এস. এস. এল. সি. দেবে সে ভাল কথাই। কেউ আপত্তি করছে না। তা মুখ গোমড়া করে থাকার কী হল?"

পরিহাসটা সূর্য নিঃশব্দে হজম করতে চাইল না। বললে— "আমি কোথায় মুখ গোমড়া করে আছি? আপনাকেই বরং দেখে মনে হচ্ছে, বেজায় মনোকষ্টে ভুগছেন। মনে রাগ পুষে এনেছেন। নইলে থালার খাবার থালায় পড়ে রয়েছে, দাঁতেও কাটছেন না— কেন?"

"বাঃ বাঃ দেখেছ কামাক্ষী, দেখ", শাস্ত্রী গৃহিণীকে সম্বোধন করে বলেন—"কথার বাঁধুনি দেখ। এই হল কাবেরীর জলের মহিমা। হুঁ হুঁ বাবা, শুনে নাও। এখানে বাবা, সাবধানে আটঘাট বেঁধে কথা বলতে হবে।"

কোনমতে ললিতার রূপ-প্রসাধন পর্ব শেষ হল। ললিতা সীতাকে বললে—"যা, এবার তুই মুখহাত ধুয়ে টিপ পরে তৈরী হয়ে নে।"

"কেন, আমার তাড়াতাড়ি কিসের? ঐ দেখ কানের পাশের কলিটা এইভাবে লটকে দিলে তো বেশ হয়...দাঁড়া..." সীতা আবার ললিতার চুল নিয়ে পড়ে।

"আঃ রাখ দিকিনি। ছাড়, ঢের হয়েছে। তুই মুখ ধুতে গেলি? যাবি কিনা? মুখ হাত ধুয়ে, শাড়ি বদলে, টিপ কাজল পরে তুই যদি না আসিস, তবে আমিও এই ঘরে গিয়ে দোরে খিল লাগিয়ে বসে থাকব। হাজার ডাকাডাকি করলেও খুলব না, বলে দিলুম। যারা মেয়ে দেখতে এসেছে, মেয়েকে না দেখেই তাদের ফিরতে হবে।"

ললিতার জেদ দেখে ললিতার বড় পিসি, সীতার মাসী বললেন— "যাও সীতা ওর কথাটা শোন। সত্যিই তো তুমি ওর সঙ্গে যাবে, ময়লা কাপড় পরে, আলুথালু হয়ে— পাঁচজনেই বা কী বলবে?"

সরস্বতীও বললেন—"হ্যাঁ সীতা, তোমার মাসী ঠিকই বলেছেন।"

সকলের কথা রাখতে সীতা নিজেও সাজতে বসে।

এইসময় সরস্বতীর মা এসে মেয়েকে ইশারা করে খিড়কির উঠোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার কানে কানে কী বলল। উত্তরে সরস্বতী বলে ওঠে-- "তোমার যত আজগুবি কথা। যাও যাও, বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না তো। বেনো জল এসে কুয়োর জল ভাসাতে পারে না। উকুনের ভয়ে কি কাঁথা ফেলে দেয় কেউ?"—এসব কথোপকথন আরো কারুর কারুর কানে গেল।

সীতা মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে টিপ পরে আসতে সরস্বতী তাকে বললেন—"সীতা, তোর মামা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, একটু ডেকে আন তো।"

সীতা বাইরে গিয়ে দেখল, মামা গাঁয়ের আরো জনকয়েক গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে চাঁদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ওদিকে সীমাচ্চু আয়ারের বাড়ি থেকে মোটরগাড়ি বেরিয়ে এদিকে আসছে। সীতা ঠিক ভেবে পেল না— এই সময় মামাকে ডাকাটা উচিত হবে কিনা! ইতস্ততঃ করছে, ইতিমধ্যে গাড়ি এসে পড়ল। আর ললিতার হবু বরকে দেখবার প্রলোভনে সীতা আর নড়তে পারল না।

গাড়ি থেকে সর্বাগ্রে নামলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর পরেই নামলেন একটি যুবক। এই ছেলে না হয়ে যায় না। অসম্ভব রূপবান! বাঃ! ললিতা সত্যিই ভাগ্যবতী! সীতা মোহিত হয়ে যায় একেবারে। চোখ ফেরাতে পারে না। তারপর কষ্টে চোখ নিচু করে। মাথা একবার তুলতেই চোখোচোখি হয়ে যায়। সীতা দেখে যুবকটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকেই। চোখ সরাবার নাম নেই। 'আমাকেই কনে বলে ঠাউরে নেয় যদি'··· ভেবে লজ্জায় নিথর হয়ে যায় সীতা। তারপর এক ছুটে ভেতর বাড়িতে চলে যায়। বলে—"ওঁরা এসে গেছেন।" তারপর ললিতাকে একান্তে ডেকে বলে—"এই, তোর বরকে দেখে এলুম। মামা ঠিকই বলেছেন— কন্দর্পকে হার মানায় এমন রূপ!"

অতিথিরা ভেতর বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা সবাই তাড়াতাড়ি করে হেঁশেলে গা ঢাকা দেয়। শুধু সরস্বতী বেরিয়ে এসে ভাবী বেয়ান কামাক্ষীকে সাদরে অন্তঃপুরে নিয়ে যায়। পুরুষেরা বৈঠকখানা ঘরের চেয়ার আলো করে বসে। সকলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে। তারপর সীমাচ্চু আয়ার মেয়েদের মহলে এসে বলেন—"এবার মেয়েকে পাঠান, মেয়ের হাতে পান-সুপারির ডালা দিয়ে দিন, তাড়াতাড়ি করুন।"

মেয়ে মহলে কী একটা কথা নিয়ে কানাকানি হচ্ছিল। আন্দাজে কথাটা ধরে নিয়ে সীমাচ্চু বললেন— "বেশ তো। সীতাও সঙ্গে আসুক না। তোমরা আরো কেউ কেউ আসতে চাও তো এস।"

ললিতা আর সীতা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ললিতার হাতে রেকাবিতে পান-সুপুরি, মাথা নিচু করেই চলে। সীতা ললিতার হাত ধরে, যেন খানিকটা তাকে ঠেলে নিয়ে এগোয়। সীতা কনে নয়। তার শরমে মাথা নত করার কথাও নয়। সে দিব্যি উঁচু মাথায় সকলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে তাকাতে আসছে। বর-মশায়ের ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়। ঠিক! তার চোরামন

যা বলছিল তাই হল। বরও ললিতার দিকে না তাকিয়ে তাকেই দেখছে। সীতার রোমাঞ্চ হয়।

ললিতার চলনে অনেকটা স্বপ্নের ছন্দ। সেই ভঙ্গীতে সে অভ্যাগতদের দিকে এগোয়। তাঁদের সামনে রাখা তেপাইয়ের ওপর পানের রেকাবি নামিয়ে ললিতা সবাইকে হাত জোড় করে নমস্কার জানায়। সেই সময় সীতা আর-একবার বরের দিকে চোখ ফেরায়। এখনো বরের নজর তারই ওপর, ললিতার দিকে নয়। এখন আবার ঠোঁটে মৃদু হাসি। সে হাসিতে আকাশের তারার জৌলুস। সীতার মনে রঙ লেগে যায়। আলোর রঙ। আলোয় আলোয় ভরে ওঠে তার অন্তর।

ললিতাও মেয়ে। তারও মনের মণিকোঠায় নায়ককে দেখে নেবার দুরন্ত লোভ জাগে। সযত্নে সকলের নজর বাঁচিয়ে, নিজের নত, প্রায় নিমীলিত আঁখিপল্লব তুলে এক ফাঁকে বরের চোখের ওপর রাখে, দেখে— বরের দৃষ্টি তার কাঁধের ওপর দিয়ে তার পেছনের আর কারুর ওপর। ললিতা পলক নামিয়ে নেয়।

পদ্মলোচন শাস্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন—"কোন্ কন্যাটি আমরা দেখতে এসেছি? জটাবলয় আর শিরোভূষণ পরা এই মেয়েটি তো?"

"বাঃ কী বুদ্ধি তোমার? প্রণামের ভঙ্গী দেখেও বুঝতে পার না?" কামাক্ষী স্বামীকে বলেন।

"আহা, বুঝতে আমি ঠিকই পেরেছি। কথা তা নয়। তবে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভাল, পরে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আচ্ছা, মেয়ে লেখাপড়া জানে তো?"

"সে আর বলতে? বাপের পটেলগিরির আদ্ধেক পয়সা তো মেয়ের বই পড়ার শখেই খরচ হয়। এমন কোন গল্প উপন্যাস নেই, যা পড়েনি। ইংরিজিও বেশ বলতে পারে। কাল যখন বরমশাই কথা বলবেন, তখনই বুঝতে পারবেন'খন কীরকম ফটাফট ইংরিজি বলে।"—সীমাচ্চু বলে।

শুনে রাঘব বলে—"কাল পর্যন্ত মুলতুবী রাখার দরকার কী? আজ এখনই কথা বলে দেখে নেব।"

"নিশ্চয়, একশো বার। তবে আমরা হলুম গিয়ে পাড়াগাঁয়ের মানুষ। আমরা তো এখনো সভ্যতা শিখিনি। বলছিলুম কি, বিয়ের পরে মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে আসবে, তখনই আদবকায়দা সব রপ্ত করে নেবে। এই আর কী! কী হে কিট্টাবায়ার, বল না হে, ঠিক বলছি তো?"

"কিট্টাবায়ার কী বলবেন, আমিই তো বলছি হাল আমলের কেতাটেতা আমারও পছন্দ নয়। ঘরের বউ ইংরিজি লেখাপড়া করে চাকরী করবে, সেটাও চাই না। তবে কী জানেন, আজকালকার ছেলেরা লেখাপড়া জানা মেয়েই চায়। সেটাই স্বাভাবিক। তাতে মনে করবার কিছু নেই।— আচ্ছা বলুন তো। মেয়ে গানবাজনা জানে?"— শাস্ত্রী সপ্রশ্ন হন।

"ভাই কিট্টাবায়ার, এ প্রশ্নের উত্তরটা তুমিই দাও। সব কথাই আমি বলব এটা কেমন কথা?" সীমাচ্চু মেয়ের বাপকে আসরে নামাবার চেষ্টা করেন।

কিট্টাবায়ার তাড়াতাড়ি বলেন—"নিয়মিত সংগীত শিক্ষা হয়নি। গ্রামে তেমন সুযোগসুবিধের অভাব। তবে গানের গলা ভালই। আমি নিজেই শিখিয়েছি। সংগীতের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে।"

"তাই বলুন, আপনি যে মশায় বর্ণচোরা আম দেখছি এঁ্যা! তা দীক্ষিতরের রচনা কিছু যদি জানা থাকে..."

"নিশ্চয়। গাও ললিতা...'মাঘব পট্টাভিরাম'টা গেয়ে শোনাও।"— বাপ মেয়েকে আদেশ দেন। ললিতা মাথা নিচু করেই বসে ছিল। বাপের আদেশ শুনে করুণ চোখ তুলে একবার তাকায়, তারপর আবার ঘাড় হেঁট করে বসে।

"দীক্ষিতর না হয় তো শ্যামা শাস্ত্রীর রচনা...?"

"সেই ভাল, গাও তো মা— শ্যামা শাস্ত্রীর 'সরোজ দলনেত্রী'টা মনে আছে তো? ঐটাই শুনিয়ে দাও।"

ললিতার গান গাইবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সীতা তার কানে কানে বলে—"এই যাহোক একটা কিছু গা। চুপ করে

থাকলে হবে কী করে ?” তার কথারও কোন ফল হল না দেখে সীতা এখন আর-একবার বরের দিকে তাকায়। রাঘবও ফিরে তাকায়। দুজনের চোখে চোখে মিলন হয়। আশ্লেষবদ্ধ দুজোড়া চোখ পরস্পরের মনের কথা বলতে থাকে।

সুব্বা আয়ার বলেন—“সীতা তুমিও ললিতার সঙ্গে গাও। বোধ-হয় একা গাইতে লজ্জা পাচ্ছে।”

সরস্বতী সীতার কাছে এসে বলেন—“হ্যাঁ সীতা, তুইও ওর সঙ্গে গা।”

সীতা বলে— “চট করে এমন গান মনে পড়ছে না যেটা আমরা দুজনেই জানি।”

শাস্ত্রী বললেন—“তবে তুমিই আগে একটা গাও। পরে ও গাইবে।”

“আচ্ছা দাঁড়ান আগে ভেবে নিই! দুজনের জানা কোন গান মনে পড়ে কিনা। ললিতা, ‘নগুমোকু গন লেনী’ গানটা তোর জানা আছে ? তাহলে আয় দুজনে মিলেই গাই। গাইবি তো ? পরে যেন থেমে যাস নি।” সীতা গলা ঝেড়ে গান আরম্ভ করে দেয়। ‘স্থায়ী’র জায়গাটুকু ললিতা তার সঙ্গ নিল, যদিও ললিতার গলা তার সঙ্গ নিল না। আর ‘অন্তরায়’ উঠে সীতার গান যখন বেশ জমে উঠেছে, আর ললিতা প্রাণপণে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করছে, তখন হঠাৎ ললিতার গলা ধরে গেল, বেসুরো স্বর বেরোল। চট করে গান থামিয়ে ললিতা জোর পায়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল।

সভাস্থল নিঃশব্দ। কিট্টাবাইয়ার সরোষে চীৎকার করে ওঠে—“ললিতা, একি হচ্ছে ?”

সরস্বতী আম্মাল মেয়ের হাত ধরে থামাতে যায়, বলে—“এই পাগলী মেয়ে, কী হল কি তোর ?”

এক ঝটকায় মার হাত ছাড়িয়ে ললিতা ভেতর দিকে চলে যায়।

সীতা মুহূর্তখানেক হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। একবারটি বরের দিকে একপলক তাকিয়েই

সেও ভেতরে চলে যায়। কিট্টাবায়ারকে আসন ছেড়ে উঠতে দেখে পদ্মলোচন শাস্ত্রী বলেন—"থাক থাক, মেয়েকে কিছু বলবেন না। ওর গলার স্বর তো আমরা শুনলুম, বেশ মিষ্টি গলা। আবার কখনো সুযোগসুবিধেমত ওর গান শুনব'খন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্ততঃ এটা তো বেশ বোঝা গেছে যে মেয়ে বোবা নয়। ব্যস, এই তো যথেষ্ট!" সুন্দর রাঘবন ব্যঙ্গ করে।

"ছিঃ বাবা, ওরকম করে কথা বলতে নেই।"—ছেলেকে মৃদু তাড়না করে কামাক্ষী আম্মাল ভেতরে চলে যান। খানিকক্ষণ স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে আলাদা আলাদা বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা চলে। তারপর কুটুম্বরা এবাড়ি থেকে তাঁদের বিশ্রামের জায়গায় চলে যান।

আট

ওঁরা চলে যাবার বহুক্ষণ পরেও সরস্বতী আম্মার মনের দুশ্চিন্তা অস্থিরতা গেল না। সীতাকে ডেকে বললে—'যা তো মা একবার কুটুম্বদের ওখানে। গিয়ে বেয়ানকে ডেকে যা যা দরকার হাতের কাছে পাচ্ছেন কিনা জিজ্ঞেস করবি। ওঁদের কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা জেনে আসবি।— আর, সীমাচ্চু মামাকে দেখতে পেলে বলবি, মামী আপনাকে একবার ডেকেছে।'

সীতা যাবে বলে পথে নেমেছে, এমন সময় সীমাচ্চু আয়ারকে এবাড়ির দিকে আসতে দেখল। সীতা আর না দাঁড়িয়ে সোজা কুটুম্বদের বাসার দিকে এগোল। বাইরের বারান্দায় সোফার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে রাঘবন আধশোয়া হয়ে বসেছিল। সীতাকে আসতে দেখে সোজা হয়ে উঠে বসল। বললে, 'তুমি একাই এলে, নাকি সখিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ ?'

সীতা একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর বলে—'আমি একাই এসেছি। ললিতার সঙ্গে যা ব্যবহার করলেন তাতে সে ঘাবড়ে গেছে। আসবে কী ?'

'ভাগ্যিস তুমিও ঘাবড়ে যাওনি, মুখ খুলে দুটো কথা বলতে পেরেছ। তুমিও যদি বোবা হয়ে থাকতে তাহলেই হয়েছিল।'

'আমাকেও যদি কোথাও থেকে 'দেখতে' আসত, তাহলে নিশ্চয় আমিও বোবা হয়ে যেতাম!'— এই কথা বলে শোভনতার খাতিরে সীতা এবার অন্দরমহলে চলে যায়। কিন্তু কেন কে জানে ওর বুকটা ধ্বক্‌ধ্বক্ করতে থাকে।

ভেতরের ঘরে কামাক্ষীদেবী আর শাস্ত্রীজী বসে কথাবার্তা

বলছিলেন। সীতাকে দেখে চুপ করে গেলেন। কামাক্ষী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মা, কী মনে করে?'

'মামী দেখতে পাঠালেন, আপনাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। সব জিনিস ঠিক মতন দিয়েছে কিনা।'

'ওঃ এই কথা? মামীকে গিয়ে বোলে আমাদের এখানে কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। সব ঠিক আছে।'

'আচ্ছা, মামীমা। আমি ললিতার বিষয়ে একটা কথা বলব? আজ কেন জানি না ও অমন গুম্ হয়ে রইল। ওর মতন বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি। তাছাড়া সবসময় হাসিখুশি, সবসময় ফুর্তি করে বেড়ায়। আমার চেয়ে অনেক ভাল গান গায়। বোধহয় আপনাদের নতুন দেখে আর 'মেয়ে দেখতে' এসেছেন এই লজ্জায় ওরকম ঘাবড়ে গেছে। ও কিন্তু মোটেই ওরকম নয়। আপনারা মনে কিছু করবেন না।'

'ওঃ এ মেয়ে তো ভারী বাচাল দেখছি।'— পদ্মলোচন শাস্ত্রী বেশ সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরেই বলেন।

'তাই বুঝি তোমার তখন মনে হচ্ছিল যে এই তোমার ছেলের বৌ!' কামাক্ষী বলেন।

'তা এই বা বৌয়ের চেয়ে কম কি? আজ নয় কাল ওরও বিয়ে হবে। হ্যাঁ মা, তোমার বাবা বোম্বাইয়ে কী করেন?' শাস্ত্রী সীতাকে প্রশ্ন করেন।

'রেলওয়েতে কাজ করেন।'

'আচ্ছা। তা কত মাইনে পান?'

'তিনশো টাকা পান। কিন্তু বোম্বাইয়ের মতন আক্রার শহরে ওটাকায় সংসার খরচেও কুলোয় না। চেয়ে দেখলেই এ কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন।'

'ও তার মানে তোমার ললিতার মতন গয়না কাপড় নেই— তাই বলছ? রামের কৃপা হলে তুমিও তার চেয়ে বেশি গয়না কাপড় পরতে পারবে। আচ্ছা সীতা, তোমার বাবা তোমার বিয়ের কথা

ভাবছেন না? পাত্রটাত্র দেখা হচ্ছে নাকি কোথাও?'—কামাক্ষী জিগ্যেস করেন।

'না, বাবা 'আরলি ম্যারেজের' পক্ষপাতী নন। তবে মা হরদম পাত্র সন্ধান করে যাচ্ছেন। মার ঐ এক স্বভাব। কাল হয়তো আপনাকেই ব'লে বসবেন ঐ কথা। আপনি যেন মার কথা শুনবেন না।'

'ওকথা বলছ কেন মা। বিয়েটা যদি হয়ে যায় তো ভালই তো হয়, না?'

কামাক্ষীর কথার জবাবে সীতা বলে—'তা তো হয়। কিন্তু পাত্রপক্ষ যখন পাঁচহাজার দশহাজার বরপণ দাবি করে বসেন, তখন আমার বাবা টাকার জন্য কোথায় যাবেন বলুন? তাই আমি ঠিক করেছি বিয়েই করব না।'

'বাঃ বাঃ এই না হলে মেয়ে! মা-বাপের ওপর কী মমতা, কী টান।'— শাস্ত্রী সীতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।

'ললিতা আমার চেয়েও বেশি মা-বাবার বাধ্য। তাঁরা যেমনটি চান, সে তার বাইরে যায় না। জানেন মামাবাবু, কাল যদি ও আপনার পুত্রবধূ হয়ে যায়, তখন দেখবেন ও কত ভাল মেয়ে। আপনাদেরও নিজের মা-বাবার মতনই ভক্তিশ্রদ্ধা করবে। আপনি হয়তো আমার কথা ছেলেমানুষী বলে মনে করছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি সব সত্যিকথাই বলছি। এ বিয়েটা যদি হয় ললিতার যেমন সৌভাগ্য হবে, আপনার ছেলেও তেমনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবেন। দেখবেন!'

'বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে মা তুমি।' শাস্ত্রীজী ওরই প্রশংসা করেন।

সীতা ভাবে আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়, বেশি কথা বলাও আর ভাল দেখায় না। বলে, 'মামীমা আমি এখন তবে যাই। যদি কিছু ভুলটুল বলে থাকি মাপ করবেন।'

সীতা চলে যাবে বলে বেরোয়। রাঘব যেখানে বসেছিল, সেখানেই বসে আছে। বলে, 'মার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা সব

শুনতে পেলাম। সহেলীর পক্ষে মামলাটা ভালই চালাচ্ছিলে। অমন নিপুণভাবে কেউ তার পক্ষ সমর্থন করেনি। তোমায় সখি হিসেবে পাওয়া তোমার সখির ভাগ্যের কথা।'

'ধন্যবাদ।' সীতা বলে।

'আমাকে তুমি ধন্যবাদ দেবে কেন। আমারই উচিত তোমায় ধন্যবাদ দেওয়া।'

'আজ আপনি ধন্যবাদ দিলেও আমি নেব না। নেব, যদি কাল পাকা দেখার পরে ধন্যবাদ দেন— খুশি হয়ে নেব।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়। 'পাকা দেখা' তো হতেই হবে। কিন্তু তার আগে উভয়পক্ষের মধ্যে পাকা কথা তো হওয়া দরকার। উভয় পক্ষের সম্মতি…' বলতে বলতে রাঘবন অর্থবহ মৃদু হাসে।

তার উত্তরে সীতাও অল্প হেসে পা পাড়াল। কিন্তু সুন্দর রাঘবন কী বলতে চায়, তার ঠিক ঠিক মর্মার্থ ও ধরতে পারল না।

কিন্তু অদৃশ্য হস্তের কী এক চাতুরীর ফলে অলক্ষ্য থেকে সুরকিন্নর-গন্ধর্ব-অপ্সরলোকের বাসিন্দারা দলে দলে সীতার মাথায় গন্ধপুষ্প বর্ষণ করতে শুরু করল। দেবলোকের অপরূপ সুরলহরী সুর-সুন্দরীদের মধুবর্ষী কণ্ঠস্বরে অনুরণিত হতে লাগল। সীমাচ্চু আয়ারের বাড়ির থেকে কিট্টাবায়ারের বাড়ির পথে সীতার সমস্ত অন্তর জুড়ে উৎসাহ-আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। কেন? সীতা জানে না। সে শুধু বিভোর হয়ে রইল। বিহ্বল হয়ে রইল।

বাড়ি পৌঁছে তবে সীতা ধাতস্থ হল। সোজা সরস্বতী আম্মার কাছে গিয়ে বলল—'ভেবো না মামী, ওঁদের কাছে ললিতার এমন কষে প্রশংসা করেছি যে ওঁদের একেবারে মাথা ঘুরে গেছে। যে বর হবে, সেও বাইরে বসেছিল, আমার কথা সব শুনেছে। আমার তো মনে হয় কাল আশীর্বাদ সেরেই ওরা নড়বে, তার আগে নয়।'

কিট্টাবায়ারের বাড়ির সদরে প্যাণ্ডেলের নিচে সম্মেলন বসেছে। কয়েকজন বেঞ্চির ওপর, কয়েকজন শতরঞ্জির ওপর, কেউ কেউ

চাতালে, বারান্দার চৌকাট জুড়ে বসেছে।

কিট্টাবায়ার বাড়ির ভেতর থেকে বেরোতেই পঞ্চু আয়ার হেঁকে বলেন—'কিট্টাবায়ারজী শুনুন আপনার সুপুত্রর কথা। শ্রীমান বলছেন, চারদিন ধরে বিয়ের ধুমধাম, বিয়ের জন্যে জলের মতন টাকা খরচ করা এসব অনর্থক। বরপণ নেওয়া নাকি মহা মুর্খের কাজ।'

'তা বলে থাকলে কিছু ভুল বলেনি। আজকাল অনেকেরই ধারণা এইরকম। যে দেশে গরীবেরা খাবার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, সে দেশে বৃথা আড়ম্বরে অর্থ ব্যয় করা অপচয় ছাড়া আর কী?' কিট্টাবায়ার ছেলের পক্ষ সমর্থন করেন।

'আরে মশাই ঐটুকু বলে ক্ষান্ত হলে তো কথা ছিল। অপব্যয়, মুনাফাখোরী বন্ধ করতে হবে— এসব তো ভাল কথা। বাপবেটার ব্যাপার ভেবে নাহয় মেনে নেওয়া যেত। এ যে দেখি বড় বড় সোশ্যালিস্টদের মতন কথা। চাষা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনত করে, আমরা সেই মেহনতের ফসল বেচে আড়ম্বরে অপব্যয় করি— 'এসব বেশিদিন চলবে না'— প্রায় শাসানির মতন কথাবার্তা আপনার ছেলের।'

'তা নয় তো কি! আপনি কি ভেবেছেন এইভাবেই শতকোটি বছর ধরে চলতে থাকবে?' সীমাচ্চু আয়ার আসরে নামেন—'দুনিয়া কী গতিতে চলছে একটু খোঁজখবর রাখেন? 'লাঙ্গল যার জমি তার' এ তো আজকের জোরালো কথা। আপনি এখন কুয়োর ব্যাঙ হয়ে বসে থাকবেন তো কে কী করবে?'

'সীমাচ্চু ভায়া, তুমিও দেখছি ঐ দলে। তা আজ বলবে ক্ষেত হল চাষার। কাল বলবে ফসল যে কাটবে তার। তাহলে তো ভবিষ্যতে ঘরামীর বাড়ি, ধোপার ধুতি, ড্রাইভারের গাড়ি, ডাক্তারের ওষুধ আর পোর্টারের রেলগাড়ি হয়ে যাওয়া উচিত। শুধু তাই কেন, এমন আইন হওয়া দরকার যে, যে বানাবে তারই খাবার অধিকার। গুরুজনেরা কি সাধে বলে গেছেন যে 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি'!' আপ্পাদুরাই শাস্ত্রী ব্যাখ্যা সহ ভাষণ রাখেন।

এইসময় সীমাচ্চু আয়ারের গৃহিণী অন্নাম্মা দ্রুত পায়ে এসে কিট্টাবায়ারের অন্তঃপুরে ঢোকেন। তার খানিক পরে অন্তঃপুর থেকে লঙ্কাকাণ্ডের পূর্বাভাস ভেসে আসতে থাকে। থেকে থেকে রোষপূর্ণ কটূক্তি, থেকে থেকে চাপা কোলাহল—একেবারে নরক গুলজার। তার মাঝেই আবার কারুর ক্ষীণ কান্নার আভাস। সব ছাপিয়ে সরস্বতীর মার খনখনে তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা যায় 'তখনই বলেছিলুম না, কুলাঙ্গারদের বাড়ির ভেতর পা রাখতে দিসনি। কেমন? তখন কথা কানে নিয়েছিলি? আমি 'মেয়ে দেখতে' আসার আগে থাকতে পইপই করে তোকে হুঁশিয়ার করেছি। তা মেয়ের সে কত জ্ঞানের কথা—'তুমি থাম তো। 'বানের জল কি কুয়ো ভাসাতে পারে?' এখন দেখ্ পারে কি না পারে। এখন কী করবি কর্?' কথা নয় যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান।

সরস্বতী ক্ষীণকণ্ঠে বলেন—'তখন কে জানত মা যে এইরকম অনাচার হবে।— ওরে শুণ্ডু তোর বাবাকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়। এদিকে বাড়িতে আগুন লেগে গেল, আর উনি ওখানে বসে গালগপ্পে বাজিমাত করছেন। যা শীগ্যির ডেকে আন্।'

বাইরে যাঁরা বসে ছিলেন তাঁদের কানে সব কথাই গেছে। কিট্টাবায়ার সরোষ পদক্ষেপে ভেতরে আসেন। বলেন—'কী ব্যাপারটা কী? পাড়া যে একেবারে মাথায় করে ফেললে! বলি কারুর মাথায় বাজ পড়েছে নাকি?'

'পড়েছে বৈকি। বাজ পড়েনি তো কী? তোমার আর কী? জিজ্ঞেস কর সীমাচ্চু মামার বৌকে, কী হয়েছে। শোন ওঁর কাছে। মাদ্রাজের ভদ্রলোকদের কারচুপিটা শোন একবার। আর বোম্বাই থেকে যে আদরের বোনকে সোহাগ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ তার ফলটাও ভোগ কর। শোন না—' সরস্বতীর চীৎকারে পাড়া ফাটফাট।

'আচ্ছা আচ্ছা সব শুনব। কিন্তু তার আগে দয়া করে গলাটা একটু খাটো কর। মড়া কান্না শুরু করেছ কেন?' কিট্টাবায়ারের

ধমকে কাজ হয়। চেঁচামেচি একটু শান্ত হয়। আস্তে আস্তে ভূমিকম্পের কারণটাও পরিষ্কার হয়।

পাত্রপক্ষের কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে সীমাচ্চুর বৌ আন্নাম্মার ধারণা হয়েছে যে ছেলে ললিতাকে নয়, সীতাকে পছন্দ করেছে। তাকেই বিয়ে করতে চায়। ছেলের মা বাবা অনেক চেষ্টা করেছিলেন তার মত বদলাতে। কিন্তু ছেলে কিছুতেই গোঁ ছাড়বে না। তাই নাচার হয়ে তাঁদের ছেলের কথাই মানতে হয়েছে। কিন্তু কিট্টাবায়ারের মুখের ওপর সরাসরি এ প্রস্তাব কী করে রাখবেন? দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাঁরা তাই এ ব্যাপারে সুব্বা আয়ারের সঙ্গে সলাপরামর্শ করছেন। মনে হয় ওঁরা এখনো স্থির করে উঠতে পারেন নি যে এখানে বসেই 'হাঁ' 'না' জবাব দিয়ে যাবেন, নাকি মাদ্রাজে ফিরে চিঠিতে সব বিস্তারিত ভাবে জানাবেন।

কিট্টাবায়ার এমনিতে শান্ত স্বভাবের মানুষ। কিন্তু এ কথা শোনার পর তাঁরও খুব রাগ হয়ে গেল। কিন্তু রাগটা কার ওপর ঝাড়বেন, ঠিক করতে পারলেন না। সীমাচ্চুকে ডেকে বললেন— 'কী সীমাচ্চু, আগেই বলেছিলুম না— মাদ্রাজের লোকেদের চরিত্তির। এখন বোঝ।'

আপ্পাতুরাই শাস্ত্রী আশ্বাসের সুরে বলেন— 'ওঁরা পছন্দ না করলে কি আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে না? আপনি একবার মুখ ফুটে বলেই দেখুন-না হাজার খানেক বর আমি কালই এনে হাজির করছি।'

মেয়ের মা বলেন—'কোন দরকার নেই। এবছর আমি মেয়ের বিয়ে দেবই না। যাঁরা এসেছেন তাঁরা দয়া করে বিদেয় হলেই এখন সোয়াস্তি পাই।'

রাজাম্মা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। বলে, 'এসবই আমার কপালের দোষ দাদা। আমি যেখানেই যাব আমার মন্দ-ভাগ্য আমার সঙ্গে যাবে।'

'বাজে বকিস নি। তোকে কে কী বলেছে?' কিট্টাবায়ার বোনকে ধমকে ওঠে।

অভয়া দিদি বলেন—'আর একটা মেয়ে ওদিকে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। সে বেচারী করবেই বা কী? সে তো প্রথম থেকেই ওপক্ষের লোকের সামনে যেতে রাজি হয়নি। ললিতাই জেদ ধরে বসল। বৌদিও তো তখন বাধা দেয়নি।'

'আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। আমি তো চিরকেলে বেয়াক্কেলে। সবাই জানে। আমার চেয়ে আমার মেয়েটা আরো বড় ঢেঁকি। তা তোমরা তো পাঁচজন ছিলে বুদ্ধিমতী জ্ঞানীগুণী। তোমরা তো আমায় বুদ্ধি দিতে পারতে, সাবধান করতে পারতে, বারণ করতে পারতে।' —সরস্বতী ফেটে পড়েন।

'ব্যস ব্যস, ঢের হয়েছে। এবার চুপ কর সবাই। যাও, পার তো সেই মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করগে।' কিট্টাবায়ার বলেন, 'কেঁদেকেটে খুন হচ্ছে মেয়েটা।'

'কেঁদেকেটে খুন হচ্ছে না আরো কিছু! ওসব ভাণ! গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা!' —সরস্বতী বিষোদ্‌গার করেন।

ঘরের ভেতর ললিতা সীতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কথাবার্তা তার কানে গেছে। মায়ের হীনতার কথা শুনে সে আর থাকতে পারল না। ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতন বেরিয়ে এল। ক্ষোভে রোষে ফেটে পড়ল— 'বাবা! আমার কথাগুলো দয়া করে শুনুন। আজ যে ছেলে আমায় দেখতে এসেছে, আমি কিছুতেই তাকে বিয়ে করব না। আমায় মেরে কেটে ফেললেও করব না। আমি গোড়া থেকেই বলে আসছি যে এসব ব্যাপার আমার আদৌ পছন্দ নয়। কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দেয়নি। সবাই জানে যে সীতা প্রথমে হাতটা মুখটা ধুয়ে একটা ফরসা কাপড় পরতেও চায়নি। আমার সঙ্গে যেতে তার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। আমিই জোর করে তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছি। তবু তাকে এভাবে দোষ দেওয়া হলে হয় আমি এবাড়ি ছেড়ে এক্ষুনি চলে যাব, আর নয় কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরব।'

সখির পক্ষ নিয়ে ললিতার এইরকম তেজী কথাবার্তা শুনে সকলেরই মন ভিজে উঠল। কিন্তু সরস্বতীর রাগ আরো বেড়ে

গেল। ঝাঁজে ফেটে পড়ে বললে—'যা, তাই যা। কুয়োয় ডুবেই মরগে যা। আমার হাড় জুড়োয়। ভাবব আমার কোন মেয়েই ছিল না কোনদিন।'

'ছি ছি ছি। এরকম কথা মুখে উচ্চারণ করতে আছে? এখনো তো কিছু নিষ্পত্তি হয়ে যায়নি। সীমাচ্চু তো গেছে ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বোঝাতে। তাকে আসতে দিন!' আপ্পাতুরাই শাস্ত্রী বললেন।

'সীমা মামা যত খুশি কথাবার্তা বলুন। তাদের বোঝান। আমার ঐ এক কথা। ছেলে যদি এখন বলেও যে আমাকে পছন্দ হয়েছে, তবুও আমি এ বিয়েতে রাজি হব না। আমি কিছুতেই এখানে বিয়ে করব না।' ললিতা সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করে।

'ললিতা, এসব কী বলছিস তুই?'— কিট্টাবায়ার প্রশ্ন করেন।

'ও কি আর বলছে? ওর মুখ দিয়ে বলাচ্ছে আর-একজন। ওসব আর-একজনের শেখানো বুলি, ও কপচাচ্ছে। তোমার গুণধর ছেলে সূর্যার কুশিক্ষাতেই মেয়েটা উচ্ছন্নে গেল। আর ছেলের মাথাটাও কেউ আগেই বিগড়ে দিয়েছে।'—মায়ের উক্তি।

সূর্যা এতক্ষণ চুপচাপ আর সকলের কথা শুনছিল। এবারে মুখ খোলে, 'আমার মাথা কেউ বিগড়ে দেয়নি। আমার মাথা খুব ভাল আছে। আমি আগেই বলেছিলুম যে এসব আহাম্মুকি ছেড়ে দাও। তোমরা তখন কথায় কান দিলে না। তোমাদের আমলে তোমরা বিয়ে থা করে যে দুর্ভোগ ভুগেছ তাতেও তোমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি?... আমাদের ভালমন্দ আমাদের ওপরেই ছেড়ে দাও-না। ললিতা তার পছন্দমত ছেলেকে বিয়ে করবে। পছন্দ না হলে কারুর কথায় বিয়ে করবে না। সেই একই কথা সীতার ক্ষেত্রেও বলব। মাদ্রাজ থেকে যে বিদ্যেবুদ্ধির বেরস্পতি এসেছেন, সীতার যদি তাঁকে পছন্দ না হয়, মুখ ফুটে পরিষ্কার বলে দিক-না, যে আমার পছন্দ নয়। তার জন্যে, ঘরের কোণে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবার তো কোন দরকার নেই।'

আসলে সূর্যর কলজে জ্বলছিল। মাদ্রাজের বৃহস্পতির ওপর তার মন প্রথম দর্শন থেকেই বিরূপ হয়েছিল। তারপর আবার যখন শুনল সে সীতাকে বিয়ে করতে চায়, তখন তার বিরূপ মন আরো জ্বলে উঠল।

খানিক পরেই সীমাচ্চু আয়ারের বাড়ি থেকে লোক এল কিট্টাবায়ারকে ডাকতে। কিট্টাবায়ার উপস্থিত হলে, প্রাক্তন সাব-জজ ও তদীয়া গৃহিণী স্পষ্টাস্পষ্টি কথাটা বলেই ফেললেন।

'আপনার মেয়ে কোনদিক দিয়ে কম নয়। খুব সুন্দরী, খুবই মধুর স্বভাব। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের সকলই বিচিত্র। আমাদের গুণধর পুত্র প্রথম দর্শনেই না-জানি সীতার মধ্যে কী দেখেছেন, বলছেন—'বিয়ে যদি করতে হয় এই মেয়েকেই করব।' আমরা বোঝাতে কসুর করিনি। সে কোন কথায় কর্ণপাত করতে রাজি নয়। এখন আপনাদের যদি মত হয় তো কালই আশীর্বাদ হয়ে যাক। আর মেয়ে কি মেয়ের মার যদি এ সম্বন্ধে আপত্তি থাকে, নিঃসংকোচে জানিয়ে দিন। এতে জোর জবরদস্তির তো কিছু নেই।'

কিট্টাবায়ার থ হয়ে থাকেন। কী জবাব দেবেন বুঝতে পারেন না। 'মেয়ের মাকে জিজ্ঞেস করে বলব' এই বলে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। বাড়িতে না ঢুকে কিট্টাবায়ার সীমাচ্চু আর সুব্বা আয়ারকে নিয়ে বাগানবাড়িতে পরামর্শে বসেন। তাঁরা দুজনেই সমস্বরে বলেন 'এ তো বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া। শুভস্য শীঘ্রম। আপনার মেয়ের অনেক ভাল বর জুটবে। ভাববেন না। আমরা শ'য়ে শ'য়ে পাত্র এনে দাঁড় করিয়ে দেব। বোম্বাইয়ের মেয়ের পক্ষেই বরং বর পাওয়া শক্ত। এঁরা বলছেন, পণ-যৌতুক ছাড়াই বিয়ে হবে। উত্তম প্রস্তাব। আমরা আপত্তি করতে যাব কেন? তাতে লাভটা কার? কালই পাকা দেখার পানসুপুরি হয়ে যাওয়াই তো শ্রেয়।'

কিট্টাবায়ারের যেটুকু রাগ গোসা হয়েছিল, বন্ধুদের সৎপরামর্শে

সেটুকু উবে গেল। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল ওঁদের কথাই ঠিক, এবং সবদিক দিয়ে কল্যাণকর। কিন্তু এই হিত কথাটা গিন্নীকে বোঝানো যায় কেমন করে? সেই কথা ভাবতে ভাবতেই রাত দুপুর হয়ে গেল। একটার সময় বাড়ি ফিরে দেখল ছেলে সূর্য জেগে আছে।

সূর্যও খুব বিচলিত হয়ে ছিল। তার ঘুম আসছিল না। বহুক্ষণ পরে একটু শান্ত হয়ে সে ভাবতে বসল, 'কী জানি হয়তো ভগবানের এই ইচ্ছে। রাঘবন দিল্লীতে মোটা চাকরি করে, সাড়ে সাতশো টাকা তার মাইনে। আমার তুলনায় সীতার পক্ষে সে সবদিক দিয়েই যোগ্যতর পাত্র। হয়তো সীতার ভাগ্যই তাকে এইভাবে টেনে নিয়ে এসেছে। সীতার ভবিষ্যৎ, তার সুখ সৌভাগ্য নিয়ে খেলা করার কী অধিকার আমার?'

এইরকম চিন্তাস্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিল, এমন সময় কিট্টাবায়ারের পায়ের শব্দ কানে গেল। সূর্য বাপকে জিজ্ঞেস করল— 'ওঁরা কী বললেন বাবা? কী নিষ্পত্তি হল?'

'কে, সূর্য! তুমি এখনো ঘুমোওনি? যাক ভালই হল। তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাবে। ছেলে তো সীতাকে বিয়ে করতে চায়। তার মা-বাবাও তাই বলছেন। বলছেন, টাকাপয়সা, দানযৌতুক কিছুই তাঁদের দাবিদাওয়া নেই। তা তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার কী মত বল।' কিট্টাবায়ার ছেলের সামনে সমস্যাটা তুলে ধরেন।

সূর্য বলল— 'বাবা কথাটা যখন এতদূর গড়িয়েই গেছে, তখন আমিও একটা কথা খোলসা করে বলাটা উচিত মনে করছি। আমাদের উকীল আত্মারাম আয়ারের ছেলে পট্টভিরামণের ললিতাকে বিয়ে করার ইচ্ছে। গতবছর আপনারা যখন তাদের ওখানে উঠেছিলেন তখনই সে ললিতাকে দেখেছে। খুব পছন্দ হয়েছে তার। আপনি অন্য সম্বন্ধ দেখছেন শুনে তার মনে খুব লেগেছে। শুধু তার একলার নয়, উকীলবাবুরও। তিনিও বল-

ছিলেন 'আমরা কি আর তোমার বাবার চোখে পড়বার উপযুক্ত ? তিনি আরো উঁচু ঘরবর দেখবেন'।'

'তাই নাকি ? এ তো আমি জানতাম না। বিলক্ষণ। আত্মানাথ উকীলের ছেলেও খুব ভাল বর। আমি যে তার কথা ভাবিনি তা নয়। কিন্তু তোমার মারই বায়নাক্কা—আরো ভাল জায়গা দেখ, আরো ভাল। সত্যি বলতে কি পট্টভির সঙ্গে ললিতার বিয়েতে আমার খুবই আগ্রহ আছে। তা ঠিক আছে। এ ব্যাপারে ফুরসতমত কথাবার্তা বলা যাবে। এখন সীতার ব্যাপারে তোমার কী মত বল।'—কিট্টাবায়ার ছেলের মতামত প্রার্থনা করেন।

'সীতার বিষয়ে আমি কী করে মতামত দেব বলুন, কীই বা বলব ? তার নিজের কী মত, পিসিমার কী মত, জিজ্ঞেস করে দেখুন। বেশি টাকাকড়ি খরচ না করে যদি এমন একটা ভাল সম্বন্ধ স্থির হয়, তবে তো খুশি হবারই কথা। আর এতে আমাদেরও নাম থাকে।' সূর্য বলে।

'তোমার মাকে বোঝাবার ভারটা তাহলে তুমিই নাও। আমি বলতে গেলে তো আমার ওপর ঝেঁজে উঠবে, যে আমি আমার বোনের হয়ে ওকালতি করছি।'

'ঠিক আছে বাবা। আমি মাকে রাজি করাব।'

সূর্য বলল বটে, কিন্তু কাজটা অত সহজ হল না। সে যাই হোক, অনেক কষ্টে সূর্য সফল হল। বিশেষ করে একটা যুক্তি তার মার খুব মনে ধরল যে মাড্রাজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে, আজ দিল্লী, কাল লাহোর, পরশু করাচী করে ললিতা ক্রমেই দূরে দূরে চলে যাবে। কিন্তু উকীলের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে কাছেপিঠেই থাকবে। যখনই মন চাইবে, দেখে আসা যাবে। মায়ের মমতা বলে কথা, এই অস্তরে সরস্বতী আম্মাল একেবারে ঘায়েল হয়ে গেল।

সকলের সম্মতিক্রমে পরদিন বিকেলে, মাদ্রাজের পদ্মাপুরনিবাসী ভূতপূর্ব সাবজজ শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র

চিরঞ্জীব শ্রীমান সুন্দর রাঘবনের সহিত বোম্বাই-নিবাসী তুরাইস্বামী আয়ারের কন্যা কুমারী সীতার 'পাণিগ্রহণের' কথা পাকা হয়ে গেল এবং তাম্বুল-বিনিময় অনুষ্ঠানও সুসম্পন্ন হল। মেয়ের মা রাজম্মা বৈবাহিকদের আশ্বাস দিলেন, যে কন্যার বোম্বাইবাসী পিতা তুরাইস্বামী আয়ারের উক্ত বিবাহে বিন্দুমাত্র আপত্তি বা অমত হবে না। অতঃপর আশীর্বাদ-সংস্কারে আর কোন বাধা রইল না।

গোটা ব্যাপারটায় সবচেয়ে যে বেশি খুশি হল, সে ললিতা। কালকের বোবা মেয়ে আজ একেবারে মুখরা হয়ে উঠল। রাঘবনকে 'জামাইবাবু' 'জামাইবাবু' করে ক্ষেপিয়ে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে, হাসিতে তামাশায় ললিতা একেবারে উচ্ছল হয়ে উঠল।

নয়

বিয়ের কথা পাকা করে মাদ্রাজে ফেরার পর সুন্দর রাঘবনের মন এক নতুন উৎসাহে ভরপুর হয়ে উঠল। তার মনে হল এবার তার জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল যে অধ্যায়ে কেবল আনন্দ আর আনন্দ, আনন্দ ছাড়া আর কিছুই সেখানে থাকবে না। তার আর তারিণীর মধ্যে প্রেমের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এখন সে সেটাকে একটা স্বপ্নের মায়া ভেবে ভুলে যেতে চাইল, ভুলতে সক্ষমও হল কিছুটা।

এইরকম সময়ে একদিন মজঃফরপুর থেকে তার নামে একটা টেলিগ্রাম এল। টেলিগ্রাম পড়ে একেবারে বিচলিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত এলাকার আর্তত্রাণ সেবাদলের মজঃফরপুর শিবির থেকে তারবার্তাটা এসেছে। তাতে লেখা :

মজঃফরপুর / 12.2.1934

মহাশয়,

একটি দুঃখজনক সংবাদ দিতে বাধ্য হচ্ছি। বোম্বাই থেকে আগত একজন স্বেচ্ছাসেবিকা এখানকার স্থানীয় সেবা-শিবিরে সেবা-কাজে নিয়োজিত ছিল। তার নাম তারিণী। নিজগুণে সে এখানে সকলের প্রিয় হয়েছিল। কাল মধ্যাহ্নভোজের পর সে তার কাজে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রাত্রে ফিরে আসেনি। তার একটি বিশেষ বিপজ্জনক অভ্যাস ছিল। ভূমিকম্পে ভাঙা ইমারতের ফাটল দিয়ে উঁকি মেরে দেখা। বারবার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও সে এই বদঅভ্যেস ত্যাগ করেনি। কাল বিকেলে যারা তারিণীকে শেষবার দেখেছে, তারা জানাচ্ছে যে তাকে তখনো তার

স্বভাব অনুযায়ী ভাঙা ইমারতের ফাটল দিয়ে ঝুঁকতে দেখা গেছে। বহু অনুসন্ধান করেও এখনো তার কোন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। তার ডায়েরীতে আপনার ঠিকানা লেখা ছিল। সেইজন্যে আপনাকে এই সংবাদ দেওয়া হল। তারিণীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকলে আমাদের হয়ে এই খবরটা তাঁদের দিয়ে দেবেন। যদি তারিণী ফিরে আসে, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ আপনাকে খবর দেব।

সরলাদেবী।

কয়েক লাইন পড়তে পড়তেই তারিণীর ওপর রাঘবনের জমাট-বাঁধা রাগ গলে জল হয়ে গেল। তার জায়গায় পুরনো প্রেম আর সমবেদনা আবার উথলে উঠল।

সবটা পড়ার পর তার চোখ জলে ভরে এল। উঠে আলমারীর কাছে গেল, তালা খুলে তারিণীর ছবি বার করল। বহুক্ষণ যাবৎ ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। তারিণীর মুখভঙ্গী, তার কথা, হাসি চলনবলন সব একে একে তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। রাঘবন ককিয়ে উঠল—'উঃ শেষ অবদি এই ছিল…' রাঘবনের চোখের জলের বাঁধ ভেঙে গেল। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে তারিণীর ছবিটা ভেসে যেতে লাগল। আর সেইসঙ্গে এক অব্যক্ত শান্তিতে ভেতরটা যেন ভরপুর হতে থাকল। তারপর আট-দশদিন পর্যন্ত সে মজঃফরপুর থেকে শুভসংবাদ আসার প্রতীক্ষা করে রইল। কিন্তু আর কোন খবর এল না।

বিয়ে স্থির হবার কয়েকদিন পর সূর্য বোম্বাইয়ের পিসিকে নিয়ে তাদের দীঘির পাড়ের বাগানবাড়িতে গেল। সূর্য বললে— পিসিমা আপনার সঙ্গে কথা আছে। তাই এখানে নিয়ে এলাম আপনাকে।

রাজাম্মা ভালমন্দ সবকিছুর জন্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে। বলে—'যা বলবে অকপটে বল বাবা, আমার মনে ঘা লাগবে ভেবে কিছু লুকিয়ে রেখো না।'

সূর্য মনোযোগ দিয়ে দীঘির শাপলা দেখছিল, ওপারে পাড়ের

ওপর বটের ঝুরি নামা দেখছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তার-পর বলল—'তেমন গুরুতর কিছু নয়। একটা 'বেনামা চিঠি' এসেছে। 'বেনামী চিঠি' বোঝ তো? তাতে লেখকের নাম ঠিকানা থাকে না। কে লিখছে বোঝা যায় না। অনেক সময় হিংসেয় পড়ে কেউ কেউ এরকম করে, যাদের সৎসাহস নেই, তারাই কোন ভাল কাজে বাগড়া দেবার জন্যে এই পথ অবলম্বন করে। এইরকম একটা চিঠি তোমার নামে এসেছে।'

'কার কথা লিখেছে? আমার কথা না তোমার পিসের কথা?'

'তোমাদের দুজনের কথা নয়।'

'তবে কি সীতার কথা? কোন পাপী এরকম লিখতে পারে?'—রাজাম্মা ফেটে পড়ে হঠাৎ। ওর মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে ওঠে।

'না, সীতার কথাও নয়। সীতার কথা লেখবার কী আছে?... আমি জানি পিসিমা, তোমাকে জীবনে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সীতার মত মেয়ে পেয়েছিলে তুমি এটা কিন্তু সত্যি তোমার সৌভাগ্য। তার তুলনায় তোমার কোন কষ্টই কষ্ট নয়। কী বল!'—সূর্যর কথা শুনে রাজাম্মার মুখ আবার প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বলে, 'সীতাকে নিয়েও কথা নয়, তবে কথাটা কার সম্পর্কে লিখেছে?'

'কথাটা সীতার হবু বরকে নিয়ে। তার সম্পর্কে লিখেছে।'

'কী বললে? জামাইয়ের সম্পর্কে? কী লিখেছে?'— রাজাম্মা উতলা হয়ে প্রশ্ন করে।

'সেকথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে পিসিমা। তবু না বলেও পারছি না। কারণ কথাটা তোমার জানা দরকার। লিখেছে বোম্বাইয়ের একটি মেয়ের সঙ্গে রাঘবনের খুব মাখামাখি ছিল। একবার সেই মেয়ে পদ্মাপুরমে রাঘবনের বাড়ি বয়ে এসে ঝগড়া-ঝাঁটিও করে গেছে। দুনিয়াসুদ্ধু সবাই সে তামাশার কথা জানে। ভেবে দেখুন, এমন লোকের হাতে মেয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?'

রাজাম্মা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, ভাবে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বলে— 'আর কিছু লিখেছে?'

'বরের মা-বাপের কথাও তুলেছে। তাদের ওপরেও কাদা ছুঁড়েছে। বাপটা নাকি অর্থপিশাচ, পয়সার লোভ ভয়ানক। আঙুল দিয়ে জল গলে না। হাড় কেপ্পন। মা-টা ভীষণ পাজি আর দয়ামায়া নেই শরীরে। বড় ছেলের বৌকে খুব খোয়ার করেছে। শেষকালে সে বাপের বাড়ি চলে গিয়ে বেঁচেছে। ফলে সেই ছেলেরও শ্বশুরবাড়ি বাস। এমন ঘরে আপনি কিসের আশায় সম্বন্ধ করতে যাচ্ছেন?'

রাজাম্মা আবার চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। খানিকপরে আবার সূর্যকে জিজ্ঞেস করে—'সূর্য, তোমার বয়েস কম হলেও, বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি রাখ। বৌদিও সব কথায় তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার কথা বলে। তাই এ ব্যাপারেও আমি তোমার কাছেই পরামর্শ নিতে চাই। এই বেনামা-চিঠির ব্যাপারে তোমার কী মনে হয়। তুমি এসব সত্যি বলে বিশ্বাস কর?'

'না পিসিমা। আমার তো মনে হয় এসব কেউ হিংসে করে লিখেছে। এই তুচ্ছ চিঠির ওপর ভিত্তি করে বিয়ে ভেঙে দেওয়া উচিত হবে না। তবে, এসব কথা তুমি বা পিসেমশায় ভাল করে ভেবে দেখবে। পিসেমশায় এসব শুনলে কী বলবেন তা তো জানি না। তিনি তো আজো এলেন না।'

'তাঁর চিঠি এসেছে। লিখেছেন বিয়ের আগের দিন নিশ্চয় এসে পড়বেন। তিনি লিখেছেন দিল্লীতে ছেলের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। সেখানে তার খুব সুনাম। ওপরওলা অফিসাররা তার ওপর খুব খুশি। চাকরীতে উন্নতিও আছে। মাইনে বেড়ে দু'হাজার টাকা অব্দি উঠবে।'

'তবেই দেখ। আমি এখনই যা বলছিলুম, তাই ঠিক। কোনো কুচুক্কুরে লোকেরই বানানো কথা সব!'

'হ্যাঁ তাই হবে। ভাল ছেলে পাওয়া তো সহজ নয়। এরকম ছেলেকে মেয়ে দেবে বলে অমন কত মা-বাপই তো চেষ্টায় ছিল। তাদের সাধে ছাই পড়েছে বলে হিংসেয় এরকম করা কিছু অসম্ভব নয়।'

'ঠিক তাই হয়েছে!' এতে আর সন্দেহ নেই।'

'তাহলে তোমারও এই মত তো যে এখানেই বিয়ের ব্যবস্থা হোক।'

'নিশ্চয়, একশোবার। ব্যবস্থা তো পাকাই হয়ে রয়েছে। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার মানে হয় না।'

'ধর চিঠির কথাগুলো সত্যিই হল। তাহলেও আমরা কী করতে পারি। মার কৃপা থাকলে সীতা সুখশান্তিতে থাকবে। ভগবানের যদি এই ইচ্ছে হয় যে এখানেই সীতার বিয়ে হবে, তো কে ঠেকাবে বল!'

'এতে কোন সন্দেহ নেই পিসিমা, যে এ বিয়েতে ভগবানের সম্পূর্ণ হাত আছে। নইলে ললিতাকে দেখতে এসে ছেলের সীতাকে পছন্দ হবে কেন?'

'আমার মনও তাই বলে সূর্য। কারুর উড়ো চিঠি পড়ে মিছিমিছি আমাদের মন-মেজাজ খারাপ করার দরকার নেই। তুমি এক কাজ কর। আমার কিংবা সীতার নামে চিঠি এলে, এবার থেকে সেগুলো তুমিই আগে খুলে পোড়ো। পড়ে যদি দেবার মতন মনে হয় তো আমাদের দিও, নইলে ছিঁড়ে জঞ্জালে ফেলে দিও। আর আমার মত নাও তো বলি, তোমার বাবার নামের চিঠিও তোমার আগে পড়া উচিত। কেননা, যেমন আমাকে লোকে লিখছে, তেমনি তাঁকেও লোকে লিখতে পারে, তাঁর মন খারাপ করে দিতে পারে।'

'ঠিকই বলেছ পিসিমা। আমিও তাই করব, ভাবছি।'

'সূর্য, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমায় সুখেস্বাস্থ্যে রাখুন। এই প্রার্থনা ছাড়া তোমায় দেবার আমার কিছুই নেই, বাবা।' রাজম্মা কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে।

গাছের ঝুরির ফাঁকে সরসর হাওয়া বইছে। এ ছাড়া বাগানবাড়ির কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। বহমান বাতাসে যেন দূরাগত-সমুদ্র-তরঙ্গের শব্দ। সূর্যর একটা কথা মনে পড়ে। বলে—'পিসিমা, তুমি সেদিন ঢেউয়ের মতন শব্দ শুনে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে, মনে আছে? আমি কারণ জানতে চাইলে তুমি বললে পরে বলবে।'

রাজম্মার মুখে একটা মেঘলা ছায়া পড়ে।

'বলছি। সূর্য, একটু আগেই ভাবছিলাম তোমাকে বলব। এখানে আসার আগেই বোম্বাইয়ে যখন অসুখে শয্যাশায়ী ছিলাম, না? সেই সময় ভারী জ্বরের দরুন মাঝে মাঝে কীরকম যেন সব বিভ্রম দেখতাম। অনেক অদ্ভুত, অসম্ভব সব দৃশ্য। কোন-কোনটা স্বপ্নের মতন মিষ্টি, আবার কোনটা যেন দুঃস্বপ্নের মতন ভয়ানক। সে যে কত রকম, তার ইয়ত্তা নেই। একবার দেখলুম আমি আর সীতা সমুদ্দুরের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। সীতা জলে নেমে যাচ্ছে। আমি যতই বারণ করছি, 'যাসনি, যাসনি' করছি, সমুদ্রের হাহাকারে আমার সে ডাক আর সীতার কানে পৌঁচচ্ছে না। সে সমানে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে তাকে আছড়ে ফেলে দিল, তারপর একটানে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তাকে বাঁচাবার জন্যে আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। আমি সাঁতার জানি, তাই ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝে এগিয়ে চলেছি। ঢেউয়ের গর্জন ছাপিয়ে আমি চীৎকার করে উঠি—'সীতা'। আমি ডেকেই চলেছি, সাঁতরেই চলেছি। হাত আর যেন চলে না, গলায় স্বর বেরোয় না। এমন সময় হঠাৎ যেন হাতে কী বেধে গেল। দেখি সীতার একখানা হাত। আমি প্রাণপণ জোরে হাতটা আঁকড়ে ধরি। —সূর্য, একবার-দুবার নয়, কতবার যে এই স্বপ্নটা দেখেছি, তার ঠিক নেই। আর প্রত্যেকবার ঠিক ঐরকম সীতার হাতটা ধরতেই চটকা ভেঙে গেছে, ঘোর ভেঙে জেগে উঠেছি। মনে হত যেন সত্যি সত্যিই ঐরকমটা ঘটছে। এখনো মনে করলে ভয়ে গা কাঁপে। ঝাউগাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার স্বর শুনলেও তাই চমকে উঠি। ঐ দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়।'

শুনে কি ভেবে সূর্য বলে— 'এ কথা সীতাকে বলেছ নাকি?'

'হ্যাঁ বলেছি। আর সাবধান থাকতেও বলেছি।'

'পিসিমা। এসব কথা সীতাকে না বললেও পারতে। বলাটা ঠিক হয় নি।'—সূর্য বলে।

দশ

রাজমপেট্টাইয়ের ব্রাহ্মণ পল্লীতে বেজায় ধুমধাড়াক্কা। কিট্টাবায়ারের বাড়ির বিয়ে তো মামুলী কথা নয়। বিয়ের সাত দিন আগে থেকেই সারা গ্রামে গুলজার। কারুর বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। গাঁ সুদ্ধু সকলেরই খাওয়াদাওয়া সব কিট্টাবায়ারের বাড়িতেই হচ্ছে এ ক'দিন।

সারাদিন কেবল বলদের গলার ঘুঙুর ঘণ্টার রুনঝুন শব্দ। গাড়িগুলোর একমুহূর্ত দম ফেলার ফুরসত নেই। থাকবে কোথা থেকে? প্যাণ্ডেলে দু-দুটো বিয়ে। হ্যাঁ, ললিতারও পট্টভির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে— একই মণ্ডপে!

বিয়ের আগের দিনই উভয় পাত্রপক্ষ উপস্থিত হয়ে গেছেন। আর কী চাই? গাঁয়ের ভোলই পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট মেলা বসেছে। লোকের ভিড় দেখলে মনে হবে— রথ— দোল কি দুর্গোৎসব।

উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাবল্য সত্ত্বেও একটা কথা সকলের মনেই একটু বিঁধছে। সীতার বাবা দুরাইস্বামী এখনো এসে পড়েন নি। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির অজুহাতে বিবাহ রদ করার কথা কারুর মনে হয়নি। রাজম্মার মনের বেদনা ও উদ্বেগের পরিমাণ বোঝা শক্ত! তবে সে সে-ভাব বাইরে প্রকট হতে দেয়নি। বরং সে জোর দিয়েই বলেছে যে তার স্বামী যদি কোন কারণে নাও এসে পৌঁছয়, তবুও বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাক। কারণ স্বামীর চিঠি তার হাতে আছে। সেটাই তার বল-সম্বল। তিনি সর্বান্তঃকরণে এ-বিয়ে অনুমোদন করেছেন। তাঁর সেই চিঠি পড়ার পর

বৈবাহিক পক্ষেরও দ্বিধা সংশয় আর রইল না। সকলেরই মনের বোঝা হালকা হয়ে গেল।

রাত দশটা বেজে গেল। শেষ ট্রেনেও দুরাইস্বামী এলেন না। কিট্টাবায়ার বোনের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। সিদ্ধান্ত হল যে তাঁদের বড় বোন অভয়া আর তাঁর স্বামী— এঁরা দুজনেই কন্যা-সম্প্রদান করবেন।

রাজম্মা তার মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে—'সীতা বড়ই পুণ্য-বতী। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান-সম্পন্ন এক ধর্মপ্রবণ দম্পতি তাকে সম্প্রদান করছে।'

অভয়ারও খুশির সীমা নেই। কন্যাদানের সৌভাগ্য অনেক পুণ্যে হয়। কিট্টাবায়ার ললিতা আর সীতার মধ্যে কোন তফাত রাখেনি। বিবাহসামগ্রী সবই একরকম। কোনো তুচ্ছ ব্যাপারেও কম-বেশি হয়নি। কী কনের চেলি, কী বরের জোড়। এক তিল এদিক-ওদিক হয়নি। সব সমান সমান। তবে অন্দরমহলের কথা আলাদা। সেখানে গৃহস্বামীর নয়, স্বামিনীর কর্তৃত্ব। মেয়েদের পক্ষ থেকে দেয় দানসামগ্রী ইত্যাদিতে রকমফের ছিল। সরস্বতী, মেয়ে ললিতা আর ভাগ্নী সীতার মধ্যে যথেষ্ট তুই-তুই ভাব করেছে। দ্রব্যসামগ্রীরও কম-বেশি হয়েছে।

অভয়াম্মাল এসব বরদাস্ত করতে পারে না। সে গজগজ করতে থাকলে রাজম্মা তাকে ডেকে বলে 'দিদি, মুখের রাশ টান, দোহাই তোমার! যার বোঝা, সে আসব বলে এল না। তবুও সবকিছু নির্বিঘ্নে হয়ে যাচ্ছে। এতে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি খুশিই রয়েছি। এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে বিলাপ করা কি উচিত? দাদা কত করছে। দাদার মতন ভাই পেয়েছি তাই। নইলে আজ আমার কী সাধ্যি যে এতখানি করি। ভগবানের অসীম কৃপা, তাই এমন জামাই আর এত ভাল কুটুম্ব পেয়েছি। 'এটা নেই, সেটা হয়নি' বলে তার নিন্দেমন্দ করতে পারত, সেসব কিছুই করেনি। আর আমার কী চাই? তুমি

অকারণে মন খারাপ করছ কেন? 'মন চাঙ্গা তো কঠৌতী মে গঙ্গা!' যা হয়েছে তাতেই খুশি থাকা। সন্তোষ মস্ত বড় গুণ।'

সীতার মনকলসে বেদনার সাগরজল। একদিকে এই পরম লগ্নে পিতার অনুপস্থিতি— রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে। অন্যদিকে ললিতার দানসামগ্রী দেখে দেখে তার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। কিন্তু মনের রোষ ক্ষোভ অভিমান সব ছাপিয়ে তার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা 'ললিতাকে যতই দানেসামগ্রীতে ভরে দাও, আমার সৌভাগ্য সে পাবে কোথায়?' -তার সাময়িক বিক্ষোভ কেটে যায়। মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে বেদনাক্লিষ্ট মন সূর্যর। তার হেতু একটা টেলিগ্রাম। বিয়ের আগের দিন রাজম্মার নামে তার এসেছিল। রোজকার মতন ও ডাকঘরে গিয়ে দৈনন্দিন ডাক দেখতে যাচ্ছিল, এমন সময় বিশেষ পেয়াদা ঐ তারবার্তাটি এনে তার হাতে দিল। তার খুলে পড়ে সূর্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারবার্তার মর্ম : 'বিয়ে বন্ধ কর। কারণ সাক্ষাতে বলব— তুরাইস্বামী।'

কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সূর্যর পক্ষে এ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। এও হতে পারে যে যারা উড়ো চিঠি দিয়ে সীতার বিয়ে ভাঙতে চেষ্টা করেছিল, তারাই মরীয়া হয়ে এই তার করেছে। এর সম্ভাবনা যথেষ্ট। সে ক্ষেত্রে এ তার অন্যের হাতে পড়লে কিংবা কেউ এ কথা জানতে পারলে বিষম গণ্ডগোলের সূত্রপাত হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে সূর্য এই সিদ্ধান্তে এল যে—'এখন এ তার কাউকে দেখাব না।'

সূর্য ভাবল, 'যাই হোক-না কেন, তুরাইস্বামী রাত্রের মধ্যে নিশ্চয় এসে পড়ছেন। প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই বিয়ে স্থগিত করুন। কারণ না জেনে আমার পক্ষে বিয়ে বন্ধ করার কথা বলতে যাওয়া সংগত হবে না। তার চেয়ে টেলিগ্রামের খবর এখন চেপে যাওয়াই ভাল। রাত্তিরে যদি সীতার বাবা না আসেন, তখন দেখা যাবে।' সূর্য তার নিজস্ব সিদ্ধান্তের সমর্থনেএই যুক্তি খাড়া করে। তুরাইস্বামী যখন রাত্তিরের গাড়িতেও এলেন না, তখন সূর্যর মানসিক অস্থিরতা তুঙ্গে

পৌঁছল। ইতিমধ্যে বরানুগমনের আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা সম্পন্ন হয়ে গেল। তখন তার নিয়ে কোন কিছু করা আরো অসম্ভব হয়ে পড়ল।

'আচ্ছা যদি এমন হয়, ধর কোন ঈর্ষাপরায়ণ অসৎ লোক অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এই ঝুঠো তার করে থাকে, আর তার দরুন যদি একবার বিয়েটা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সীতার আর রাজম্মার দশা কী হবে! সেই পাহাড়প্রমাণ হতাশা ওরা সামলাবে কী করে?' এই চিন্তায় সূর্যর অবশিষ্ট সাহসও উবে যায়। সূর্য আবার সাহসে বুক বাঁধে। ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হোক। অনুষ্ঠান যখন এতখানি এগিয়ে গেছে, তখন এই মুহূর্তে তারের খবর পুরোপুরি চেপে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু ঐ চাপা তারবার্তা, তার মগজের মধ্যে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে তার রাতের ঘুমটুকুকে একেবারে ঘুচিয়ে দেয়। সূর্যর শান্তি নেই।

পরদিন রাত পোহাবার আগে থেকেই বিয়েবাড়ির কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। দশটার ভেতরেই বিয়ের লগ্ন হওয়ায় তৎকালীন অনুষ্ঠান সব শীগ্যির শাগ্যির শেষ করতে হয়। সকলেরই মুখে মুখে একই কথা লেগে আছে 'লগ্ন এসে গেল। তাড়াতাড়ি নাও।' জামাইদের কাশীযাত্রার একটা প্রথা আছে। জামাই-রা দশ-পা যেতে না যেতেই সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—'থাক্ থাক্ মশাইরা কি সত্যি সত্যিই কাশী চললেন নাকি!' এরপর মামার কাঁধে চড়ে বরকনের মালাবদল অনুষ্ঠানও শেষ হল। এরপরেই শুভ মঙ্গল-সূত্র ধারণের শুভ মুহূর্ত আসন্ন—নাদস্বরের (সানাইয়ের মত বাজনা) যুগলবন্দী বাজনায় কান ফাটফাট হল; তবিলে (তবলার মত) এমন গুরুগুরু ঘা পড়ল যে মেদিনী কম্পনতী; বেদমন্ত্রগাথা পাঠের শব্দে আকাশ ঝমঝমিয়ে উঠল; মহিলাদের সমবেত কণ্ঠে 'গৌরীকল্যাণ' গান শুরু হল। এই পরমলগনে সুন্দর রাঘবন সীতার গলায় মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিল— ললিতার গলায় পট্টভি।

মঙ্গলসূত্রবন্ধন অনুষ্ঠানের পর সকলের উতলা ভাবটার খানিক উপশম হল। ঘরের ভেতর দুর্ভেদ্য ভিড় আর ঘামের বন্যা— তাও

এবার একটু হালকা হল। কিছু লোক একটু হাওয়া খাবার অবকাশ পেয়ে বাইরে গেল।

সূর্যও এই ফাঁকে বাইরে এল। সকাল থেকে অন্ততঃ হাজারবার সে আসন্নপ্রসবা বেড়ালের মত ঘরবার করেছে। এতক্ষণে তার মনটা একটু হালকা হয়েছে। 'যাক। বিয়েটা হয়েই গেল তাহলে। এখন আর কোনো অদলবদলের সম্ভাবনা রইল না।'— এই চিন্তায় সে শান্তি পেল।

এই সময় গোরুর গাড়ির ঘুঙুরের ছমছম শব্দ শোনা গেল। গলির প্রান্তে নজর পড়তে সূর্য দেখল কিট্টাবায়ারের 'পেটী-গাড়ি' আসছে। খালি নয়, আরোহী আছে। 'তবে বোধহয় পিসেমশাই এল'— সূর্য দৌড়ল তাঁকে আপ্যায়ন করতে।

গাড়ি মণ্ডপের কাছবরাবর এসে দাঁড়ালে, উপবিষ্ট আরোহী নেমে এলেন। তিনি মাটিতে পা দেবার আগেই সূর্য বলে উঠল— 'পিসেমশায়, আপনি এত দেরীতে এলেন! আপনার পথ চেয়ে চেয়ে আমাদের অন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম!'

গাড়ির আরোহী তুরাইস্বামী আয়ারই, অন্য কেউ নয়। তিনি সূর্যের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

'আমি সূর্য। সীতার মামাত ভাই।' সূর্য নিজের পরিচয় দিল।

'ওহো। কিট্টাবায়ারের মেজ ছেলে তুমি?'

'হ্যাঁ পিসেমশায়। আপনি এত দেরী করলেন কেন? এই তো মিনিট পনেরো হল মঙ্গলসূত্র ধারণ শেষ হল। বড় পিসিমা আর বড় পিসেমশায় 'কন্যাদান' করেছেন!'

'কী বললে? মঙ্গলসূত্র ধারণ হয়ে গেছে? কার?'

'কেন, ললিতা, সীতা— দুজনেরই।'

'সীতারও? সীতারও বিয়ে হয়ে গেছে? পাত্র কে?'

'সুন্দর রাঘবন। কেন, আপনি তো সবই আগে থেকে জানেন পিসেমশায়। আপনি তো দিল্লী থেকে চিঠিও দিয়েছেন— আপনার সম্মতি জানিয়ে।'

'হ্যাঁ... কিন্তু, আমি যে তার করেছিলুম...' তুরাইস্বামীর কথা আটকে যায়। প্রশ্ন পুরো করতে জিভ সরে না।

'তার? কিসের তার?'— সূর্য সাহস সঞ্চয় করে বলে।

'সীতার বিয়ে বন্ধ করার জন্যে। সে তার কি পৌঁছয় নি?'

সূর্য চেষ্টা করে তার বুকের ধুকপুকুনিটা সামলে বলে—'হ্যাঁ, এই খানিক আগে একটা টেলিগ্রাম এসেছে বটে। তা বিয়ের গোলমালে আমি আর খুলে পড়ে দেখার ফুরসত পাইনি। পিসিমার হাতে যে দেব, সে সুযোগও পাইনি। দেখি, এইটাই বোধহয় আপনার সেই টেলিগ্রাম, না?' সূর্য পকেট হাতড়ে টেলিগ্রামটা বের করে তার পিসের হাতে দেয়।

'হ্যাঁ এইটাই। কিন্তু কালই তো আসার কথা! কাল কেন এল না? গ্রামে বোধহয় আসতে একটু দেরী হয়। সবই ভগবানের লীলা। আমরা আর কী করতে পারি? যাক যা হবার হয়ে গেছে। সূর্য শোন। এই তারের কথা ভুলেও আর উল্লেখ কোরো না যেন!'

'হ্যাঁ পিসেমশায়। এখন আর বলেই বা কী লাভ! যা হবার তা তো হয়েই গেছে।' সূর্য স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে।

'যা বলেছ। যা হবার তা হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছে যা তাই হয়েছে।' তুরাইস্বামী টেলিগ্রামটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।

এতক্ষণ সীতা অপাঙ্গে সুন্দর রাঘবনের রূপ দেখে পুলকমুগ্ধ হচ্ছিল। হঠাৎ দোরের দিকে চোখ পড়তে দেখল তার বাবা আসছেন। ব্যস। এতক্ষণের রুদ্ধ অভিমানের আবেগ চোখের জলের ধারা হয়ে বন্যার মত অবিরল গলে পড়তে লাগল। সীতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তাকে থামানো যায় না।

রাজম্মা একটা থামে ঠেস দিয়ে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়ের কান্না থামাতে এল না। এল মাসী অভয়া। সেই সীতাকে সম্প্রদান করেছে।—'এই পাগলী কাঁদছিস কেন? বাবা তো

এসে গেছে।— দেরী হলেও এসেছে তো। কোথায় খুশি হবি, তা না, কাঁদতে আছে, বোকা মেয়ে?'— মাসী, সীতার শাশুড়ি সবাই তাকে বোঝায়। সীতার জামায়ের অঙ্গবস্ত্রে গাঁটছড়া বেঁধে দিতে দিতে শুম্ভু বলে— 'সীতাদি, কেঁদো না অত। চোখের জলে কাজল ধুয়ে গিয়ে গালে লেপটে যাবে!'

দুরাইস্বামী এবার মেয়ের পাশে এসে বসে। তার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে, বলে— 'কাঁদিস না মা। রেলগাড়ির দরুনই দেরী হয়ে গেল। নইলে কি আমি না এসে পারি রে মা?' সান্ত্বনায় সীতার কান্নার বেগ আরো ফুলে ফেঁপে ওঠে। শেষকালে রাঘবন আলতো করে সীতার হাতটা ছুঁয়ে বলে— 'সীতা!'

ব্যস। যাদুমন্তরের মতন সীতার কান্না থেমে গেল। ছলছলে আয়ত দুটি চোখ তুলে সীতা রাঘবকে একবার দেখে। সেই এক পলকের দেখায় না-জানি কত বিস্ময়, কত রহস্য ভরা ছিল! তার অর্থভেদ করা এক রাঘবনেরই সাধ্যায়ত্ত— তার প্রেমের যাদুকাঠি দিয়ে।

এগারো

'গ্রাণ্ডট্রাংক একস্‌প্রেস' নামের বিখ্যাত বাষ্পশকট মাদ্রাজ থেকে রওনা হবার পর দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। কিন্তু এখনো রেলের লাইন শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যাত্রীরা বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হতমনস্ক সেইসব যাত্রীর গায়ে ধোঁয়া আর কয়লার গুঁড়ো উগরে দিতে দিতে তাদের টেনে নিয়ে গাড়ি আপনমনে চলেছে তো চলেইছে।

গাড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি কামরায় সীতা চলেছে। তার সঙ্গে আছে তার শাশুড়ি কামাক্ষী আম্মাল্।

কামাক্ষীর কোলকে গদী বানিয়ে বসে আছে ও কোথাকার রাজকুমারী? আর কামাক্ষী এমন কী অপরাধ করেছেন যে সেই রাজকুমারী তাঁর গালে আর মাথায় চটাপট চড় মারছে আর কামাক্ষী হাসতে হাসতে মার হজম করছেন?

চোখের ওপর শাশুড়ির এমন হেনস্তা দেখতে না পেরে, সীতা রাজকুমারীর দিকে চোখ পাকিয়ে বলে— 'দেখ বাসন্তী। ঠাকুমাকে অমন করে মারলে তুমি মার খাবে।'

পরমুহূর্তে দুই থাপ্পড় সীতার গালেই পড়ল। শাশুড়ি আর বউ দুজনেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

'গায়ির দরদা খোলো। নইলে মাব্বো!' আধ আধ স্বরে হুকুম দেয় রাজকুমারী— কামাক্ষী আম্মার প্রাণাধিকা নাতনী, সীতা আর রাঘবনের দুলালী মেয়ে বাসন্তী। তার বয়েস সবে দু'বছর।

কামাক্ষী কামরার জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নইলে বাসন্তী

বারবার বাইরে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বাসন্তীর এ ব্যবস্থা মনঃপূত নয়। সত্যিই তো! 'রেলসফরে যদি জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরেই না দেখা গেল তো কেমন ধারা রেল সফর?'— এর সদুত্তর না দিতে পারায় অগত্যা কামাক্ষীকে জানলার শার্সি তুলে দিতে হয়।

জানলা খোলা পেয়েই বাসন্তী তার রেশমী কোমল আঙুল তুলে বাইরের কোন ধাবমান বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে প্রশ্ন করতে থাকে— 'মা, ওটা কী? ঠাম্মা, ওতা কী?'

'ওটা পুরনো আমলের একটা কেল্লা।' সীতা জবাব দেয়।

'তেল্লা কী মা?' বাসন্তীর প্রতিপ্রশ্ন।

'কেল্লা হল কেল্লা। বাবা, বাবা, তোকে বোঝানো আমার কম্ম নয়। আসুক তোর সূয্যিমামা।'

'সূয্যিমামাকে ডাক মা।'

'এখন ডাকলে সূয্যিমামা শুনতে পাবে না। গাড়ি থামলে আপনিই আসবে। তুমি একটু চুপ কর দিকি।'

বাসন্তী আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়।

বাসন্তীর মত কামাক্ষীও বাইরে তাকিয়ে আছেন। উৎসুক দৃষ্টিতে। বলছেন— 'যেদিকে তাকাও খালি কেল্লা আর কেল্লা। এসব কে বানিয়েছে বল তো। সীতা, জান?'

'নানান রাজারা বানিয়েছে। জানেন মা, প্রায় হাজার বছর ধরে দিল্লীই ভারতের রাজধানী রয়ে গেছে। আগ্রা আর দিল্লীর মাঝামাঝি এরকম অসংখ্য কেল্লা দেখা যায়—ভাঙাচোরা।' সীতা জবাব দেয়।

'আমাদের দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করলে দুদিকে কেবল মন্দিরই দেখতে পাবে। পাঁচ মিনিট অন্তর গোপুর দর্শন হবে। চিদাম্বরম থেকে ত্রিচিরাপল্লী পর্যন্ত যেতে যেতে একবার আমি পাঁচশো গোপুর গুণেছিলাম। এদিকে তো দেখছি মন্দিরের নামগন্ধ নেই।'

'তা ঠিক বলা যায় না। মথুরা বৃন্দাবন তো ভগবান কৃষ্ণের লীলাভূমি। কাশীর ওদিকে গেলে শুনতে পাই অনেক মন্দির দেখতে

পাওয়া যায়। তবে মন্দির নির্মাণে দক্ষিণ আর উত্তরের মধ্যে অনেক তফাত।' সীতা বলে।

'যেতে দাও ওসব কথা। আচ্ছা সীতা, সূর্যর বিয়েটা এখনো হচ্ছে না কেন, বল তো? তুমি কিছু জান? দোষঘাট কিছু নেই তো?' কামাক্ষী কথার ধারা বদলে দেন।

'না, না, সেসব কিছু না। বিয়ের কথা তুললে সূর্য বলে আমি বিয়ে করব না। তবে, ওর এখনো বিয়ের বয়স যায়নি।'

'বিয়ে করব না বলা তো ছেলেদের স্বভাব। কিছুদিন ঐরকমই বলতে থাকবে। আবার জোর করলেই মেনে নেবে। সূর্য কদ্দূর পড়েছে?'

'বি. এ. পড়ছিল। কিন্তু পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছে।'

'ছেড়ে দিল কেন? লেখাপড়ায় ভাল নয় নাকি? চেহারা দেখলেও একটু বোকাসোকা মনে হয়।'

'ওপর থেকে দেখলে ঐরকম মনে হয় বটে। আসলে কিন্তু ও খুব বুদ্ধিমান ছেলে। সত্যি কথা বলতে, ওর চেষ্টাতেই আমার বিয়েটা হয়েছে। আপনার ছেলে যখন বললে, যে ওর ললিতাকে নয় আমাকেই পছন্দ, তখন মামা-মামীর খুব রাগ হয়েছিল। সূর্যই তাদের বুঝিয়েসুঝিয়ে শান্ত করে।'

'তোমার মামা-মামীর রাগের জন্যে কি আর বিয়ে আটকাত? আচ্ছা, সূর্য লেখাপড়া ছাড়ল কেন বল তো?'

'জানি না ইংরেজি শিক্ষার ওপর ওর দারুণ ঘেন্না। বলে বি. এ. পাস করলেই বা-বাপ কোথাও চাকরী করতে বলবে, আর মেয়ের মা-বাপের দল বিয়ের জন্যে ধন্না দেবে আর জ্বালাতন করবে।'

'বাঃ এ একটা কথা হল। মেয়ে দিতে চাওয়া কি জ্বালাতন করা? আমিও তার সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করছি সেইজন্যেই। ভাবছিলুম আমার ভাইঝির সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করলে কেমন হয়? আর লেখাপড়া শিখে চাকরী করবে না তো আর কী করবে?'

'ও বলছিল এদিকে কোথায় কংগ্রেসের অধিবেশন আছে, তাতে

যোগ দিতে যাচ্ছে। তারপর এখান থেকে ফিরে দেশে যাবার ওর ইচ্ছে নেই। দিল্লীতে বসেই পত্রপত্রিকায় সাংবাদিকতা করবে ঠিক করেছে।'

সীতার কথা শেষ হতে হতেই ট্রেন একটা লম্বা সিটি দিয়ে গতি-বেগ মন্থর করল। লোকজনের শোরগোল শোনা যেতে লাগল। সীতা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—

'মা, মা! দিল্লী স্টেশন এসে গেছে। আপনার ছেলে নিশ্চয় স্টেশনে এসেছে!'

ওদের শাশুড়ি-বৌয়ের কথা শুনতে শুনতে বাসন্তী ঘুমিয়ে পড়েছিল। সীতা তাকে জাগায়— 'বাসন্তী, ওঠ, ওঠ। দিল্লী এসে গেছে। তোর বাবা এসেছে স্টেশনে। দেখবি, ওঠ ওঠ।'

বিভিন্ন রকম কান-ফাটানো যান্ত্রিক শব্দ আর চীৎকার-চেঁচামেচির মাঝখানে 'গ্রাণ্ডট্রাংক এক্স্প্রেস' দিল্লী স্টেশনে প্রবেশ করল।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়ানো শয়ে শয়ে লোক। তাদের সকলের মুখের ওপর দিয়ে সীতার দৃষ্টি দৌড়ে চলে। কিন্তু কারুরই মুখের ওপর একমুহূর্ত দাঁড়ায় না। সমস্ত মুখের মেলায় ওর চোখ একটি সুন্দর মুখকেই খুঁজে বেড়ায়।

যে মুখের প্রতিচ্ছবি ওর অন্তরের মণিকোঠায় চিরমুদ্রিত!— সেই মুখটি নজরে পড়তেই সীতা খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল— 'বাসন্তী, ঐ যে তোর বাবা এসে গেছে।' সীতার সোল্লাস কলরোল প্ল্যাটফরমের সমস্ত কোলাহলকে ডুবিয়ে দেয়।

'বাবা কোথায় মা?'—বাসন্তী জিজ্ঞেস করে।

ক্ষিপ্র নিপুণতায় ভিড়ের ধাক্কা বাঁচিয়ে রাঘবন সীতাদের কামরার দিকে এগোচ্ছে। সীতা তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। ঠিক এমন সময় কী কারণে যেন রাঘবন মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

সীতাদের গাড়ি যে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েছে তার সামনাসামনি প্ল্যাটফরমে অন্য একখানি গাড়ি যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। সেই গাড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করতেই রাঘবনের নজর পড়ল জানলার ধারে

বসা দুটি যুবতীর ওপর। সীতার দিকে আর না এগিয়ে রাঘবন দ্রুত পায়ে সেই কামরার দিকে এগোল। যুবতীদের একজনকে রাঘবন কী যেন বলল, জবাবে মেয়েটিও কিছু বলল। রাঘব আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে ট্রেন চলতে শুরু করল। গার্ডের অন্তিম কামরাটিও দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রাঘব ঠায় দাঁড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফিরে আবার সীতার কামরার দিকে পা বাড়াল।

কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সীতা সমস্ত দৃশ্যটা অপলক নেত্রে দেখল। ওকে আর মেয়েকে দেখেও রাঘব সোজা ওদের কাছে না এসে অন্যগাড়ির দিকে গেল কী বলে! মেয়ে দুটি কে! সীতার কেমন হতাশ হতাশ অবসাদ আসে। বারবার ওর মনে ঐ একটাই প্রশ্ন মোচড় দিতে থাকে— কারা ওরা! সীতাকে ফেলে রাঘব যাদের কাছে দৌড়ে যায়!

তবে এই হতাশার মেঘ ক্ষণস্থায়ী। রাঘব কাছে আসতেই ওর মন আবার উদ্দীপনায় ভরে ওঠে। 'বাসন্তী, যা বাবার কাছে যা।' বলে মেয়েকে জানলা গলিয়েই স্বামীর দিকে বাড়িয়ে ধরে। মেয়েও ঝাঁপিয়ে বাপের কোলে গিয়ে ওঠে। রাঘবন পরম মমতায় মেয়েকে বুকে তুলে নেয়। তবুও কোথায় যেন তার মনটা বেসুরো— বাচ্চাকে পেয়েও বাচ্চাকে নিয়েই ভরপুর নয়!

শাশুড়ি বলেন, 'সীতা! তুমি আগে নামো। আমি মালপত্র নামানোর পর নামব।'

সীতা গাড়ি থেকে নেমে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। রাঘবন তখন কুলিদের হুকুম দিতেই ব্যস্ত। সীতা আশা করছিল স্বামীই আগে কথা বলবে। কিন্তু কথা বলার অবকাশই নেই রাঘবনের।

এইসময় অন্য এক কামরা থেকে নেবে সূর্য ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। রাঘবন একবার মাত্র তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, কোন কথা বলে না। এতে সীতার মনে কেমন যেন আঘাত লাগে। সে অসহায় চোখে সূর্যর দিকে তাকায়। সূর্য মৃদুমৃদু হাসছে।

শেষপর্যন্ত মনকে শক্ত করে সীতা বলে—'কী, তুমি সূর্যকে চিনতে পারলে না ?'

'কোন্ সূর্য ?'—রাঘবনের নিরুৎসুক প্রশ্ন।

'কোন্ সূর্য কি আবার ? ললিতার ভাই সূর্য…!'

'সারা রাস্তা সূর্যই আমাদের আগলে এনেছে। ও সঙ্গে না এলে আমাদের খুব কষ্ট হত!' কামরা থেকে নামতে নামতে কামাক্ষী আম্মাল বলেন।

ততক্ষণে কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র তোলা হয়ে গেছে। কামাক্ষী ছেলের কোল থেকে নাতনীকে হাত বাড়িয়ে নিলেন। রাঘবন রাস্তা দেখিয়ে আগে আগে চলল আর সবাই তার পেছনে

মালপত্র গাড়িতে তোলা হল। মা-বউ আর বাচ্চাকে পেছনের সীটে বসিয়ে দিয়ে রাঘবন নিজে এসে চালকের সীটে বসল। তার পাশের জায়গাটা খালি। সূর্য বিদায় নেবার জন্যে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। সীতা মনে মনে ভাবে—সূর্যকে গাড়িতে তুলে নিলে কী এমন ক্ষতি হত ? ভেবেছিল রাঘবন নিজে থেকেই বলবে। কিন্তু বলল না।

সীতা নৈরাশ্যমাখা চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে। সীতার দ্বিধা-সংকোচ বুঝেও সে না বোঝার ভাণ করে।

গাড়ি চলতে থাকে। সীতা কামাক্ষীকে বলে—'মা, সূর্য আপনাকে প্রণাম করছে।

'আচ্ছা বাবা সূর্য। দেশে ফেরার আগে একদিন আমাদের বাড়ি এসো নিশ্চয়।' কামাক্ষী বলেন। শাশুড়ির মুখ থেকে এইটুকু শুনেও সীতা স্বস্তি পায়।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।—এই যে জামাইবাবু। বলি, ঠিকানাটা অন্ততঃ বলে যান।'—সূর্য আত্মসম্মান বা লৌকিকতার ধার ধারে না।

রাঘবনের চরিত্রের পরিচয় সূর্য আগেই পেয়েছে। তার জন্যে সীতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার তার আদৌ ইচ্ছে নেই। ভগ্নিপতি ওকে যেতে বলুক আর না বলুক ও নিজে থেকেই ওদের বাড়ি যাবে—এটা সে আগেই স্থির করেছিল।

'আট নম্বর নাদিরশাহ রোড।' চলন্ত গাড়ি থেকে জবাব ছুঁড়ে দেয় রাঘবন।

মোটর হাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছোটে। সীতার উৎসাহও গতি পায়। 'দেখছিস বাসন্তী, তোর বাবুজী কেমন কার চালাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আমিও কাল চালাব।' বাসন্তী পরমানন্দে জবাব দেয়।

দ্রুতগতি গাড়ি হঠাৎ থেমে যেতে শাশুড়ি আর বউ দুজনেই চমকে ওঠে, বলে—'কী হল?'

'কিছু না। বাড়ি পঁউছে গেছি।' রাঘবন জবাব দেয়।

সীতা তার বাড়ি দেখে। সাজানো গোছানো ছোট সুন্দর বাংলো। বাড়ির সামনে আর দুপাশে ফুলের চারা, ছোটছোট ঝোপ। সীতার মন আনন্দে ডগমগ করে ওঠে। মেয়ের মুখে চুমু খেয়ে বলে—'বাসন্তী এই দেখ তোর বাড়ি। কী সুন্দর, না?'

'বালিটা বাবা বানিয়েছে, না মা? আমাল জন্যে বানিয়েছে, মা?' বাসন্তীর অসীম ঔৎসুক্য।

বারো

বিয়ের পরে পরেই সুন্দর রাঘবন সীতাকে তার কর্মস্থল দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিল। বিলিতি ফ্যাশনের এক হোটেলে তারা মাসখানেক বাস করেছিল। সেই একমাস যেন ওদের স্বর্গবিহার। নতুন দিল্লীর সুন্দর সুন্দর সড়কে বাজারে, পুরনো দিল্লীর জরাজীর্ণ কেল্লায় মহলে মসজিদে দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়িয়েছে। ঠিক এমনি করেই আরেকটি মেয়ের হাত ধরে কয়েক বছর আগে রাঘব এইসব জায়গাতেই ঘুরেছে। যখন-তখন সেইসব স্মৃতি তার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। পরক্ষণেই এক ঝটকায় সে অতীতের স্মৃতিকে দূর করে দিত। আর নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর হাতটা আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরত।

এইসময় রাঘবনের ইংল্যাণ্ড যাবার সুযোগ এসে গেল। তখন সে সীতাকে মাদ্রাজে তার মা-বাবার কাছে রেখে এল। বিলেত যাবার আগে নিজেও ক'দিন মাদ্রাজে থেকে গেল।

প্রবাস-যাত্রার আগে দয়িতাকে নিবিড় সঙ্গ এবং সান্ত্বনা দিয়ে গেল। তাকে বোঝাল যে বিলেত যাবার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে তার চাকরী জীবনে উন্নতির অনেক রাস্তা খুলে যাবে। এমন সুযোগ জীবনে হয়তো আর আসবে না। এই সুযোগ হারানো খুবই আহাম্মকীর কাজ হবে। বলে, তুমি আমার পছন্দ করা বউ। আমি তোমাকে অন্তর থেকে পত্নী বলে নির্বাচন করেছি। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমারও কিছু কম কষ্ট হচ্ছে না। স্বামীর উন্নতির পথে অন্তরায় হওয়া স্ত্রীর কর্তব্য নয়। শেষকালে এও প্রতিশ্রুতি দেয়, যে পরের বার ইংল্যাণ্ড যাবার সময়ে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

সীতা একদিকে যেমন প্রাণপ্রিয় স্বামীর আসন্ন বিরহে দুঃখে কাতর হচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে স্বামীর বিলেত যাওয়া নিয়ে তার গর্বও হচ্ছিল।

বিলেত থেকে ফিরে আসতে রাঘবনের পনেরো মাস লেগে গেল। ইতিমধ্যে সীতার জীবনে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল। আদরের মেয়েকে সুযোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দিতে পারার আনন্দে সীতার মা রাজম্মা সেই যে চোখ বুজল আর খোলার নামও করল না। রাজম্মা সৌভাগ্যবতী। স্বামীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরম সৌভাগ্য তার হল। অখণ্ড কাবেরীতটে দেহত্যাগ আর দাহক্রিয়ার অনন্ত পুণ্যও সে অর্জন করে চলে গেল।

মায়ের শোকে সীতা বহুদিন যাবৎ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। তার শাশুড়ি অনেক বোঝাতেন কিন্তু কাজ হত না। পণ্ডিত শ্বশুর ভাগবদ্‌গীতা থেকে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করে করে ব্যাখ্যা করে শোনাতেন, তবুও মা-মরা মেয়েটা কেন জানি সান্ত্বনা পেত না। মাকে কাছে পেলে খানিকটা শান্তি পেতে পারত, সোহাগের সেই স্বামীও তখন দূর প্রবাসে। সীতার শোক দ্বিগুণ হয়ে উঠত—বিরহে।

এই সময় ভগবান এক লীলা দেখালেন। সীতার জীবনে এক নতুন সুখের উদয় হল। তার সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দিল।

সেই সুখপ্রদ ঘটনাটি সীতার জীবনে বেশ সংকট উপস্থিত করেছিল। ভগবানের কৃপায় সে বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সীতা যখন বেঁচে উঠল, তখন তার কোলজোড়া আলো, বুকভরা খুশি। সেই খুশির জোয়ারে মায়ের বিচ্ছেদ ব্যথা তলিয়ে গেল। মায়ের জন্যে শোক করার আর অবসরই রইল না। তার ওপর শাশুড়ি কামাক্ষী আর পাড়ার অন্য বৃদ্ধারা সীতার মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দিল যে, তার মা-ই মেয়ে হয়ে তার কোলে এসেছে। সেই বিশ্বাসে আর সন্তানের মুখদর্শনের উচ্ছ্বসিত আনন্দে সীতা আস্তে আস্তে তার মার মুখ ভুলতে লাগল। বিলেত থেকে ফিরে ফুলের মত মেয়ের

মুখ দেখে স্বামী যে কী রকম উৎফুল্ল হয়ে উঠবে সেই সুখচিন্তাতেই সীতা বিভোর হয়ে রইল।

শাশুড়ি-বৌয়ের এমন আদর্শ সম্প্রীতি দেখেও পাড়ার লোক অবাক হয়ে থাকে। সীতা তো একদিন শাশুড়ির মুখের ওপর বলেই বসল—'মা আমি শুনেছিলাম আপনার সঙ্গে ঘর করা মুশকিল। তাই নাকি বড় জা বাপের বাড়ি চলে গেছে : আমার তো মনে হয় আপনার সঙ্গে যে ঘর করতে পারে না, সে পোড়াকপালী।'

শুধু এই নয়। পাড়াপড়শির কাছেও সীতা তার শাশুড়ির আদর-সোহাগের কথা গল্প করে। কামাক্ষী দেবীর বহুদিনের দুর্নাম ঘুচে যায়। তিনি আজকাল মাথা উঁচু করে গোটা পদ্মপুরমের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান।

সুন্দর রাঘবন বিলেত থেকে ঘুরে আসে। বাড়ির মালঞ্চে বাসন্তী নামের একটি নতুন কলিকে দেখে তার প্রবাস সন্তপ্ত দেহ-মন জুড়িয়ে যায়। সে দিল্লী যাবার সময়ে বলে যায় নতুন দিল্লীতে বাংলো পাবার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি লিখে তাদের নিয়ে যাবে। ভাল বাড়ি পেতে পেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল।

এবার নতুন দিল্লীতে আসার পর সীতার সাতদিন কেটেছে। এই সাতদিন ঘরবাড়ি সাজাতে গোছাতেই গেছে। রোজ সন্ধে হতেই সীতার মনে হত, আগের মত— মানে বিয়ের পর সেই যে প্রথমবার এসেছিল, তখনকার মত— আবার রাঘবনের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যায়। কিন্তু কাজের চাপে মনের সাধ মনেই রয়ে যেত !

একদিন রাঘবনকে বলল—'আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এস-না ! কোথাও বেড়াতে বেরোব।'

'আচ্ছা। তোমরা তৈরী হয়ে থেকো। আমি এসেই বেরিয়ে পড়ব' বলে রাঘবন চলে গেল।

বিকেলে বেরোবার সময় কামাক্ষী বললেন—'আজ আমার বেরোতে ইচ্ছে করছে না। আমি বরং বাচ্চাটাকে নিয়ে বাড়িতে থাকি। তোমরা দুজনে ঘুরে এস।'

সীতা মনে মনে তাই চাইছিল। মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। শাশুড়ি তার মন বুঝেই বোধহয় রাস্তা সাফ করে দিলেন। সীতা খুশি মনে রাঘবনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

ওরা দুজনে প্রথমে কনট্ সার্কাসে গেল। সেখানে এক চক্কর ঘুরে ইণ্ডিয়া গেটের দিকে গেল। ইণ্ডিয়া গেটের কাছের ফোয়ারার সবুজ কচি ঘাসের মখমলে দুজনে পা ছড়িয়ে বসল। সূর্য ডুবছে। চারদিকে আঁধারের ঘোর। আকাশের তারার সঙ্গে রেষারেষি ক'রে শহরের বিজলী বাতির রোশনাই সারে সারে জ্বলে উঠছে।

সীতা বললে—'নন্দন কানন কি এর চেয়েও সুন্দর?'

'কী করে বলব বল। আমি তো নন্দন কাননে যাইনি। তুলনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'—রাঘবন জবাব দিল।

সীতা হাসে। বলে—'তবে বল, লণ্ডন বা প্যারিস কি নতুন দিল্লীর চেয়ে সুন্দর?'

রাঘবন বলে—'লণ্ডন একদিক দিয়ে সুন্দর, দিল্লী আর-এক দিক দিয়ে।'

খানিকপরে সীতা বলে—'সেদিন রেলওয়ে স্টেশনে যার সঙ্গে কথা বলছিলে, সে মেয়েটি কে গো?'

'যেই হোক, তোমার তাতে কী?'—রাঘবনের কণ্ঠে তিক্ততা।

'জিজ্ঞেস করছি কে— বলতে কী হয়েছে?'

'বলব না, ব্যস।'

'কেন বলবে না?'

'আমার খুশি। এ শহরে অনেকের সঙ্গেই আমার জানাশোনা। কতলোকের পরিচয় তোমায় দিয়ে বেড়াব?'

শুনে সীতার রাগ হল খুব। কিন্তু চেপে গেল।

কিছুক্ষণ দুজনেই গুম হয়ে রইল। খানিক পরে সীতা মৌন ভঙ্গ করল —'কী হল, বলবে না মেয়েটা কে?' রাঘবন তখনো চুপ।

'তোমার সঙ্গে কলেজে পড়ত বুঝি?'

'আমাদের ওদিককার মেয়ে, না এদিককার ?'

'...'

'তা আমার সঙ্গে কথা বলবে কেন ? আর কেউ হলে ঠিক বলতে। এইজন্যেই বেড়াতে এনেছিলে।'

'এইজন্যেই আনতে ইচ্ছে করে না। মেয়েমানুষের স্বভাব এবার বেরিয়ে পড়েছে। হিংসুটে কুচুকুরে স্বভাব।'—বলে রাঘব ঘাস ছেড়ে উঠে পড়ে।

'আমি হিংসুটে কুচুকুরে নই।'—সীতা নিজের মনে গুনগুন করে।

সীতার নিরীহ নিষ্পাপ যৌবনের অন্তর্লোকে দুঃখের বীজ বোনা হয়ে গেল। হয়তো এ বীজ একদিন অঙ্কুরিত হবে, বড় হয়ে মহীরুহ হবে। তারপর তাতে কেমন ফল ধরবে কে বলতে পারে !

সেদিন রাত্রে সীতার বহুক্ষণ ঘুম এল না। এবার নতুন দিল্লীতে নতুন সংসার পাতার পর এই প্রথমদিন তার স্বামী তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। তার উচিত ছিল ভ্রমণের আনন্দ চুটিয়ে উপভোগ করা। তা নয় নিজের আহাম্মকিতে সব মজা নষ্ট করে দিল। রাঘবনকে রাগিয়ে দিল। সীতার অনুশোচনা হচ্ছিল। তবু একটা প্রশ্ন বারবার ওর মনে ছুঁচের মতন ফুটছিল—'মেয়েটা কে বলতে চাইল না কেন আমার স্বামী ?' আবার নিজেকে তাড়না করছিল—'ট্রেনের কামরায় মেয়েটাকে দেখে ও যেরকম চমকে উঠল, তাতেই তো বোঝা উচিত যে সে যেই হোক, তার সঙ্গে কোন নিবিড় সম্বন্ধ নেই। তবে মিছিমিছি আমি মনকে কষ্ট দিচ্ছি কেন ? সত্যি মেয়েমানুষের বুদ্ধি বড় মোটা।'

সীতা নিজের মনকে নানারকমে বোঝায়—'ভেবে দেখ, ও ললিতাকেই দেখতে এসেছিল। পরে আমার ওপর মন পড়ে যায় তাই আমায় বিয়ে করবে বলে জেদ ধরে। নিজের ইচ্ছেয় যে-পুরুষ আমায় আপন করে নিয়েছে, তার চরিত্রে সন্দেহ করা খুবই অন্যায় কথা। আমার মনে কোন ভ্রমকে স্থান দেওয়া উচিত নয়, কখনোই না, কিছুতেই না।'

পরদিন সকালে আর সীতার মনে দুঃখের লেশ থাকে না। রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত তার সমস্ত দুঃখের চিন্তা উবে যায়। রাঘবকে কফি দিতে গেলে সে এমন মিষ্টি করে সীতার দিকে চেয়ে হাসল যে সীতা কৃতার্থ হয়ে গেল। রাঘবন অফিস যাবার সময় সীতা বাসন্তীকে কোলে নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাঘবন মেয়েকে কোলে করে, কাঁধে তুলে খানিক আদর করলে, গাল টিপে দিলে। বললে, 'বাসন্তী, আমার সঙ্গে আপিস যাবি, চল?' বাসন্তী তখনই রাজি।

'হ্যাঁ বাবুজি এক্ষুণি দাব।'

'হুঁ, তোমায় নিয়ে গেলে আমার কাজ ডকে উঠবে।'—বাসন্তীকে তার মার কোলে দিয়ে রাঘবন আপিস রওনা হয়।

এর পর এক সপ্তাহ পার হয়ে যায়। সীতা ভেবেছিল রাঘবনই আবার বেড়াতে যাবার কথা তুলবে। কিন্তু সে যখন কিছুতেই কথা তুলল না, তখন হার মেনে নিজেই আবার একদিন সাধল। —'অনেকদিন হয়ে গেল বেড়াতে যাওয়া হয়নি। আজ কি আমরা কোথাও যাব?'

'নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু সেদিনের মতন কোন নির্বোধ প্রশ্ন করা চলবে না। রাজি থাকলে যাব।' রাঘবনের স্পষ্ট জবাব।

'না প্রশ্ন করব না। আর যদি কখনো ভুল করে কোন প্রশ্ন করেই ফেলি, রাগ না করে সোজাসুজি উত্তব দিলেই তো হয়।'

'ঐ। এখনই শুরু হয়ে গেল নাকি। থাক। আমি যাব না।' —রাঘবন বিগড়ে যায়।

সীতা সংকুচিত হয়ে পড়ে। বলে, 'না না আমি এমনিই বলছি। বিরক্ত হয়ে তো বলছি না। চল, আজই যাব।'

কথা বলতে বলতে দুজনে বেরিয়ে পড়ে। কিছুদূর যাবার পর একটা গোল চত্বর ওদের সামনে পড়ে। তার ওপর কচি কচি সবুজ ঘাসের জাজিম বিছোনো। মাঝে মাঝে ফুলগাছ, ঝোপ। ওরা দুজনে সিমেন্টের বাঁধানো একটা বেঞ্চিতে বসে।

কথায় কথায় সীতা বলে—'আমরা তাজমহল দেখতে কবে যাব? প্রথমবার যখন এখানে আমি এসেছিলাম সেবারেই তাজমহলে যাবার কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় তোমার বিলেত যাবার কথা হল। মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? কিন্তু তাজমহলে যেতে হলে তো পূর্ণিমার দিনেই যাওয়া উচিত। তবেই তাজমহলের রূপ ষোলো আনা উপভোগ করা যায়।'—রাঘবন বলে।

'হ্যাঁ সে কথা আরো একবার বলেছিলে মনে আছে— চাঁদনী রাতে তাজমহল ইন্দ্রপুরীর মত দেখায়।'

'হ্যাঁ দিনের আলোয় দেখলে শ্বেত মর্মরের প্রাসাদ। চাঁদের আলোয় দেখলে মনে হবে জ্যোৎস্না দিয়েই গড়া।'

'তবে কি আগামী পূর্ণিমার দিনই যাওয়া হবে?'

'দেখা যাবে।'

'মাকে আর বাসন্তীকেও নিয়ে যাওয়া হবে তো?'

রাঘবনের কাছ থেকে আর কোন জবাব এল না। মনে হল সে আর কোন ভাবনায় ডুবে গেছে।

ঘাসের গালচে ছেড়ে দুজনে উঠে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বাড়ির কাছাকাছি চলে আসে। এখান থেকেই ওদের বাড়ির রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সীতা চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার সামনেই একটা বড় গাছের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়েমানুষ— তার হাতে ছুরি।

সীতার মনে হল যেন এর আগেও একে কোথাও দেখেছে। ওর মুখ থেকে ক্ষীণ ভয়ার্ত স্বর বেরোয়। পেছন থেকে রাঘবন দৌড়ে এসে বলে, 'কী হল?'

'ঐ দেখ।'—সীতা হাতের ইশারায় দেখায়। রাঘবনের চোখে পড়ে এক নারীমূর্তি ক্ষিপ্র পায়ে স্থান ত্যাগ করছে। একটু পরেই মূর্তিটি অন্ধকারে কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

রাঘবনের ওপর এ ঘটনার কোন প্রভাব পড়ল না। সে সীতাকে

বোঝাল— 'নতুন দিল্লীর রাস্তায় এমন এমন কত লোক আনাগোনা করে, ওতে ভয় পাবার কী আছে বোকা কোথাকার !'

ওরা বাড়ির দরজায় এসে শুনতে পায় ভেতর থেকে মেয়ের কচি গলার খিলখিল হাসি ভেসে আসছে। ভেতরে এসে দেখল সূর্য এসেছে, বাসন্তীর সঙ্গে হাসি খেলায় মেতে রয়েছে।

'আরে, সূর্য? তুমি কখন এলে?'—সীতা উৎসুক কণ্ঠে বলে।

'এই তো বোন— আধঘণ্টাটাক হল।—এই যে জামাইবাবু। বাসন্তীর তো আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। বলছিল যে তার ঠাকুমাকে একলা ফেলে আপনারা দুজনে কোথায় চলে গেছেন। বাসন্তী আর কী করবে? বেচারী ঠাকুমাকে দেখাশুনা করার জন্যে বাড়িতে বসে আছে। নইলে এতক্ষণ ও কখন বেড়াতে চলে যেত। বলুন কী বলবার আছে?'—সূর্য বলে।

শুনে রাঘব খানিক হা-হা করে হাসে। তারপর বাসন্তীকে জড়িয়ে ধরে কপট রাগে চীৎকার করে বলে—'দুষ্টু মেয়ে। এইসব কথা বলা হয়েছে?'

'হঁ্যা বলেছি তো। তুমি আমাতে ধলে ফেলে গেছ কেন?'—বাসন্তী তার পূর্ণ অধিকার জারি রাখে।

সীতা বলে—'সূর্য, কংগ্রেস অধিবেশন কেমন হল?'

'খুব ভাল।'—সূর্য সংক্ষেপে জবাব দেয়।

রাঘবন বলে—'খুব ভাল তো হবেই। তোমার মামাত ভাই গেছে যে।'

কামাক্ষী দেবী বল্লেন—'সূর্য কংগ্রেস অধিবেশনের কথা বলছিল, খুব সুন্দর লাগছিল। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আগে তোমরা খেয়ে নাও। পরে বসে গল্পসল্প হবে'খন।'

সকলের খাওয়াদাওয়ার পর সূর্য বসে বসে হরিপুরা কংগ্রেসের সুসম্পন্ন অধিবেশন, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর সার্থক সভাপতিত্ব ইত্যাদির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল। খুবই আশ্চর্যের কথা যে, রাঘবনও সাগ্রহে সব শুনল, যেটা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

সব শেষে সূর্য বলে—'সবই সুন্দর হয়েছে। তবে আমরা খুব সন্তুষ্ট নই।'

রাঘবন প্রশ্ন করে— 'আমরা' মানে? 'আমরা'টা কে?'

সূর্য বলল—'আমি সোশালিস্ট পার্টির কথা বলছি। আমি ঐ দলে।'

'সোশালিস্ট পার্টির কী বক্তব্য?'—সীতার জিজ্ঞাসা।

এ প্রশ্নের জবাব রাঘবন আগ বাড়িয়ে দিল— 'বক্তব্য কী জান? সোশালিস্ট পার্টির চরম সিদ্ধান্ত হল— আমীর-গরীব, জ্ঞানী-নির্বোধ, ভাল-মন্দ, মেয়ে-মরদ সবাইকে একমাপে কেটেছেঁটে সমুদ্দুরে হাবুডুবু খাওয়ানো!'

সূর্য হাসে, বলে—'সীতা ভয় পেও না। জামাইবাবু ঠাট্টা করছেন।'

'যাকগে বাদ দাও ভাই। কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর কী রকম প্রভাব দেখলে বল দিকি!'—রাঘবন প্রশ্ন করে।

'মহাত্মার মাহাত্ম্য নির্ভুল। তাঁর প্রভাবেই অখ্যাত গ্রামে এই কংগ্রেস অধিবেশন এমন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল।'

'দেখ ভাই, গান্ধীজীর মর্জীর ওপর ছেড়ে দিলে গোটা ভারতবর্ষে ভিখিরি আর ফকির ছাড়া কেউ থাকবে না। সকলেরই হাতে খোলা...অবস্থা হবে। কিন্তু ভিক্ষে দেবার মত লোক কেউ থাকবে না সারা দেশে। এই লিখে রাখ, এদেশে যতদিন গান্ধীর প্রভাব থাকবে, ততদিন এদেশের মঙ্গল নেই।' রাঘবন রুষ্টস্বরে বলে।

'এ ঠিক কথা নয় রাঘব! গান্ধীজীর সম্পর্কে এমন উলটোপালটা কথা মুখে আনা উচিত নয়। দুনিয়ার লোকে গান্ধীজীকে মহাত্মা অবতার পুরুষ বলে মানে।'—কামাক্ষী ছেলের কথার প্রতিবাদ করেন।

'দুনিয়া অন্ধ, মা। দুনিয়া যা খুশি বলুক গে।'

'আমি হাত জোড় করে বলছি, দয়া করে মহাত্মা গান্ধীর নামে কিছু বলবেন না। আমার সহ্য হয় না। আমার মা আমাকে

বলেছেন গান্ধীজী দেবতা। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা আমার সহ্য হয় না।'—সীতা আবেগে উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে পড়ে।

'আচ্ছা বাবা চুপ করেছি— কাল ভাবছি তোমাদের দিল্লী ঘোরাতে নিয়ে যাব।'—রাঘব কথাবার্তার হাওয়া বদলায়।

'সূর্য, তুমি দিল্লী দেখে নিয়েছ নাকি?'—সীতা জিজ্ঞাসা করে।

'এখনো দেখিনি। কালকের প্রোগ্রাম তো তাই করেছি।'

'তবে তো ঠিক আছে। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। তোমাকে আমাদের সঙ্গে পাওয়া গেল। চল একসঙ্গে ঘোরা যাক। গল্পগুজবও জমবে।'—রাঘবন বলে।

রাঘবনের মুখে এই কথা শুনে সীতার মনে খুব আনন্দ হল। হবে না কেন? সূর্যর প্রতি রাঘবনের আচরণে এযাবৎ কেবল রুক্ষতা আর অসূয়াই দেখা গেছে। আজকের আচরণ একেবারে আলাদা। দুজনে দুজনের সঙ্গে আন্তরিক হাসিঠাট্টা এবং অকৃত্রিম সম্প্রীতি বিনিময় করেছে। সবচেয়ে বড় কথা রাঘবন দিল্লী দেখতে যেতে সূর্যকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সীতার খুশি হবার কথা বৈকি!

রাত্তিরে শুতে যাবার সময়ে সীতার মনে পড়ে গেল ছুরিহাতে সেই স্ত্রীলোকটির কথা। একবার ভাবল রাঘবনকে তার কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পাছে আবার সেকথা থেকে কোনো অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখা দিয়ে আজকের সন্ধের আনন্দের মেজাজটা নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে সীতা কথাটা না তোলাই শ্রেয় মনে করল। কিন্তু থেকে থেকেই ছুরি হাতে সেই মহিলার ছবি ওর মনে ভেসে উঠতে লাগল।

তেরো

'আমি এতদিন ভাবতুম ফিরিঙ্গিরা খুব চালাক চতুর। কিন্তু আজ আমার ধারণা বদলে গেছে! বেটারা বোকা তো বড় কম নয়। তা নইলে কখনো দিল্লীতে রাজধানী করে? এখানে কেবল ভাঙাচুরো বাড়ি, শ্মশান, গোরস্তান আর কটা মসজিদ ছাড়া আর কী আছে?'—দিল্লী দেখে এসে কামাক্ষীদেবী তাঁর মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেন।

সীতা বলে, 'এ আপনার কী রকম ধারণা হল মা? লালকেল্লায় শাহজাহানের প্রাসাদ দেখেও মন ভরল না? ভেবে দেখুন, দিল্লীর প্রাসাদই যখন এত সুন্দর, আগ্রার প্রাসাদ তাহলে না জানি আরো কত সুন্দর হবে!··· হ্যাঁ গো, আমরা আগ্রা তবে কবে যাচ্ছি?' —শেষ কথাটা রাঘবনের উদ্দেশে।

'নাঃ আগ্রা না দেখে তোমার ঘুম হবে না দেখছি। ঠিক আছে। আসছে পূর্ণিমার দিন যাব।—কী সূর্য, যাবে তো আমাদের সঙ্গে?' রাঘবন বলে।

'নিশ্চয়, কেন যাব না?'—সূর্য চট করে জবাব দেয়।

সেদিন সূর্য সঙ্গে থাকায় রাঘবনের খুব সুবিধে হয়েছিল। সীতার সব প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্ব ওর একালার কাঁধে পড়েনি। মেয়েদের নিয়ে বেড়ানো এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা সকলের থাকেনা। যে সহিষ্ণুতা আর ধৈর্যের প্রয়োজন হয়, সেটা রাঘবের চরিত্রে বিন্দুমাত্র ছিল না। আর সূর্যর চরিত্রে পুরোমাত্রায় ছিল। রাঘবন তাই আগ্রা সফরেও সূর্যর সাহচর্য কাম্য মনে করছিল। তাতে তার কাজটা লাঘব হবে।

সেদিন সীতা ললিতার চিঠি পেল। ললিতা লিখেছে:

আমার আদরের সীতা,

দিল্লী থেকে লেখা তোমার চিঠি পেয়ে যে কী খুশি হয়েছি তা বলে বোঝাবার নয়। ভগবানের চরণে কামনা করি সারাজীবন তোমার সঙ্গে আমার এই ভালবাসার বন্ধন যেন অটুট থাকে।

চারদিন হল আমার 'বলয়-কাপ্পু'[১] হয়ে গেছে। এইজন্যেই আমার বাপের বাড়িতে আসা।

মাকে আজকাল বেশ খুশি খুশি দেখায়। এতদিন থেকে থেকে আমার প্রতি অনুযোগ জানাত। মাঝে মাঝে কড়া দু'কথা শুনিয়েও দিত— যেমন, 'তুই একটা হদ্দ বোকা। তোর বয়েসী মেয়েদের দেখগে যা, কোলে কাঁখে ছেলে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তুই শুধু কোল শূন্যি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।' আমি যতই বোঝাই ছেলে হওয়াটা ভগবানের হাতে, মা।' তা আমার কথায় কর্ণপাতই করে না। হালে, আমার কোলে ছেলে আসার খবরে মা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বেড়াচ্ছে।

এবার রাজম পেট্টাই এসে থেকে বার বার তোমার কথা মনে পড়ছে। রোজ যখনই লাঠি ঝমঝমিয়ে 'রাণার' ছুটে যায়, আমার কেবলই সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, যখন বোম্বাই থেকে তোমার চিঠি পাবার আশায় বসে থাকতুম। ডাকঘরে ছুটোছুটি করতুম। দীঘির ধারে গেলেই মনে পড়ে আমাদের সেই সিঁড়ির ঘাটে বসে গল্প করা, কল্পনার রঙীন পক্ষীরাজ ওড়ানো— সব যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে। তোমার বলা সব গল্পগুলো এক এক করে মনে পড়ে যায়— লায়লা-মজনু, আনারকলি, রোমিও-জুলিয়েট, শকুন্তলা, পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা— সবাই এসে মনের দোরে ভিড় করে। আচ্ছা সীতা, এসব প্রেমের কাহিনী কি সত্যি সত্যি বাস্তবজীবনে ঘটে ? নাকি কেবল নাটকে-উপন্যাসেই— হয় বল্ তো ? শুনতে পাই এই সেদিনও যিনি ভারতের সম্রাট ছিলেন সেই অষ্টম এডোয়ার্ড

[১] 'বলয়-কাপ্পু' বা চুড়ি পরানোর প্রথাটা আমাদের 'সাধ' দেওয়ার মত। ছমাসের অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে বাপের বাড়িতে এনে এই অনুষ্ঠান করা হয়।

নাকি কোন্ মেয়ের প্রেমে পড়ে রাজসিংহাসন ত্যাগ করেছেন ? সত্যি নাকি রে সীতা ? আমার তো ভাই বিশ্বাস হয় না।

তোর চিঠিতে জানলুম সূর্য তোদের সঙ্গেই দিল্লী গেছে। পথে তোদের অনেক সাহায্য করেছে। জেনে খুশি হলুম। সূর্য লেখাপড়া ছেড়ে দিল কেন, জানতে চেয়েছিস। ওর কথাবার্তা শুনলে যেন মনে হয় তুনিয়ার ওপর ঘেন্না জন্মে গেছে— আড় আড় ছাড় ছাড় ভাব। আমিও এসবের কারণ আগে জানতুম না। এবার রাজমপেট্টাইয়ে এসে সব কথা জানতে পেরেছি।

আমার বড় ভাই গঙ্গাধরণের সঙ্গে তোর তেমন পরিচয় নেই। বড় রুক্ষ স্বভাব। গত বছর সূর্য যখন বাড়িতে ছিল, তখন জমি-জমা নিয়ে কী একটা ব্যাপারে সে চাষীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছিল। তাতে গঙ্গাধরণ রেগে গিয়ে তার গায়ে হাত তোলে। অগ্রহারমের সবাই গঙ্গাধরণের দিকেই টেনে কথা বলে। তাতে সূর্যর মনে খুব অভিমান হয়। 'তোমাদের জমিজায়গা নিয়ে তোমরাই সুখে থাক। আমার এর ভাগ চাই না' এই বলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বাড়ি থেকে পয়সা নেবেনা বলেই ও পড়া ছেড়েছে। —এসব কথা এবার এসেই শুনলুম। মা-বাবা প্রায় সব সময়ই সূর্যর কথা বলেন। তাঁদের মনে খুবই কষ্ট।

জানিস সীতা। সূর্যর কথা ভাবলে আমার বুকটা যেন ফেটে যায়। ও বড় ভাল ছেলে রে! আর আমাকে যে ও কত ভালবাসে। শুধু আমাকে নয়, তোকেও খুব ভালবাসে। তোর ওপর ওর খুবই টান। তুই যদি একটু ওর খোঁজখবর রাখতে থাকিস, তাহলে আমার মা তোর ওপর খুব খুশি হবে।

তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিবি। দিবি তো ?

তোরই ললিতা।

সীতা তখনই জবাব লিখতে বসে।

আদরের বোন ললিতা,

তোর চিঠি পেলুম। প্রেম-ভালবাসা কেবল গল্প কাহিনী হবে

কেন। পৃথিবীর মাটিতেই তো তার শেকড় রে! প্রমাণ চাস তো আমার জীবনটাই দেখ্ না। হ্যাঁরে ললিতা, আমি সত্যিই ভাগ্যবতী। আর আমি কখনোই ভুলব না আমার এই সব-পাওয়া সুখ সৌভাগ্যের মূলে আছিস তুই। তোর দৌলতেই আমি সব পেয়েছি।

সূর্য কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ফিরে এসেছে। আর একটা খুশির খবর শুনবি? আজকাল আমার স্বামীর সূর্যকে দারুণ ভাল লেগে গেছে। ওরা এখন ভীষণ বন্ধু। সবসময় শুনবি কংগ্রেস আর ব্রিটিশ সরকার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

গেল রোববার আমরা সবাই কুতুব মিনার, কেল্লা, যন্তরমন্তর এইসব জায়গা দেখে এসেছি। সূর্যও আমাদের সঙ্গে ছিল। তাইতে আমি বেশি করে আনন্দ পেয়েছি। কাল রাত্তিরে আমরা আগ্রা যাচ্ছি। সূর্যও যাচ্ছে। আমার শাশুড়ি যাবেন না। বলে দিয়েছেন নাতনিকে নিয়ে বাড়িতে থাকবেন।

আগ্রা থেকে রেলে একদিনের পথ রজনীপুর বলে একটা শহর আছে— এক দেশী রাজার রাজধানী। স্বামীর খুব ইচ্ছে ফেরার পথে ওখানে যাবার। ওখানে একটা বিশাল ঝিল আছে। তার পাড়ে হাজারে হাজারে সাদা বক এসে বসে। একটা দুটো করে আসে, আর সার বেঁধে দলে দলে ওড়ে। দুনিয়ায় নাকি এমনটি আর দেখা যায় না। ঝিলের মাঝখানে একটা মণ্ডপ বাঁধানো।...

সূর্যর জন্যে কোন চিন্তা নেই। আমি তার সুবিধে অসুবিধের ওপর নিয়মিত নজর রেখেছি। সূর্য আমাদের দুজনের জীবনে যে উপকার করেছে, তার বিনিময়ে যাই করি-না কেন, সবই তুচ্ছ। আমি ভেবে রেখেছি, সুযোগমত ওঁকে বলব সূর্যর জন্যে একটা ভাল চাকরীর ব্যবস্থা করতে।

এদিকে বেড়াতে যাবার দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে জোর তলব চলেছে। তাই এখানেই শেষ করছি। আগ্রা থেকে ফিরে তোকে বড় করে চিঠি দেব।

তোর প্রিয়সখি সীতা।

চোদ্দ

আগ্রায় গিয়ে লোকে সচরাচর আগ্রার পুরনো কেল্লার ভেতরকার মহলগুলোই আগে দেখে। দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যায় —মুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর যায় তাজমহল দেখতে। তাজমহল দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে— বিস্মিত আর মুগ্ধ হবার শক্তিও হারিয়ে ফেলে।

রাঘব সীতা আর সূর্যও সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিল। কেল্লার পাঁচিলের উচ্চতা আর যেন কালই তৈরী হয়েছে এমন তাজা চাকচিক্য দেখে ওরা মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। তোরণদ্বারের দৃঢ় নির্মাণকৌশলও ওদের কম মুগ্ধ করেনি। তারপর পথের দুপাশে গোলাপগাছের কেয়ারির অভ্যর্থনা গ্রহণ করতে করতে ওরা দীবানে-আম আর দাবানেখাস দেখতে ঢুকল। তারপর গেল মহলের হারেমে। এখানেই বাস করতেন শাজাহানের দুই কন্যা জাহানআরা আর রোশনারা। গেল শীশমহলে। দেখল হারেমের বেগম আর তাদের সহচরীদের জলকেলির জায়গা শ্বেতপাথরের মর্মর-দীঘি। সে যুগে বেগমদের নূপুরের ছমছম রুনঝুন ধ্বনির সঙ্গে মিশে থাকত ফোয়ারার জলকল্লোল। আজ সেখানে একফোঁটাও জলের নাম নেই। তবু সীতা সেদিনের দৃশ্য মনশ্চক্ষে দেখে—'আহা, আমার সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে, যখন এই রাজমহলে বেগম আর শাহজাদীরা বিহার করত, ধারাস্নান করত। তখন কেমন লাগত?'

'লাগবে আর কেমন। যারা এখানে থাকত তাদের কাছে তো এটা পিঁজরেপোল ছিল। খাঁচার টিয়ার কি আর সোনা হীরে জহরতের

জড়োয়া খাঁচা ভাল লাগে। খাঁচা সে খাঁচাই। জেলখানা জেলখানাই।' —সূর্য মন্তব্য করে।

'যা বলেছ সূর্য। সাবাস। বাঃ বাঃ যেমন বোন তার তেমনি ভাই।'—রাঘবন খুশি হয়ে বলে।

'তোমরা দুজনে মিলে আমায় বোকা বানাতে চাও নাকি? তাজ-মহল দেখলে বোঝা যায় না মোগল বাদশা শাহজাহান কী রকম গুণী ছিলেন? তাজমহল বানাতে কত কৌশল, কত পরিশ্রম, আর কী পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ হয়েছিল একবার ভেবে দেখ তো! বেগম মমতাজের ওপর ভালবাসার টান কতখানি থাকলে তবে এরকম একটা বিচিত্র বিস্ময়ের স্মৃতিচিহ্ন গড়ে তোলা যায়— বল তো! তাজমহল শুধু গড়ে দেওয়াই নয়। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এই স্মৃতিসৌধের দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে বসে থাকতেন।'—কল্পনার আবেগে সীতা ভেসে যায়।

রাঘবন বলে—'হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছ। এখান থেকেই শাজাহান শেষজীবনে তাজমহল দেখত। দেখতে দেখতেই একদিন চোখ বোজে।'

'তার ইতিহাসটা কি জান সীতা? রাজকোষের অর্থ নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলা তার ছেলে অওরঙ্গজেবের দুচক্ষের বিষ ছিল। তাই বুড়ো বাপকে কয়েদ করে এখানে আটকে রেখে দিয়েছিল, আর অনুমতি দিয়েছিল— এই মহলে বসেই এখান থেকে দু'চোখ ভরে দেখতে পার প্রিয়তমা মহিষীর জন্যে গড়া প্রেমের স্মৃতিসৌধ। স্মৃতির পিঞ্জরে বসে অমিতাচারী বৃদ্ধ শাজাহান অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে আর হতাশ দৃষ্টিতে দেখেছে— তাজমহল। নিষ্ফল ক্ষোভে ছটফট করে মরেছে।' সূর্য ইতিহাসের স্বরচিত ব্যাখ্যা দেয়।

রাঘব সমর্থনের সুরে বলে— 'শাজাহানের উচিত সাজাই হয়েছে। আমি আওরঙ্গজেব হলে আমিও তাই করতুম।'

সীতা সরোষে প্রতিবাদ জানায়—'অমন কথা মুখে এনো না।

এরকম আশ্চর্য শিল্পকলা দেখার পর এইরকম ভাব মনে আসছে তোমাদের ! তোমাদের চোখ নেই নাকি ?'

চোখ ছিল না ওদের। সত্যিই। কাছের কেল্লা, মোতীমহল কিংবা দূরের তাজমহল— দুয়ের কোনোটারই ওপর সেইমুহূর্তে চোখ ছিল না রাঘব কিংবা সূর্যর। ওরা তখন যুঁইমহলের অলিন্দে আগত দর্শকদের দিকে অপলকে দেখতে ব্যস্ত।

তিনজন আসছে। এদিক দিয়েই আসছে। দুজন মহিলা, একজন পুরুষ। মেয়েরা হল সেই দু'জন—করাচী কংগ্রেসের সময়ে রাঘবন যাদের বিমানবন্দরে প্রথম দেখেছিল। রাঘবন দেখছে তো দেখছেই। দৃষ্টি সরাবার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে তার। সে তার বর্তমানকে একেবারে বিস্মৃত হয়েছে। কোথায় আছি, কার সঙ্গে আছি, কী করতে এসেছি— এই মুহূর্তে কিছুই তার মনে পড়ছে না। ওর সারা মন ব্যাপ্ত করে তখন কেবল একটিমাত্র চিন্তা— তারিণী ! তারিণী তার সামনে। সামনের পথ দিয়ে আসছে।

এক নিমেষের জন্যে সমস্ত পৃথিবী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রাঘবের সামনে। সমস্ত বিশ্ব ! ওর মুখ থেকে অস্ফুট প্রশ্ন বেরিয়ে আসে— 'আমি কি সত্যি দেখছি, না স্বপ্ন !'

'তাজমহলের কথা বলছেন তো। কবিদের চোখে তো এ হল 'প্রেমের মর্মররূপ' কিংবা 'শিলায়িত স্বপ্ন'। তবে এখান থেকে যা প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে, তাতে তো তাজমহলকে স্বপ্ন বা কল্পনা মনে হয় না— বেশ জলজ্যান্ত ইমারতই তো দেখছি।'—তারিণীই বলল কথাটা। কার প্রশ্নের জবাবে কে জানে।

'একী। মিস্টার রাঘবন না ? কী আশ্চর্য সাক্ষাৎ !' তারিণীর সখি নিরুপমা বলে।

'হঁা, আমিই সেই অভাগা।' রাঘবন নিরুপমার কথার উত্তরে বলে।

'অভাগা কেন ? ওরে বাবা, আপনি আবার এত বিনয়ী হলেন কবে থেকে ? আপনার পেছনে, মহিলা, উনি কে ?'— নিরুপমার প্রশ্নে রাঘবনের মুখে মৃদু সংকোচ।

'জিজ্ঞেস করছিস কীরে? আন্দাজে বুঝিস না? উনি নিশ্চয়ই ওঁর প্রিয়তমা মহিষী। আবার কে হবেন?'— তারিণী রাঘবনের কাজটা সহজ করে দেয়।

'আরে তাই বলুন। আহা এতো ভারী মিষ্টি মেয়ে। আপনার লজ্জা করে না এমন সুন্দরী স্ত্রী পেয়েও নিজেকে অভাগা বলছেন?... ও বুঝেছি, ঠাট্টা করছিলেন।' নিরুপমা হাসে। 'পেছনে ঐ তরুণটি কে?'

'আমার স্ত্রীর বন্ধু।'— রাঘবন ধীরস্বরে বলে।

'আমার যেন কেমন চেনা চেনা লাগছে মুখটা। এই হালেই কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে।'— তারিণী বলে।

সুন্দর রাঘবন বললে—,এ'কে কোথায় দেখবে? আর কাউকে দেখেছ, হয়ত ওর মত দেখতে। ভুল করছ।'

সূর্য এসে পড়েছিল। বললে, 'না উনি ভুল বলেন নি। ওঁর সঙ্গে আমার হরিপুরা কংগ্রেসে দেখা হয়েছিল।'

হরিপুরা কংগ্রেসের নাম শুনেই রাঘবেন আট বছর আগের করাচী কংগ্রেসের কথা মনে পড়ে যায়। করাচীর বিমানবন্দরে তারিণীর সঙ্গে সেই প্রথম দেখা। সব মনে পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে তারিণীর মধুক্ষরা কণ্ঠ ওর কানে যায়— 'হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। আমি সোশালিস্ট পার্টির সভায় গিয়েছিলাম। আপনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। আপনার জোরালো আর সুচিন্তিত ভাষণ ভোলবার নয়। খুব ভাল বলেছিলেন।'

'সে কি! আমরা তো কিছুই জানি না। সূর্য আজকাল বক্তিমেও দিচ্ছ নাকি?'

'না না। চটুল বক্তিমে নয় মোটেই। দস্তুরমত সারগর্ভ ভাষণ। যারা শুনেছে তারা ইমপ্রেস্ড হয়েছে।' তারিণী বলে।

'ওঃ আমি পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছি— ইনি আমার স্বামী মিস্টার বেণীপ্রসাদ বি.এ. এল. এল. বি. স্থানীয় আদালতের নামকরা উকীল। তবে 'প্র্যাকটিস' মোটেই লোভনীয় নয়। সম্প্রতি এঁর

প্রধান কাজ হল স্ত্রীর বন্ধুবান্ধবকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে অতিথি-সৎকার করা। তারিণী আপাততঃ আমার গৃহে বন্দিনী। আপনারাও যদি সদলে আমার গরীবখানায় পদার্পণ করেন তো ধন্য হব। যথাসাধ্য আপ্যায়ন আর সেবার ত্রুটি রাখব না, শপথ করছি।— তা আগ্রায় কদিন থাকবার ইচ্ছে আছে আপনাদের ?' নিরুপমা রাঘবনকে প্রশ্ন করে।

'আজ আর কালকের দিনটা। আপনার সহৃদয় আমন্ত্রণের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে এবারে নয়। পরে কখনো নিশ্চয় যাব। যারা মিথ্যে কথা বলে, তাদের সঙ্গে বাস করতে আমার মন চায় না।' —রাঘবন জবাব দেয়।

'সে কী কথা। কে আবার আপনাকে মিথ্যে কথা বলল ?' নিরুপমা কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে যায়।

"আপনার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। সেদিন দিল্লী স্টেশনে দেখা হতে উনি সরাসরি বলে দিলেন—'আমি তারিণী নই'— এটাকে কি সত্যিকথা বলব ?'

'না, আমি সেকথা বলিনি'— তারিণী মৃদু প্রতিবাদ করে, 'বলে-ছিলাম, আমি সে-তারিণী নই। আর কিছু বলবার অবকাশ পাইনি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।'

'ছল চাতুরী করার পুরনো অভ্যেসটা যায়নি দেখছি'—রাঘবন ব্যঙ্গ করে।

'পুরনো কিছুই আমার যায়নি। আগে যেমন ছিলাম, এখনো তেমনি আছি। আর সবাই যদি একইরকম থাকত, তবে আর এরকম কথার অবকাশ হত না। সে যাক। আবার কবে, কোথায় দেখা হতে পারে ? আমার কিছু টাকা ফেরত দেবার আছে।'

'তার জন্যে তাড়াতাড়ি নেই। একসময় দিলেই হবে। আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ? তাজমহল দেখা হয়ে গেছে ?'

'বিকেলের পড়ন্ত সোনালি রোদে একবার, আর একবার পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় দেখা বাকি রয়ে গেছে।'

'আমাদেরও তাই ইচ্ছে। তবে সেখানেই আবার দেখা হবে।'

এরপর দুদলই পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে যে যার রাস্তা ধরে। এতক্ষণ সীতা চুপ করে ছিল, এবার রাঘবনকে জিজ্ঞেস করে বসে, —'উনি কে গো?'

'মামাত ভাইটিকেই জিজ্ঞেস কর-না কেন?'—রাঘবন উত্তর দেয়।

'ওকে কেন জিজ্ঞেস করব। তোমারও তো পরিচিত। তুমিই বল-না।'

'কে আবার। একটি মহিলা।'

'মহিলা— সে তো দেখতেই পেলাম। চেহারায় মেয়ে, চালচলন হাবভাবে পুরুষ বলেই মনে হয়। বেটাছেলে হয়ে জন্মালেই ভাল হত, ভুল করে মেয়েমানুষ হয়েছে।'

'এ কথা ঠিকই বলেছ। তাহলে বল মেয়েমানুষের শরীরে ঐ পুরুষটির সঙ্গে আমি কথাবার্তা বললে তোমার দুঃখ হবে না তো?'

'দুঃখ? আমার দুঃখ হতে যাবে কেন? তুমি ষোলো আনা নারীর সঙ্গে কথা বললেই বা আমার কী? তুমি কি আমায় খাঁটি গেঁইয়া বলে ধরে নিয়েছ নাকি? তবে একটা আমার অসহ্য লাগে— কোন ব্যাপারে লুকোছাপা আমার ভাল লাগে না। সেদিন দিল্লী স্টেশনে এর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলে তো?'

'শোন সূর্য, তোমার বোনের কথা। বলছে, ওর ভয়ে আমি নাকি কথা লুকোই। এই নারী জাতটাই হল ভ্রান্তিবিলাসী।'

'আমি ভ্রান্তিবিলাসী টিলাসী কিছুই নই। আমি সেদিন কেবল জানতে চেয়েছিলাম যে স্টেশনে তুমি যার সঙ্গে কথা বলছিলে সে মেয়েটি কে। তাতে তুমি যেন আতান্তরে পড়ে গেলে।'

'আতান্তরে পড়ে যাব কেন। আসলে মেয়েটাকে পরিচিত মেয়ে ভেবে কথা বলতে গেলুম। সে পষ্ট অস্বীকার করে বসল। আবার তুমি সেই কথার উল্লেখ করে আমার জ্বালা বাড়িয়ে দিলে, আমিও তাই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলুম। এখন তুমিই বলো তোমার কথার সে সময় কী জবাব দেব? জবাব দেওয়া যায়? আর এখন তো যা কথাবার্তা হল তোমার সামনেই হল। তুমি নিজের কানেই শুনলে। সবই বুঝতে পারছ। তবে?'

'কী করে বুঝব? তোমরা তো ইংরিজীতে কথা বলছিলে। অত ইংরিজি কি আমি জানি?'

'জানো না যখন, তখন মুখে তালা এঁটে থাকো।'

'ঐ তো। চেঁচাতেই শিখেছ। একটা কথা ভাল মুখে বলতে শেখনি।'

ওদের কথা শুনতে শুনতে সূর্য ওদের পেছনে হাঁটছিল। এবার বলে ওঠে, 'সীতা, মহিলাটির সম্পর্কে কোন বিপরীত ধারণা রেখ না। উনি একজন দেশসেবিকা। হরিপুরা কংগ্রেসে ওর কাজকর্মের উদ্দীপনা দেখলে তুমিও ওর গুণের শতমুখে প্রশংসা করতে। ওর সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা মনে আসত না।'

এরপর তারা আগ্রা কেল্লার অন্যান্য দর্শনীয় জিনিস দেখে বেড়াল। তবে কারুরই আর আগের মতন উৎসাহ ছিলনা। একসময় সীতা রাঘবনকে বললে, হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে, আমরা হোটেলে ফিরব নাকি?'

'হ্যাঁ, ফেরা যাক এবার। সবই একরকম শ্বেতপাথরের বাড়ি দেখে দেখে একঘেয়ে লাগছে। কোন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই। চল ফিরি। বিকেলে আবার তাজমহল দেখতে যাওয়া আছে তো? —রাঘবন বলে।

'তাহলে তো তোমার তাজমহলও একঘেয়ে লাগবে, বল। তাজমহলও তো সেই শ্বেতপাথরে তৈরী।'— সীতা ঠাট্টার সুরে বলে।

'তা কেন। সেটা একেবারে আলাদা ব্যাপার। তাজমহল তো

শুধু পাথরের ইমারত নয়। তাজমহল হল একটা জীবন্ত স্থাপত্য-কলা। মোগল আমলের ভারতীয় সংস্কৃতির অভ্যুত্থানের নিদর্শন। প্রেমের জাগ্রত প্রতিচ্ছবি। তাজমহল যে দেখেনি তার জন্মই বৃথা।'— রাঘবন ভাবের আবেগে আপ্লুত হয়ে ভেসে চলে।

একসময় ওরা পরিশ্রান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এল। আহারাদি করে বিশ্রাম করতে গেল।

পনেরো

নবোঢ়া যেমন দয়িতসঙ্গমে এসে প্রেমে আর শরমে ব্রীড়াকুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি মোহিনীরূপে জ্যোৎস্নার আবেশ জড়ানো তাজমহল নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। রুপোলি চাঁদের আলোয় আসমানী জলাশয়ের স্বচ্ছ ছায়ায় প্রতিবিম্বিত রুপোর মত স্ফটিকশিলার চত্বরে, সীতা-রাঘবন, তারিণী-সূর্য, নিরুপমা আর তার স্বামী বেণীপ্রসাদ সকলে বসে আছে।

ওরা সারাটা বিকেল তাজমহলকে প্রদক্ষিণ করেছে, তিল তিল করে তার রূপ চেখেছে, প্রতিটি কোণ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করেছে। ভেতরে গিয়ে শাজাহান আর মমতাজের সমাধি দেখে এসেছে। কবরস্থানের আশেপাশে মর্মরের ফুল লতাপাতা দেখেছে। দেশ-বিদেশ থেকে আমদানি করা মহার্ঘ রত্নখচিত নকশার কারুকার্য দেখেছে। সে সবের অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে। চারকোণে চারটি একশো ষাট ফুট উঁচু খাড়াই মিনার— প্রহরাস্তম্ভের ওপর বাজি রেখে উঠেছে। যমুনার জলে পা ডুবিয়েছে। এখন ওরা পরিতৃপ্ত। এবং ঘোরাঘুরিতে পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধেবেলার স্নিগ্ধশীতল জলাশয়ের ধারে এসে সমবেত হয়েছে। এখন রাত নটা। বহির্বিশ্ব নিঃশব্দ। কিন্তু সীতা রাঘবন তারিণী আর সূর্যের অন্তর নানাকারণে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

'তাজমহল না দেখলে মানবজন্মই বৃথা'—সীতা সংলাপের সূত্রপাত ঘটায়।

'তার সঙ্গে এটাও যোগ করো যে কেবল দিনের বেলায় দেখাই যথেষ্ট নয়। পূর্ণিমার রাত্তিরে দেখা দরকার।'—রাঘবন বলে।

'আর এটাও যোগ করো সীতা'— সূর্য বলে—'যে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করাও দরকার। কারণ এর পরে প্রাণ রাখার আর প্রয়োজন কী।'

সীতা বুঝল সূর্য উপহাস করছে। বুঝেও নিজের আবেগে বহমান রইল—'ঠিকই বলেছ সূর্য, প্রেমের প্রতীক তাজমহল দেখার পরে আর বেঁচে থাকা এমন কিছু জরুরী নয়।'

সূর্য এবার একটু তীক্ষ্ণ সুরে বলে—'তোমাদের সব সময়ই কেবল প্রেম আর ভালোবাসা আর বিয়ে আর মিলন— এ ছাড়া কথা নেই। কেন দুনিয়ায় কি এসব ছাড়া আর কোন জিনিস নেই?'

'এতে সন্দেহ কী? প্রেমের চেয়ে বড় জিনিস কী আছে পৃথিবীতে? কাব্যগাথা, কথাকাহিনী সব-কিছুই তো প্রেমের ভিত্তিতেই রচিত। প্রেম নামের বস্তু না থাকলে বাল্মীকির রামায়ণ কোথায় থাকত? কালিদাসের শকুন্তলা? শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক? তাছাড়া, আজও যাঁরা গল্প উপন্যাস লিখছেন, তাঁরাই বা কী নিয়ে লিখতেন? না, 'জগৎ সর্বং প্রেম মূলম্'—এতে কোন সন্দেহ নেই।'—রাঘবন বলল।

'ওসব উপন্যাস জঞ্জালের সামিল। আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পার। যার মগজে কোন পদার্থ নেই, সে-ই প্রেম নিয়ে গল্প ফাঁদে। যতসব নিষ্কর্ম্মা বেকারের দলই কবিতা লেখে।'—সূর্য উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'তাহলে কি তুমি চাও সবাই কার্ল মার্কস বনে গিয়ে শুকনো তত্ত্ব কথা আওড়ায়?'—রাঘবন ঠাট্টা করে।

'সবাই কার্ল মার্কস হবে কেন? তলস্তয়ের মতন লিখুক, গান্ধীর মতন লিখুক, নেহরু কিংবা বার্নার্ড শ'র মত লিখুক।'

সীতা বলল—'আচ্ছা ভাই ভারতীর কথা বললে না তো? তোমার মনে আছে, ভারতী প্রেম সম্পর্কে কী লিখেছেন?'

'ভারতী যাই বলুন তাতে কী আসে যায়? তিনি যা বলেছেন সব অভ্রান্ত বলে আমি মানি না। ভারতী যখন সজ্ঞানে লিখেছেন, তখন দেশের স্বাধীনতার গান রচনা করেছেন। আর তাঁর যত

প্রেমের গীতি সব তার অবসাদ শৈথিল্যের ফসল।'—সূর্য রায় জারী করে।

'এঁর কথা শুনলে মনে হয় ইনি একজন ব্যর্থ প্রেমিক।'—এই বলে তারিণী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। চাঁদের আলোয় তার যুঁই কুঁড়ির মতন দাঁতের পাঁতি মুক্তোর মতো ঝিলিক দেয়।

'না, মোটেই এরকম কোন ব্যাপার নয়'—সূর্য লজ্জায় পড়ে যায়।

'সবসময় উল্টো কথা বলা সূর্যটার অভ্যেস হয়ে গেছে। হ্যাঁ সীতা, ভারতী প্রেমের ব্যাপারে কী বলেছেন, একটু বলোতো শুনি।' রাঘবন বলে।

সীতা মৃদুকণ্ঠে কয়েক পঙ্‌ক্তি গাইল :

'অন্বু বাড়কন্‌রু অমৈদিয়িল্ আডুবোম্ !
আশৈক কাদ্‌লৈক কই কোট্রি বালত্তুবোম্।'

—'প্রেমের জয়ধ্বনি করতে করতে আমি শান্তছন্দে নৃত্য করব। প্রেমের অভ্যর্থনায় আমি করতালি দেব।'

তারিণী বললে, 'পুরোটা গান তো। শুনতে ইচ্ছে করছে।'

সীতা রাঘবনের মুখের দিকে তাকায়। রাঘবন সম্মতি দেয়—'গাও, তবে বেসুরো গেয়ো না।'

সীতা চটে ওঠে। বলে—'সুরো বেসুরো আমি যেমন জানি, তেমনই গাইতে পারি।'

'আমরা সুরবেসুর কিছুই বুঝি না। সব স্বরই আমাদের কাছে সমান। কাজেই নিঃসংকোচে গান।'—নিরুপমা সীতাকে উৎসাহিত করে।

সীতা গায় :

'পেন্মৈ বালকন্‌রু কুত্তিডুবোমড়া !
পেন্মৈ বেলহমরু কুত্তিডুবোমড়া !'

অর্থাৎ, 'নারীত্বের জয়— এসো রে নৃত্য করি। নারীত্বের জয়—এসো রে নৃত্য করি।'

সীতার সুরেলা কণ্ঠের গান সকলের দৃষ্টি তার মুখের দিকে আকৃষ্ট

করে। সবাই তার দিকে চেয়ে আছে— কেবল রাঘবন তারিণীর মুখের দিকে।

গান শেষ হলে তারিণী আর নিরুপমা আনন্দ জ্ঞাপন করে। তারিণী নিরুপমা আর তার স্বামীকে গানের মানে বুঝিয়ে দেয়। রাঘবন বলে— 'তারিণী তুমি হিন্দুস্তানীর সেই রাষ্ট্রীয় গীতটা গাও তো।'

নিরুপমাও প্রস্তাব সমর্থন করে— 'হ্যাঁ, তোর মুখে 'সারে জঁহাসে আচ্ছা' গানটা অনেকদিন শুনিনি। সেই করাচী থেকে বোম্বাই আসার পথে জাহাজে গেয়েছিলি। গা তো।'

তারিণী গাইল। রাতজাগা পাখি আর ঝিল্লীর স্বরও স্তব্ধ হয়ে শুনল, বাতাস অত্যন্ত সন্তর্পণে থেমে রইল। চাঁদের আলোয় ছবি তুলবে বলে যে ফিরিঙ্গি দম্পতি ক্যামেরা খুলছিল, তারাও শাটার টিপতে ভুলে গেল।

গান সমাপ্ত হতে নিরুপমা আর তার স্বামী উচ্ছ্বসিত তারিফ করল রাঘব বলল— 'গাইলে এমন গানই গাওয়া উচিত। তা না হলে চুপ করে থাকাই ভালো।' শুনে সীতা মর্মাহত হল। সূর্য সেটা বুঝতে পারল। সীতার আহত মর্মে প্রলেপ লাগাবার উদ্দেশ্যে সে বলল— 'সীতা, এ গান তো তুমিও ইচ্ছে করলেই শিখতে পার। এ গানটার অর্থ বুঝলে? আমাদের হিন্দুস্তান পৃথিবীর সকল দেশের সেরা।'

'এতে আর সন্দেহ কী? দুনিয়ার সেরা দেশ ভারত সে তো বটেই। সেটা প্রমাণ করার জন্যে এক তাজমহলই যথেষ্ট।'— সীতা বলে।

'এ কথা বলা ভুল। তাজমহলের দৌলতে ভারতের গৌরব বাড়ে নি। এদেশের গৌরব তার হিমালয়, তার গঙ্গা, তার বুদ্ধ অশোক শিবাজী আর ঝাঁসির রানীর মত মহান ব্যক্তিত্ব—যাঁদের মহিমা ভারতের মাথাকে উঁচু করেছে।'—সূর্য বলল।

'হিমালয় আর গঙ্গার মত পাহাড় নদীর অন্য দেশেও অভাব নেই। কিন্তু তাদের তাজমহলের মত সৌধ নেই। তাই তাজমহলের জন্যেই হিন্দুস্তানের এত গৌরব।'—রাঘব সীতার সমর্থনে বলে।

'কেউ আমার মত জানতে চাইলে বলব— ভারতের অমন গৌরবে দরকার নেই।'—সূর্য উত্তেজিত।

'কেউ তোমার মত জানতে চাইলে তো? মনে হচ্ছে দুনিয়া সুদ্ধু লোক যাকে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য বলে গ্রহণ করেছে, এক তোমার ওপরই তার কোন প্রভাব নেই।'—রাঘবন বলল।

বেণীপ্রসাদ বললে— 'মিস্টার সূর্যর যদি ভাল না লাগে তাতে দুনিয়ার কিছু যায় আসে না। তাজমহলের জন্যেই ভারতের গৌরব-মহিমার দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। প্রেমের অনশ্বরত্ব এখানে স্ফুরিত হয়েছে।'

'আরে, আপনিও যে দেখছি প্রেমের গুণগান শুরু করলেন!' সূর্যর কণ্ঠে পরিহাসের তিক্ততা।

নিরুপমা বললে— 'প্রেমের নাম শুনলেই আপনি এমন চটে ওঠেন কেন? তাজমহলের এই যে দিব্যশোভা, এ তো শাজাহানের প্রেমেরই প্রেরণা থেকে সৃষ্ট।'

সূর্য বলে—'দয়া করে যদি শোনেন, তবে বলি, এটা ভুল ধারণা। তাজমহলের ভিত্তি শাজাহানের অনুরাগ নয়। বাদশা শাজাহানের অত্যাচারী স্বৈরশাসন থেকেই এর জন্ম। তার সেই জুলুম তার নিজের ছেলে আওরঙ্গজেবেরও সহ্য হয়নি। তাই সে তার জন্মদাতা বাপকেও কয়েদ করে রেখেছিল।'

'না, আওরঙ্গজেবের অন্তরে কলার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। সে যে কতবড় নিষ্ঠুর শাসক ছিল, ইতিহাসের পাতায় তার অজস্র প্রমাণ ছড়ানো আছে, বুঝলেন? কিন্তু শাজাহানের সম্বন্ধে ইতিহাস বলে— সে বড়ই ন্যায়পরায়ণ ছিল। তাকে আপনি নির্দয় বলবেন কোন যুক্তিতে?'

'আচ্ছা ধরে নিলাম শাজাহান খুবই সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিল। কিন্তু তার আত্মশ্লাঘার জন্যে কত লোককে দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, জানেন? তাজমহল গড়তে কুড়ি হাজার কারিগরকে নাগাড়ে কুড়ি বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে হয়েছে।

আর তাদের খরচ জোগাতে প্রজাদের রক্তচুষে কর আদায় করা হয়েছে। আর শোষণের সেই কোটি কোটি টাকা জলের মত ঢেলে দেওয়া হয়েছে। একলা একটা মানুষের বিলাস বৈভবের বারফাট্টাই দেখাবার জন্যেই হোক আর তার অতিবিচিত্র তথাকথিত অলৌকিক প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন রাখার জন্যেই হোক— এই যে বিশ হাজার মানুষের বিশ বছর ধরে অবিশ্রান্ত খেটে খেটে মরে যাওয়া— এটা কি খুব গৌরবের? আমার হাতে যদি শাসনের ভার থাকত তো কী করতুম— জানেন?'— উত্তেজনার আবেগ সামলে, সূর্য দম নেবার জন্যে একটুক্ষণ থামল।

সেই ফাঁকে তারিণী ঠোঁটে মৃদু হাসির রঙ মেখে বলল—'যদি শাসন ক্ষমতা আপনার হাতে থাকত, কী করতেন?'

সেদিন বিকেলে তাজমহলের কম্পাউণ্ডের ভেতর সাজানো খেলনার দোকান থেকে একটা কাঁচের তাজমহল কেনা হয়েছিল. সেটা সূর্যর হাতের পাশেই পড়ে ছিল। সূর্য সেটা তুলে নেয়।— 'হাজার হাজার মূক মানুষের ওওর জুলুমের বন্যা বইয়ে এক মূর্খ রাজার খেয়াল চরিতার্থ করা এই ঘৃণ্য ইমারতটা আমি তা হলে এমনি গুঁড়িয়ে ধুলো ধুলো করে দিতুম।' নিষ্ঠুর উল্লাসে সূর্য হাতের খেলনা তাজমহলটাকে সজোরে মাটিতে ছুড়ে মারে। খেলনাটা চুরমার হয়ে যায়। তার একটা ভাঙা টুকরো লাফিয়ে উঠে তারিণীর মাথামুখ লক্ষ্য করে ছুটে যায়। তারিণীর আঘাতের আশঙ্কায় সবাই একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে। তারিণীও সভয়ে মাথাটা পিছিয়ে নেয়। তার বেশি জোরে আঘাত লাগতে পায় না। খালি কপালের চুলের পাশে একটুখানি গিঁথে গিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। সবাই একটু আশ্বস্ত হয়। সূর্য ছাড়া সবাই তারিণীর চারপাশে জমা হয়। সবার আগে রাঘবন ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তারিণীর কপালের আঘাতের পরিচর্যা করার জন্যে দৌড়োয়। কিন্তু নিরুপমা তার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে পটী বেঁধে দিল।

আর সকলের মত সীতাও উদ্‌বিগ্ন হয়ে তারিণীর পাশে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু রাঘবনের সমবেদনার বাড়াবাড়ি দেখে সীতার বুকে শূল বেঁধার মতন কষ্ট হতে লাগল।

কিছুক্ষণ সবাই তারিণীকে ঘিরে 'আহা-উহু' করল। তারপর চুপচাপ হয়ে গিয়ে যে যার জায়গায় এসে বসে পড়ল। বেণীপ্রসাদ রাঘবনের দিকে তাকিয়ে বলল—'আপনার বন্ধুটি তো বড় রাগী মানুষ দেখছি।'

'ডাহা মূর্খ। গোঁয়ার। মাপ চাইতে হয়, সেটুকু ভদ্রতাও জানে না।'—রাঘবন জবাবে বলল।

তারিণী বললে—'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত তুলকালাম করবার কী আছে।'

রাঘবন বললে—'ভাগ্যে কপালের ওপর দিয়ে গেছে। চোখে লাগলে কী হত?'

'লাগেনি তো? তবে আবার সে কথা তোলার দরকার কী? এখন একটু চুপ করুন তো আপনারা, দয়া করে।'—তারিণী বলে।

সীতা মৌন হয়ে আছে। তার মনের ভেতর তোলপাড় করছে। একবার ভাবছে, এই তুচ্ছ তিলপরিমাণ চোট লেগেছে, তাই নিয়ে সবাই মিলে এত আদিখ্যেতা করছে কেন? আর একবার ভাবল, আঘাতটা আর-একটু জোর হলে ক্ষতি কী ছিল?

তাজমহল ভাঙা আর তারিণীর চোট লাগার পর আর কারোরই কিছু ভাল লাগল না।

সীতা বললে, 'খুব তাজমহল দেখা হয়েছে। এবার চল হোটেলে ফেরা যাক।'

সবাই যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিল। চটপট উঠে দাঁড়াল। হোটেলে পৌঁছেই সূর্য তার জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে রওনা হয়ে গেল। বলে গেল তাকে এখনই দিল্লী ফিরতে হবে।

ষোলো

পরের দিনই সীতা আর রাঘবন তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রজনীপুর রওনা হয়ে গেল। তারিণী আর নিরুপমা স্টেশনে এসে কামরায় শুধু ওদের দুজনকেই বসে থাকতে দেখল। সূর্যকে না দেখে তারিণীর মনে সন্দেহ হল। বললে— 'সূর্য কোথায় ?'

'ও আসেনি। দিল্লী চলে গেছে।'—রাঘবন উত্তর দিল।

তারিণী বললে—'কালকের ঘটনার পর আপনারা তাকে ঝগড়া করে তাড়িয়ে দেননি তো ?'

রাঘব বললে—'আমরা ঝগড়াটগড়া করিনি। নিজেই বোধহয় লজ্জা পেয়ে থাকবে। হঠাৎ চলে গেল।'

সূর্য সম্পর্কে কোন অগৌরবের কথা সীতার পছন্দ নয়। সে বললে— 'না, না, তা নয়। ওর দিল্লীতে জরুরী কাজ ছিল। আসবার সময়েই আমায় বলে রেখেছিল যে আগরা পর্যন্ত একসাথে থাকবে, তারপর ও দিল্লী ফিরে যাবে। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একখানা চিঠিও লিখে রেখে গেছে।' স্বামীর দিকে চেয়ে বলে— 'কই চিঠিটা ওঁকে দাও না।'

'গাড়িটা ছাড়ুক-না। এত ব্যস্ত হবার কী আছে ?' রাঘব বললে।

তারিণী বললে— 'ক্ষমাটমা আবার কিসের ? আপনারা বড় তিলকে তাল করে তোলেন। নিশ্চয় এই নিয়ে তাকে কড়া কথাটথা বলেছেন। নইলে চলে যাবে কেন ? ছি ছি, আমারই লজ্জা করছে।'

শুনে সীতার মনটায় যেন একটু সান্ত্বনার মলম লাগল।

গাড়ি ছাড়ার খানিক পরেই তারিণী বললে—'কই চিঠিটা

কোথায় ?'

'উঃ চিঠি না পড়ে দেখছি তুমি স্বস্তি পাচ্ছ না।' বলে রাঘবন চিঠিটা বের করে দেয়।

তারিণী দেবী,

আজ তাজমহলে আমার জন্যে আপনি যে কষ্ট পেলেন, সেজন্য আমার লজ্জার শেষ নেই। ওরকম ভাবে আপনার কপালে আঘাত লাগবে, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। আশা করি আমায় ভুল বুঝবেন না। তাজমহলটা ভেঙে গেছে তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। সত্যিকারের তাজমহলটাও কোন কারণে যদি ঐরকম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়, তাতেও আমি দুঃখ পাব না। এই দেশটা একদিন কোন মূঢ় বৃদ্ধের হাতে পড়েছিল। বার্ধক্যে জরায় তার মতিভ্রম হয়েছিল। প্রেমের মিথ্যে অছিলায় সে একটা ব্যয়বহুল খেলনা বানিয়েছিল। মৃতা স্ত্রীর প্রেমের বায়না রাখতে গিয়ে গরীব প্রজার বিশ বছরের সমস্ত সম্বল কেড়ে নিয়ে বানানো সেই অনর্থক দামী খেলনাটারই নাম— তাজমহল। তাজমহল মোটেই আমাকে আশ্চর্য করে না। যারা একে বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ভেবে আকুল বিস্ময়ে পুলকিত হয়, বুদ্ধিবিবেচনা আর কাণ্ডজ্ঞানের লেশশূন্য দলে দলে সেই সব মানুষদের দেখেই আমার আশ্চর্যের সীমা থাকে না। সে যাই হোক অনিচ্ছাকৃত এবং অপ্রত্যাশিত ঐ দুর্ঘটনার জন্যে আমি আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

চিঠিটা শেষ করার আগে আর-একটা কথা বলব। আমি বলেছি আপনার মাথায় যে আঘাত লাগবে, এটা আমার কল্পনাতীত ছিল। আপনাকে আঘাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আপনার কপালের ঐ ছোট্ট চোটটাকে কেন্দ্র করে যারা আপনাকে ঘিরে হাহুতোশ করছিল, তাদের মাথায় গোটাকতক চাঁটা আর গালে দুটো করে চড় মারার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করছিল।

ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্যে আমাদের বহু কষ্টবরণ করতে

হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ বলি দিতে হবে। সজ্ঞানে আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। এদেশ বীর-প্রসবিনী। আমাদের পূর্বপুরুষরা কখনো ক্লীব ছিলেন না। কাল আপনারা রাজপুতানায় যাবেন। জানেন তো, ওটা বীর-বীরাঙ্গনার চারণভূমি! শত্রুরা দুর্গ ভেঙে ঢুকলে রাজপুত নারীরা শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জহর ব্রত করতেন। রাণা সংগ্রাম সিংহ নামের সেই পরাক্রমী বীর রাজার কথা মনে করুন যিনি দেহে ছিয়ানব্বইটা• মারাত্মক আঘাত নিয়েও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন নি। এই মহান দেশে জন্মেও সামান্য একটা চোট দেখে আমাদের 'ভিরমি' লাগে। পুরুষ মানুষ এমন হিস্টিরিয়ার রুগীর মতন হাত-পা ছোঁড়ে। কেন এমন হবে?

যাক, এখানেই শেষ করি। আমাদের তামিলনাদের মহাকবি ভারতী 'নেঞ্চু পাঁরুক্কু দিল্লৈয়ে' শীর্ষক একটি গাথা রচনা করেছিলেন। গানটা সীতা জানে। ওর মুখে গানটা শুনবেন। মানুষ যে অধঃপতনের কোন্ অতল খাদে তলিয়ে যাচ্ছে, দেখে আপনি শিউরে উঠবেন।

আপনার

সূর্য আয়ার।

গাড়ীতে বসে বসেই তারিণী চিঠিটা পড়ে ফেলল। একবার নয়, দু দুবার পড়ল। তারপর নিজের বাক্সে যত্ন করে রেখে দিল।

রাঘবন বললে—'চিঠিটা এত যত্ন করে রাখছ, যেন প্রেমপত্র।'

'যত বাজে কথা।'— তারিণী বিরক্ত হল। শুনে রাঘবন বুঝল ঠিকই যে কথাটা তাকেই বলা হচ্ছে। তবুও ন্যাকামি করে বললে —'বাজেকথা তো বাক্সে তুলে রাখলে কেন?'

তারিণী একবার ভাবল চিঠিটা সবাইকে পড়ে শুনিয়ে দেয়। তারপর আবার ভাবল, দরকার নেই।

নিরুপমা রাঘবনের দিকে ফিরে বলল—'তারিণী এখন আর সেই পুরনো স্বেচ্ছাসেবিকা তারিণী নেই। ইতিহাসে এম.এ. পাস করে

ও এখন স্কলারশিপ নিয়ে গবেষণা করছে। আমাদের রাজপুতানা সফরের এটাও অন্যতম কারণ।' ইতিবৃত্ত শুনিয়ে নিরুপমা নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাঘবন তারিণীকে একথা ওকথা প্রশ্ন করতে থাকল। তারিণী সেসব প্রশ্নের এমন দায়সারা জবাব দিল যে রাঘব বিরক্ত হয়ে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন তারিণী সীতার পাশে গিয়ে বসল। বললে— 'সূর্যর কথা কিছু বলুন। ও কি বরাবরই ঐরকম বদরাগী?'

শুনে সীতা জ্বলে উঠল। বললে— 'সূর্যর কথা শুনে আপনার কী হবে? সেও আমার মতন নির্বোধ আর নিরুপায়। আর কী জানতে চান?'

'রাগ কোরো না বোন। আমার কপালে চোট লেগেছে বলে খুব দুঃখ পেয়েছেন। লিখেছেন। উনি খুব গুণী ছেলে। তবে একটু রাগী স্বভাবের। তোমার মারফত আমি তাকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমার চোট সেরে গেছে। তুমি যদি তাঁর কথা বলতে না চাও তো নাই বললে।'

তারিণীর কথা শুনে সীতার রাগ জল হয়ে গেল। বললে— 'না, না। আমি রাগটাগ করিনি। সূর্যর অনেক গুণ। আমার মামার বাড়ির লোকদের মধ্যে সূর্যই সবচেয়ে সহিষ্ণু আর বিচক্ষণ। কাল ওর ঐরকম রাগ করে 'তাজমহল' আছড়ে ফেলা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কী জানি কেন অমন করল? হয়তো তার মনে একটা কষ্ট আছে। তবে সব মিলিয়ে ছেলেটার বরাত বড় খারাপ। নইলে এমন ঝামেলায় পড়বে কেন? ভাল-ভাবে লেখাপড়া করে সুখে থাকতেই পারত।'

'কেন, বরাত খারাপ কেন বলছ?' তারিণীর প্রশ্নের উত্তরে সীতা সূর্যের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করল। তার মা-বাপ ভাই-বোনের কথাও বাদ দিল না। গ্রামের সেই ঝগড়ার কথাও বলল। কিন্তু তার নিজের জন্মকথা, শৈশবের কথা, বিয়ের কথা সাবধানে বাদ দিয়ে গেল।

সাতেরো

রজনীপুর রাজ্যের দেওয়ান স্যার কে. কে. আদিবরাহাচার্যের স্বভাব ছিল কোথাও কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবককে দেখলে আগে নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, তারপর তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবেন, একসময় সে তাঁর প্রীতিমুগ্ধ হয়ে উঠবেই। বিলেত যাবার সময়ে জাহাজেই সুন্দর রাঘবনের তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। রাঘবনের বুদ্ধিমত্তা আর বাকনৈপুণ্য দেওয়ান আদিবরাহাচার্যকে আকৃষ্ট করে। রাঘবনের আরো একটা তৃতীয় আকর্ষণ ছিল— দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে তার পদস্থ কর্মচারিত্ব। দেওয়ান জানতেন সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীদের সঙ্গে যত বেশি জানাশোনা হয়, ততই লাভ। কখনো না কখনো কাজে লাগে।

তাই তিনি রাঘবনকে ঢালাও আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন— বিলেত থেকে ফেরার পর একবার যেন বৌকে নিয়ে রজনীপুরে বেড়াতে আসে। তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রাঘবন সীতাকে নিয়ে দেওয়ান ভবনে গেল। তারিণী আর নিরুপমা অন্য জায়গায় উঠল।

সে সময় দেওয়ানজী শহরে ছিলেন না। এস্টেটের কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। তবে রাঘবনের তার পেয়ে তিনি তাঁর মেয়েদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, যেন অতিথিদের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি না হয়। তারা সীতা আর রাঘবনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল আর তাদের সব রকম আরাম আয়াসের বন্দোবস্ত করে দিল।

আদিবরাহাচার্যের দুই মেয়ে ভামা আর ধামা দুজনেই বিলেতে ছিল। উভয়েই পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ওদের একজন রোগা পাতলা আর লম্বা। আর একজন বেঁটে আর মোটা। দুজনেরই মাথার চুল সুন্দর করে ছাঁটা। সব সময়েই নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কথা বলে। সেও কীরকম ইংরেজী। উডহাউসের চরিত্ররা যে ধরনের সংলাপ বলে ঠিক সেই ধরন। পিয়ানোয় পাশ্চাত্য সংগীত বাজাতে আর বলরুম ডান্স করতে দুজনেই বিশেষ পটু।

এই জাতের মেয়েদের মধ্যে পড়ে সীতা কেমন হতভম্ব হয়ে পড়ল। গোড়ায় গোড়ায় দুজনেই সীতার সঙ্গে ইংরিজিতে বাক্যালাপ শুরু করেছিল। তাদের ইংরিজি 'সীতার মগজে না ঢোকায়, আর সীতার থ হয়ে তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকায়, তারা তাদের ভাঙাচুরো তামিলে প্রশ্নগুলোকে অনুবাদ করে দিল। তাদের ইংরিজি তো বটেই তাদের তামিলও ইংরেজদের নকলে উচ্চারণ করা, কাজেই সীতার যৎসামান্য ইংরিজি জ্ঞান এখানে কোন কাজেই লাগল না; ফলে সীতা ওদের পাশ কাটিয়ে গেল। ওরাও সীতাকে বাদ দিয়ে বেশি করে রাঘবনের সঙ্গেই মেলামেশা দহরম-মহরম করতে লাগল। রাঘবনও ওদের সঙ্গে আচরণে কোন ভব্যতার বালাই রাখল না। সে কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টার, ইয়াকি-ফাজলামির এমন ফুলঝুরি ছড়াতে লাগল যে ওরা দুইবোনে একেবারে হেসে কুটিপাটি হয়ে যেতে থাকে। এসব ধরন-ধারণ দেখে সীতার কেমন গা ঘিনঘিন করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার ভেতরে কোন জ্বালা ধরে না। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে মেয়েগুলো সুন্দরী নয়। আর দ্বিতীয় কারণ— তার মন এটুকু বুঝে ফেলেছিল যে রাঘবনের ওদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

ভারতে যত দিশি রাজ্য আছে, তাদের রাজধানীগুলির মধ্যে রজনীপুর অন্যতম সুন্দর। পরদিন সীতা আর রাঘবন শহর দেখতে বেরোল। রাজার পুরনো মহল, নতুন মহল, বসন্তোৎসব পালনের জন্যে শীষমহল, নন্দনবন, যাদুঘর, শহর থেকে কিছু দূরে পুরনো কেল্লা আর তার প্রাচীর প্রাকার ইত্যাদি দেখতে দেখতে সারাটা

দিন মোটামুটি আনন্দেই কেটে গেল। তবে কোনো জায়গায়ই ওরা বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। যেখানেই যায়, রাঘবনের কেমন যেন উতলা উতলা ভাব, যেন দাঁড়াতে পারছে না, যেন পায়ে ফোস্কা পড়েছে। সীতাও স্বামীর উতলা মনের সঙ্গে তাল রেখে আদর্শ সহধর্মিণীর রীতি অনুযায়ী দ্রুততার সঙ্গে দর্শনীয় স্থানের তালিকা শেষ করল।

সন্ধে নাগাদ দেওয়ান বাংলোয় ফেরার পথে সীতা বলল, 'আজ ওদের দুজনের দেখা পেলাম না কেন বল তো?'

রাঘবন বললে—'আমিও সেই কথাই ভাবছি। বলেছিল টেলিফোন করবে। তাও তো করল না।'

গাড়ি চলছে। হঠাৎ রাঘবন চেঁচিয়ে উঠে ড্রাইভারকে বলল—'দাঁড়াও।'

তার চীৎকার শুনে ড্রাইভারও তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষতেই গাড়িও আর্তনাদ করে থেমে গেল। সীতা চমকে ঈষৎ ত্রস্ত দৃষ্টিতে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল সামনের বাড়ির সদরে তারিণী আর নিরুপমা একটা টাঙা থেকে নামছে।

রাঘবন তারিণীকে দেখে বেশ কড়া সুরেই বললে— 'ব্যাপার কী। আমাদের এরকম ধোঁকা দেবার মানে?'

'ধোঁকাটোকা কিছু দিইনি। আপনাদের সঙ্গে শহর ঘুরতে বেরুলে কিছুই দেখা হত না। কথাতেই সময় নষ্ট হয়ে যেত। তাইতে আমরা দুজনেই একা একা ঘুরে এলাম।' তারিণী নির্লিপ্ত সুরে বলল।

'কালও কি এইরকম করার ইচ্ছে আছে নাকি?'—রাঘবন জিজ্ঞেস করে।

'কাল যদি আপনারা ঝিল দেখতে যান তো আমরাও যাব। এখানে এসে আমাদের তুলে নিয়ে যেতে পারবেন?' তারিণী জিজ্ঞেস করে।

'আনন্দের সঙ্গে। তবে আজকের মতন ধোঁকা না দিলেই হল। ধোঁকা দিলে আমার বড় রাগ হয়।' রাঘবন বলল।

এতক্ষণে সীতা বুঝতে পারল রাঘবন সারাদিন কেন উন্মনা হয়ে ছিল। রাত্তিরে সীতার আধ ঘণ্টার বেশি ঘুম হল না। সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে দেখল মাথার রগ দুটোয় ছিঁড়ে পড়ার ব্যথা। সে রাঘবনকে বলল— 'আজ ঝিল দেখতে যেতে পারব না। তাতে দিল্লী ফিরে যেতে হয় তাও ভাল।'

দুপুরে রাঘব জানতে চাইল—'তোমার মাথা কি সত্যি সত্যিই ব্যথা করছে?'

'মাথা কি আবার মিথ্যে মিথ্যেও ব্যথা করে নাকি? খুব প্রশ্ন তো।'—সীতা জবাব দেয়।

'আচ্ছা, তবে আমি চলি।'—বলে আর রাঘবন দাঁড়ায় না।

'তোমাকে কি যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ। প্রোগ্রাম যা হয়েছে সেটা তোমার মাথা ব্যথার জন্যে রদ করা যায় না।'

শুনে সীতার কান্না আসে। তবুও বুঝতে পারে রাঘবনের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। রাগ হজম করে বলে— 'নারীজন্ম যখন হয়েছে, তখন মাথা ব্যথার দোহাই দিলে আর কে শুনছে? এখানে একলা পড়ে মরার চেয়ে তোমার সঙ্গে গিয়ে মরাই ভাল।'

'তা হলে একটু তাড়াতাড়ি করে মরবে এসো।' রাঘব বলল।

কারে বসে দুজনেই চুপ করে থাকে। শুধু সীতা বারবার রুমাল দিয়ে চোখ মোছে।

কার এসে নিরুপমা-তারিণীর বাড়ির দোরে দাঁড়ায়। ওপর থেকে নিরুপমা হাতে তালি দিয়ে ওদের ওপরে ডাকে। বলে—'একটু ঘরে এসে বসুন। তারিণীর তৈরী হতে মিনিট দশেক লাগবে।'

সীতা বললে—'আমি কারেই বসে থাকছি। তুমি যাও। এ তো আমি নই যে এক মিনিট দেরী হলে রাগে আগুন হয়ে উঠবে। এখানে দশ মিনিট বসতে তোমার আপত্তি হবে না।'

'বাজে বোকো না'—বলতে বলতে রাঘবন গাড়ি থেকে তুড়ি লাফ মেরে নেবে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

কারে একা বসে বসে সীতার এক এক মুহূর্তকে এক এক যুগের মত লাগে। এইরকম কিছু অতিকায় মিনিট কেটে যাবার পর একসময় ওপরতলা থেকে 'খিলখিল' হাসির ধ্বনির শোনা গেল। সীতা কার থেকে বাইরে মাথা বের করে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে। কিছুক্ষণ অবদি হাসি আর কথার রেশ শোনা যায়। কিন্তু চোখে কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ একবার জানালার পাশে একটা দৃশ্যের এক ঝলক নজরে পড়ে।

রাঘব একটা খাম নিয়ে তারিণীকে দিতে যাচ্ছে। তারিণী সেটা নিতে অস্বীকার করছে। রাঘবন ঝট করে তার একটা হাত ধরে ফেলে জোর করে তার হাতে খামটা গুঁজে দিতে যায়। তারিণী কিছুতেই নেবে না, সে হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে। রাঘবন তার পেছনে দৌড়চ্ছে।

সবটা দৃশ্য আধমিনিটটাকের ব্যাপার। সীতার মনের লেন্‌সে তবু সেই ছোট্ট ছবিটা চিরকালের জন্যে স্থায়ী রয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে সীতা তার চিন্তাশক্তিই হারিয়ে ফেলে যেন। তার পরক্ষণেই একটা প্রচণ্ড রাগে ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে।

খানিকপরে শুধু তারিণী আর রাঘবনই সিঁড়ি দিয়ে নামছে, দেখা যায়। সীতা ভেবেছিল বুঝি নিরুপমাও যাবে। সেও হয়ত পেছনে আসছে। কিন্তু যখন সে এল না, গাড়ি চলতে শুরু করল, তখন সীতার ভেতরটা যেন কেমন অসাড় হয়ে গেল।

রজনীপুরের হ্রদ দেখলে মনে হবে নীল আকাশের এক খণ্ড যেন কেউ মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে। হ্রদের দুধারে পাহাড়ের সারি যেন প্রহরী প্রাকার। আর দুপাশে ঘন বুনোন গাছপালার রাশ, যেন সবুজ ফ্রেম দিয়ে নীল ছবিটা কেউ বাঁধিয়ে রেখেছে। কুরচি ফুলের স্তবকের মতন হাজার কয়েক সাদা পাখি ঝিলের নীল জলের বুক থেকে সার বেঁধে উড়ে চলেছে। এ দৃশ্য দেখলে ভোলবার নয়।

ওরা তিনজন কার থেকে নেমে ঝিলের পাড়ে এসে দাঁড়ায়। ঝিল

দেখে তারিণী বলে— 'আঃ কী সুন্দর। কতই তো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু এমনটি আর দেখিনি।'

'এইটে দেখাবার জন্যেই তোমাদের দুজনকে এখানে টেনে আনলাম। সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত লেকও এর তুলনায় ম্লান। তবু তোমাদের দেখাতে আনার জন্যে আমার প্রাণ আদ্ধেক বেরিয়ে গেছে।'—রাঘবন বলে।

সীতা নিঃশব্দে ঝিলের শোভা দেখতে থাকে। কিন্তু তার মন আর কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝিলের বুকছোঁওয়া ঠাণ্ডা বাতাসও তার গায়ে যেন আগুন ছড়ায়। সে লম্বা পা ফেলে ওদের পেছনে রেখে একা এগিয়ে যায়। দেখে তারিণী রাঘবকে বলল—'আজ আপনার স্ত্রীর কী হল? আমার মনে হয় ব্যথাটা কেবল মাথাতেই নয়, মনেও হয়েছে।'

রাঘবন বলল— 'আমি যদি জানতুম ও এরকম করবে, তবে কখনোই সঙ্গে আনতুম না।'

'মেয়েদের মনের কথা জানবার ক্ষমতা আপনার মনে হয় একেবারেই নেই। আমার যদ্দূর মনে হয় আপনার স্ত্রীর মনের ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে একা এখানে আসে।'

'ওকে একা এখানে এনে কি লাভ? ওর কথায় আমার মন ভরে না। আর আমার কথা ওর মগজে ঢোকে না।'

'সেটা কার দোষ? হয় আপনার ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের মনের মতন করে নেওয়া উচিত ছিল, নইলে যে আপনার সমান সমান শিক্ষাদীক্ষা পায়নি এমন মেয়েকে বিয়ে করাই উচিত ছিল না। আগে নিজে ভুল করে, তারপর এরকম কথা বলা মোটেই সাজে না।'

'ভুল আমার নয়, তারিণী, ভুল তোমার। তোমার জন্যেই আজ আমার এই দশা।'

'বাঃ চমৎকার! এরকম কথা দয়া করে দ্বিতীয়বার মুখে আনবেন না। চলুন আপনার স্ত্রী যেখানে বসে আছেন সেখানে গিয়ে বসি। নইলে ওঁর মনের কষ্ট আরো বাড়বে।'

'বাড়লে বাড়বে। আমি পরোয়া করি না।' রাঘবন জবাব দেয়। কিন্তু তারিণী যখন ওখান থেকে উঠে গিয়ে সীতার দিকে এগোল তখন তাকেও বাধ্য হয়ে উঠে যেতে হল। দুজনে গিয়ে ঝিলের পাড়ে সীতার পাশে এসে বসে।

পাড়ে কোন নৌকো ছিল না। কিন্তু ঝিলের মাঝখানে বেশ কয়েকটা নৌকো ভাসতে দেখা যাচ্ছে। ঝিলের মাঝখানে গাছ-পালার বাগান •ঘেরা কয়েকটা দ্বীপ। নৌকোগুলো সেই দিক লক্ষ্য করেই চলেছে। দ্বীপের মাঝামাঝি উঁচু গাছের মাথা ছাড়িয়ে একটা বড় প্রাসাদের আভাস দেখা যাচ্ছে।

'ও মহলটা কার?' তারিণী জিজ্ঞেস করে।

'ওটা এই রাজ্যের রাজার। শোনা যায় পরলোকগত রাজাসাহেব সারা জীবন ওখানে এসে বাস করে গেছেন। প্রচুর প্রমোদ উপকরণে ঠাসা জায়গাটা। তোমরা জান কিনা জানি না, বছর পাঁচ-ছয় আগে ঐ রাজা সাহেবকে বোম্বাইয়ে খুন করবার চেষ্টা হয়েছিল। খুন করতে চেয়েছিল একজন মেয়েমানুষ। চক্রান্তটা কেঁচে যায়। খবরের কাগজে জোর লেখালেখি হয়েছিল। রাজা অল্পের জন্যে বেঁচে যান। মহিলার দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায়। বছর দুয়েক হল অতিরিক্ত মদ্য পানের দরুন রাজার আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে।'

সীতা প্রথমে অন্যমনস্ক ছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ে রজনীপুরের রাজাকে খুন করার ষড়যন্ত্রের কথা কানে আসতে ও একটু সজাগ হল। প্রশ্ন করল—'খুন করবার চেষ্টা করেছিল যে মহিলা, সে কে?'

'ওহো। তুমিও শুনছ। সেই মহিলাটির বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। কেউ বলে হিন্দু, কেউ বলে মুসলমান। যেই হোক বড় সাংঘাতিক মেয়েছেলে। ভেবে দেখ একবার, দিনে দুপুরে খুন করার চেষ্টা করেছে যে মেয়েমানুষ, তার কতবড় বুকের পাটা।'

'তোমাদের বিচারে পুরুষ যতবড় অত্যাচারই করুক, তাকে কেউ

কোন বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু যদি কোন নারী তার প্রতিশোধ নিতে চায়, তো সেটা দোষের ব্যাপার হয়ে যাবে। চমৎকার পুরুষ মানুষের বিচার, চমৎকার নীতি!' সীতা বললে।

'আর চমৎকার তোমার মনোভাব। একটা খুনী মেয়েছেলের হয়ে ওকালতি করছ। এমন ওকালতি কে.থায় শিখলে?' রাঘবন ব্যঙ্গের সুরে বলল।

তারিণী মাঝখান থেকে বলে ওঠে— 'তারপর সেই মহিলার কী হল?' অনেকক্ষণ মৌন থাকার পর তার গলায় অদ্ভুত কাঁপন। খানিক আগে যেমন সীতার আওয়াজ কাঁপছিল, ঠিক তেমনি। রাঘবন সেটা খেয়াল না করেই বলে— 'কে জানে জেল থেকে বেরোবার পর কোথায় পড়ে মরেছে, কে তার খবর রাখে?'

একটা নৌকো পাড়ের দিকে আসছিল। পাড়ে লাগতে রাঘবন জিজ্ঞেস করল, 'কী, নৌকোটা ঠিক করব? ঝিলে বেড়াতে যাবে?'

তারিণী বলল— 'আমি রাজি। কিন্তু আপনার শ্রীমতী কী বলেন দেখুন। ওঁর মতটা নেওয়া দরকার।'

'উনিও যাবেন। না যেতে চান, পাড়ে বসে থাকবেন। আমরা ঘুরে আসব।' বলে রাঘবন নৌকো ভাড়া করতে এগিয়ে যায়। সে যাবার পর তারিণী সীতাকে প্রশ্ন করে— 'সীতা, তোমার গলার ঐ হারটা তোমাকে কে দিয়েছিল?'

'আমার মা। কেন? তোমার কি সন্দেহ আমি ওটা কোথাও থেকে চুরি করেছি?' সীতা কঠোর স্বরে প্রতিপ্রশ্ন করে।

'না না ছিঃ। এরকম শক্ত কথা কেন বললে ভাই? হারটা ভারী সুন্দর, অপূর্ব কারিকুরি। তাই জানতে চাইছিলাম যে কোথাকার তৈরী, আর কিছু না। তুমি এত রাগ করলে কেন?'

'না, আমি রাগটাগ কিছু করিনি।' সীতা অস্ফুট জবাব দেয়।

আঠারো

রাঘবন নৌকো ঠিক করে আসতে ওরা তিনজন গিয়ে নৌকোয় চড়ল। নৌকো ঝিলের জল কেটে এগিয়ে চলল।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ আকাশে কালো মেঘ ঘনঘটা করে এল। বাতাস বেগে বইতে লাগল। নৌবিহারের দিকেই সকলের মন, তাই আকাশের দিকে কেউ আর খেয়াল করল না।

ওরা যখন পাড়ে বসেছিল, তখন জলের ওপর হালকা হালকা ফুলের স্তবকের মতন ঢেউ উঠছিল, অনেকটা যেমন সাগরতটের বালিয়াড়ির কাছে ঢেউ ওঠে পড়ে, তেমনই। সে ঢেউ বড় নরম, তীরের মাটি ছুঁয়ে আবার জলের বুকেই চুপচাপ শান্ত হয়ে ফিরে আসে। মিলিয়ে যায়।

ওরা যখন ডিঙিতে সওয়ার হয়ে ঝিলের মাঝখানে গেছে, ততক্ষণে ঢেউয়ের চেহারা বদলে গেছে। কয়েক ফুট উঁচু ঢেউ গর্জন করে ফণা আছড়াচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনার পুঞ্জ। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঠোকর লাগছে। সমুদ্রের মত হা-হা গর্জন উঠছে। পাড় থেকে দ্বীপ লক্ষ্য করে ডিঙি এগোবার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ঝোড়ো হয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের উচ্চতা আরও বাড়ছে। ঢেউয়ের ছলছল শোনা যাচ্ছে না। নৌকো ঘনঘন দুলছে।

নৌকোর মাঝি নিজের ভাষায় কী যেন বলল। সীতা ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে চারদিকে চাইছে। হঠাৎ 'মাগো, আমার বড় ভয় করছে' বলে ফুঁপিয়ে উঠল।

রাঘবন কড়া ধমক দিয়ে ওঠে, 'সীতা থামো! বোকার মতন কান্নাকাটি কোরো না।'

তাতে সীতার ব্যাকুলতা আরো বেড়ে যায়। আর্তনাদ করে বলে—'মাগো, তোমার কথাই ফলল। আমি জলে ডুবে মরে যাচ্ছি।'

রাঘবন বিচলিত হয়ে ওঠে। তারিণী'ক বলে—'ওকে একটু বোঝাও না।'

তারিণী বলল— 'বুঝিয়ে কোন লাভ নেই, মিস্টার রাঘবন। মনে হচ্ছে আপনার স্ত্রীর হিস্টিরিয়া হয়েছে। মাঝিকে বলুন তীরের দিকে নিয়ে চলুক।'

রাঘবন জোর গলায় মাঝিকে বলল— 'পাড়ে ভেড়াও।'

'কোন ভয় নেই সাহেব।'—মাঝি অভয় দেয়।

'মাঝি ফিরবে না। ওকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে।' সীতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

'যা তা বোলো না সীতা, মুখের রাখঢাক নেই তোমার।'

রাঘবন বৌকে বকে, মাঝিকে ধমকায়—'এখনই ডাঙার দিকে নিয়ে যাবে কিনা আমি জানতে চাই।'

'ঠিক হ্যায়, সাহাব্'—মাঝি রাজি হয়।

ইতিমধ্যে সীতার ফোঁপানি আরও বেড়ে যায়। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে—'মা, মাগো যা বলেছিলে তাই হল।'

তাই দেখে তারিণী রাঘবনকে বললে—'হিস্টিরিয়ার তীব্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি পাশে এসে বসুন। একটা হাত ধরে থাকুন।' বলে সে নিজেই সীতার একখানা হাত শক্ত করে ধরে। সীতা জোরে ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। নৌকো আগে থেকেই দুলছিল, এখন ভীষণ বেগে দুলতে থাকে। রাঘবন উঠে সীতার দিকে যাচ্ছে, এমন সময় একটা প্রবল ঢেউ এসে নৌকোর ওপর আছড়ে পড়ল। নৌকো এমন হেলে পড়ল যেন এখনই উলটে যাবে। রাঘবন টাল সামলাতে না পেরে নৌকোর খোলেই পড়ে গেল।

'মা গো !' বলে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে সীতা জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীও আর্তনাদ করে ওঠে—'মাগো'।'

নৌকো উল্‌টে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। মাঝি নিজের ভাষায় বিড়বিড় করে কী বকছে। জলমগ্ন সীতা একবার জলের ওপর ভেসে উঠল। একবার মাথা তুলে 'মা' বলে চীৎকার করে উঠল। হাওয়ার তীক্ষ্ণ শন্‌শন্‌ আর ঢেউয়ে গোঙানি ছাপিয়ে তার আর্তনাদ কানে এল। তারিণী আর রাঘবনের বুকে সে চীৎকার শেলের মত বিঁধল।

রাঘবনের মনে এক লহমার জন্যে একটা ভয়াবহ চিন্তা উঁকি দিয়ে গেল—'এই কি তবে অদৃষ্ট ! সীতা যদি মরে যায়, তবে…?' রাঘবন তার বিকৃত চিন্তার গলা টিপে মারল, তাকে মাথা তুলতে দিল না। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে মাঝিকে হাঁক দিল। বোধহয় তাকে ডুবন্ত সীতার কাছাকাছি নৌকো নিয়ে যাবার হুকুম দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে তারিণী জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল আর ক্ষিপ্রগতিতে সাঁতার কেটে সীতার দিকে চলল।

'হো-ও-ও' একটা প্রবল শব্দ সীতার কানে গেল। একবার মাত্র। ব্যস আর কোন শব্দ নেই। ডুবতে ডুবতে সীতা ভাবল 'এ কীসের শব্দ ?'… ভেবে পেল না। পরক্ষণেই মনে এল— তবে কি এ সেই ঢেউয়ের গর্জন, যার কথা বলে মা বার বার তাকে সতর্ক করে দিত ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেই শব্দ। যে শব্দ তার ভেতরে পর্যন্ত তোলপাড় করে দিচ্ছে। জলের ওপর শব্দের যা জোর, জলের তলায় তার শতগুণ বেশি। তবে কি আর বাঁচব না ? মার কথা কেন শুনিনি ?… আর এখন ভেবেই বা কী হবে ?… মাথায় এইসব অসংলগ্ন চিন্তার বোঝা নিয়ে সীতা একবার ভাসছে, আবার ডুবছে…মরণের সঙ্গে যুঝছে… ঠিক এমনি সময় কার একখানা হাত তার হাতে লাগল। এ কার হাত ? তবে কি… হঁ্যা এ মারই হাত নিশ্চয়ই ! মা যে বলেছিল, 'বিপদে পড়লে আমি এসে তোকে বাঁচাব।'…

জলে ডুবতে ডুবতে মনে যেসব ভাবনা এসেছিল, একে একে সেগুলো আবার তার স্মৃতিতে আসছে। কিন্তু এত চেষ্টা করেও কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না কেন সীতা ? কেন ?

কারা যেন কথা বলছে ! কার গলা ? কে কী বলছে ? আঃ ঢেউয়ের জ্বালায় কি কিছু শোনবার জো আছে ?

'আপনার স্ত্রীর জ্ঞান ফিরে আসছে। শীগ্যিরই চোখ মেলবে।'

'তোমার জন্যেই সীতার প্রাণ বাঁচল। তুমি সীতার পুনর্জন্ম দিলে। তুমিই ওর এই জন্মের মা।'

'তা আমি যদি সীতার মা হই, তা হলে আপনি আমার জামাই হলেন। মন্দ নয় : তা জামাইমশাই, সীতার জ্ঞান ফিরে আসছে। এই বেলা ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বসুন। স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি ফিরে এলে যদি দেখে ও আমার কোলে শুয়ে আছে, আর আপনি ঠাটসে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার পোশাক এক ফোঁটা ভেজেনি, যেমনকার তেমনি রয়েছে, তাহলে আর জীবনে আপনাকে ক্ষমা করবে না।'

'তুমি জান না তারিণী। আমাদের দক্ষিণের মেয়েরা যে কী অসম্ভব ক্ষমাশীলা, যে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।'

কথোপকথনের সব কথা সীতার বোধে আসছিল না। তবে জলে ডুবে যাওয়ার আগেকার সব ঘটনা এখন ওর মনে পড়ছে। ও জানতে পেরেছে যে ও জলে পড়ে ছটফট করার পর তারিণীই ওর জীবন রক্ষা করেছে। ও যে এখনো তারিণীর কোলেই শুয়ে রয়েছে, সেটাও অনুভব করতে পারছে। এখন এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারল যে রাঘবন যখন দক্ষিণভারতের নারীদের ক্ষমাশীলতার কথা বলছে, সেই ফাঁকে তারিণী ওর মাথাটা সন্তর্পণে নিজের কোল থেকে রাঘবনের কোলে তুলে দিল।

'সীতা ! সীতা !' নাম ধরে ডাকতে ডাকতে রাঘবন সীতার চোখের পল্লবে আলতো করে হাত ছোঁয়ায়। ত্বরিতে সীতা চোখ মেলে।

'সীতা, আমাকে চিনতে পারছ? ভাল করে দেখ তো।'—রাঘবন বলল।

সীতা অতি মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়— 'চিনব না কেন? আপনি মিস্টার সুন্দর রাঘবন, এম.এ.।'

'বাঃ বাঃ এই তো। আচ্ছা, আর ইনি, তোমার সামনে, ইনি কে?'

'আমি আমার মাকে চিনি না?'

এ কথা শুনে রাঘবন একটু যেন চমকে ওঠে। এটা কি বিকারের লক্ষণ? নাকি খানিক আগে তারিণীর সঙ্গে ওর কথাবার্তা সীতার কানে গেল।

সীতা ঝট করে রাঘবনের কোল ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর ওদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তারিণীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, তারপর তারিণীর হাত দুটো নিজের দুর্বল দুহাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বলে—

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। এখন থেকে আমার এই নতুন পাওয়া জীবনে তুমিই আমার মা!'—সীতা উচ্ছল হয়ে ওঠে। মরণের নিশ্চিত আলিঙ্গন থেকে ফিরে আমার আনন্দে, নতুন করে বেঁচে ওঠার এই অনাস্বাদিতপূর্ব জীবনের আস্বাদনের আনন্দে বিভোর হয়ে যায়। জীবন কী সুন্দর! সামনের নীল ঝিলমিল হ্রদ, সবুজভরা গাছ, মেঘশুভ্র পাখির ঝাঁক...নয়াদিল্লীর আস্তানায় রেখে আসা ফুলের মত ওর সন্তান··· এই জীবন। এই আনন্দমুখর পৃথিবীর জীবনকে কেন মানুষ মিছিমিছি দুঃখবহ করে তোলে? মানুষ কী মূর্খ!···

ওরা দেওয়ান প্রাসাদে পৌঁছে দেখল দেওয়ান সাহেব তাঁর সফর সেরে ফিরে এসেছেন। ঝিলের দুর্ঘটনার কথা শুনে দেওয়ান এবং তাঁর মেয়েরা বিশেষ উদ্‌বিগ্ন ও বিচলিত হলেন। তারিণীর অসম সাহসিক কাজের ভূরিভূরি প্রশংসা করলেন। দেওয়ান সাহেব তো বিশেষ রকম অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তারিণীকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানালেন, সে যেন তার বান্ধবীকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে

অন্ততঃ দুটো দিন কাটিয়ে যায়। মেয়েরাও বিশেষ পেড়াপীড়ি করতে লাগল। সীতাও খুব জোর করতে লাগল। তাদের কথা ফেলতে না পেরে তারিণী আর নিরুপমা দেওয়ান-মহলে এসে উঠল। বাড়ি গুলজার হয়ে উঠল। ঐ দুটি দিনের মধ্যে সীতা আর তারিণীর মধ্যে অভিন্ন সখিত্ব চিরস্থায়ী হয়ে গেল। তা দেখে রাঘবনের খুশির সীমা রইল না। সীতার মনে যে কালচে মেঘের দল জমেছিল, সেটা এই দুদিনের অকৃত্রিম-খুশির ঝড়ে কোথায় ভেসে গেল।

দিল্লী ফেরার সময় এল। তার আগের দিন, একান্তে সীতাকে নিয়ে তারিণী বলল— 'সীতা, সেদিন তোকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, তুই জবাবটা এড়িয়ে গিয়েছিলি। তখনো আমি পর ছিলুম। কিন্তু আজ তো আমাকে তোর বলতে আপত্তি নেই। রত্নহারটার রহস্য কী রে, আমায় বলবি ?'

'আমি নিজে থেকেই তোমায় বলব ভাবছিলাম। এখানে আসার পর থেকেই কেন জানি না বারবার আমার ঐ কথাটাই মনে উঠছে।'

'এখানে আসার পর থেকে কেন? এই শহরের সঙ্গে তোর রত্নহারের কী সম্পর্ক ?'

'সরাসরি কোন সম্বন্ধ হয়তো নেই। কিন্তু স্মৃতির পরম্পরায় কোথায় যেন খুব একটা নিবিড় সংযোগ রয়েছে। তুমি শোন। শুনলে বুঝবে।'

রত্নহার পাওয়ার সমস্ত ইতিবৃত্ত তারিণীকে শোনানোর পর সীতা বলল— রোগশয্যায় তার মার হাতে, তারই বিয়ের জন্যে টাকা আর রত্নহার উপহার দিয়ে গিয়েছিল যে-মহিলা; ফেলে যাওয়া ছুরিটা নিতে এসে ওকে দেখে যে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে আদর করেছিল— এক মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখলেও তার মুখটা ও কোনদিন ভোলেনি। বলল, মামার সঙ্গে ওর মাকে নিয়ে ট্রেনে বসে যখন খবরের কাগজে রজনীপুরের হত্যার কেসে ধৃত এক মহিলার কথা শুনল, তখনই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল ওর মনে—হয়তো ইনিই সেই।···

'জানো তারিণীদি, এখন আর ঠিক সন্দেহ নয়। আমার কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গেছে যে একই লোক। যে আমায় হার দিয়েছে, সেই রাজাকে মারতে গিয়েছিল। রজনীপুরে এসে ইস্তক আমার তাঁর কথা মনে পড়ছে। তারপর আবার উনি সেদিন যখন গল্প করতে গিয়ে আমার স্মৃতিকে উসকে দিলেন; তখন আমি শিউরে উঠলুম। তোমার কী মনে হয়?' সীতা বলল।

তারিণী বলল—'তোমার সন্দেহ বল, অনুমান বল, হয়তো সেটা সত্যিও হতে পারে। তবে যাই হোক-না কেন, এসব কথা আর কাউকে না বলাই ভাল। তোমার স্বামীকে কিছু বলেছ নাকি, কখনো?'

'না বলিনি। বললেও তিনি কান দেবেন না।' সীতা বলে।

'তোমার মায়ের দেওয়া এই আশীর্বাদী হারটা খুব যত্ন করে রেখো। তোমার মার নাম কী সীতা?'

সীতা মার নাম বলে। মা-বাবা সম্পর্কে আরো অনেক কথা হল দুজনে।

তারিণী জানতে চাইলে— সীতার বাবা এখন কোথায়? তাকে দেখতে আসেন কিনা।

সীতা বললে, 'মা তো মারা গেছেন। বাবাও বেঁচে আছেন কিনা কে জানে। এসেছিলেন একবার বহুদিন আগে। তারপর থেকে কোন খোঁজখবর নেই। থাকবার মধ্যে এক মামাতো বোন আছে— ললিতা। আপন বলতে পৃথিবীতে এক ও-ই আছে। আমার বড় প্রিয় বন্ধু। আর এখন পেলুম তোমাকে।'

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। তারপর তারিণী বলে— 'আচ্ছা সীতা, তোমার মাও কি সেই উপকারিণী মহিলার পরিচয় জানতেন না? তিনি কোনদিন কিছু বলেননি তোমায়?'

'না। আমার মনে হয় মাও তাকে চিনত না। নইলে আমায় বলত ঠিক।'

'আর কখনো তাকে দেখনি।'

'দেখেছি। একবার।'

'কোথায় দেখেছ? কবে?'—তারিণীর কণ্ঠে ব্যগ্রতা।

সীতা দিল্লীতে ওদের পাড়ায় দেখা ছুরি হাতে সেই মহিলার কথা তারিণীকে বলল।

'শোন্।'—তারিণী বলে, 'আমিও অনেকদিন থেকে তাকে খুঁজছি। কিন্তু কোনদিন আমার নজরে পড়ল না।'

'বল কি। তুমি তাকে খুঁজছ? কেন? তোমার পরিচিত?'

'হ্যাঁরে। সীতা। খুবই পরিচিত।'

'কী করে পরিচয় হল?'

'ঐ মহিলা আমার মা।'

—এ্যাঁ! সীতা বিস্ময়ে পাথর হয়ে যায়। অবাক হয়ে তারিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর বলে—'ও। তাই তোমার চেহারাটা আমার চেনা চেনা লাগত। এবার রহস্যটা বুঝলাম।'

'কিছুই বুঝিসনি। তুই যা ভাবছিস তা নয়। আমার গর্ভধারিণী মা নন উনি, আমার ধাই-মা। আমায় মানুষ করেছেন। আমার আসল মা-বাপের কোন সন্ধান আমি আজো জানি না। সেই জানার জন্যেই আমি রাজিয়া বেগমকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।' তারিণী বললে।

'রাজিয়া বেগম! ওঁর নাম? মুসলমান তাহলে?'

'হ্যাঁ, আমার ধাই-মা মুসলমান। চারবছর আগে আমি যখন বিহারে ভূমিকম্প পীড়িতদের সেবার কাজ করছি, সেই সময় খবর পাই—রজনীপুরের রাজাকে হত্যা করার চেষ্টায় ধরা পড়ে রাজিয়া বেগমের দু'বছর জেল হয়ে গেছে। জেল থেকে বেরোবার পর আমি অনেক খুঁজেছি। কিন্তু কোন খবর পাইনি। আমারও ভাগ্যটা খুব খারাপ, সীতা।'

শুনে সীতার চোখ ছলছল করে। রুদ্ধ স্বরে বলে—'তারিণীদি, এবার যদি কখনো তার সঙ্গে দেখা হয়, তোমায় ঠিক খবর দেব।'

‘হ্যাঁ, তাকে বোলো, আমি তাকে দেখতে চাই। আর সে যদি দেখা করতে না চায়, তবে বোলো আমি আত্মহত্যা করব।’

সীতা চমকে ওঠে। বলে, ‘ছিছি। ওরকম কথা বোলো না তারিণীদি। আমি যে পুরোপুরি তোমার ভরসায়ই বেঁচে আছি।’

উনিশ

'প্রিয় বোন সীতা !

তোমার স্নেহমাখা পত্র পেলাম। তোমাদের আগরা-ভ্রমণ, তাজমহল আর অন্যসব দর্শনীয় জায়গা দেখার বিস্তৃত বিবরণ পড়ে খুব খুশি হলাম। তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে আমিও যেন তোমাদের সঙ্গে ঘুরে এসেছি। ওঁকে অপরাধের মধ্যে বলেছিলাম, তোমাদের তাজমহল বেড়ানোর কথা, বলেছিলাম—আমরাও যদি যেতে পারতুম বেশ হত, না ? কাকে বলি এসব কথা ! সবসময়ই আমার কথা কেমন উপেক্ষা করে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। বললে, আমাদের তামিলনাদেই কত সুন্দর সুন্দর দর্শনীয় জায়গা রয়েছে। আমরা তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির মাল্লাপুরমের শিলা-শিল্প এসবই বড় দেখেছি, যে তাজমহল না দেখলে ভারী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ! কেন ওকে বলতে গেলুম, এই ভেবে এখন আপসোস হয়। আমাদের কথা শাশুড়ির কানে যেতে তিনিও ছ্যারছ্যার করে কত কথা শুনিয়ে দিলেন—হ্যাঁ লোকে কাশী-রামেশ্বর তীর্থস্থানে যাবার কথা বলে, তাও বুঝি। যে পরলোকের একটা রাস্তা হলেও হতে পারে। তা নয়, তুর্কী রাজার তৈরী গোরস্তান দেখতে যাবার বায়না। ছি ছি ছি, আজকালকার মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধি যে কিসে লোপ পাচ্ছে—কে বলবে ?' সেই কথা নিয়ে আমায় উঠতে বসতে খোঁটা দিচ্ছে।

আমাদের সামনের বাড়িটা দামোদর পিল্লাই বলে এক ভদ্র-লোকের। তিনিও উকীল। একসময় আমার শ্বশুরের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। দামোদরম বাবুর ছেলে আর আমার ইনিও

খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের সূর্য যখন দেবপট্টনমে পড়ত, তখন তিনজনেই একসঙ্গে ওঠাবসা করত। অমরনাথের বছর কয়েক হল বিয়ে হয়েছে। অমরনাথের বৌ তিরুনেলবেলীর মেয়ে, খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে। তার বাবা ডেপুটি কালেক্টর। এত যে লেখাপড়া জানে তা মেয়েটার এতটুকু দেমাক নেই। খুব ভাল মেয়ে। বিয়ের সময়েই আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। একবছর আগে ও শ্বশুরবাড়ি এসেছে। সেই থেকে আমার সঙ্গে ওর খুব ভাব জমে গেছে। আমাদের বরেরাও তাতে খুব খুশি।

কিন্তু ভাই সীতা, এখন এসব অতীতের গল্পকথা হয়ে গেছে। কেন জানিস? মাঝখানে এখানে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন হয়ে গেছে, আমি তখন রাজমপেট্টাইয়ে ছিলুম। এসে সব কাণ্ড শুনলুম। আমার শশুরের আর এক বন্ধু রাজারাম আয়ার। তিনিও দাঁড়িয়েছিলেন। শ্বশুরমশাই তাঁর হয়ে ভোটের কাজ করেছিলেন। একদিন বুঝি কোন সভায় তিনি দামোদর বাবুকে ফিরিঙ্গিদের পেটোয়া বলেছেন। আবার তার জবাবে দামোদর বাবুও আমার শ্বশুরের নামে কিছু ব্যঙ্গ করে কথা বলেছেন। ব্যস, আর কী চাই? তাই নিয়ে ঝগড়া, দুই বাড়িতে যাতায়াত, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এতদিনের এত বন্ধুত্ব, সব উবে গেল। জ্বালা আমাদের। একটা কথা বলবার লোক নেই। যাও একজন জুটেছিল কপালে সইল না। একটু এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া-আসা হত। তাও বন্ধ। এখন বাড়ির জেলখানায় পচা ছাড়া আর কী করব!

একে নিজের জ্বালা, তায় সূর্যর কথা যখন ভাবি, তখন আরো কষ্ট বাড়ে। গাঁ ছেড়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে সুদূর দিল্লীতে গিয়ে পড়ে আছে বেচারা। কেমন আছে, কী করছে, কোথায় থাকে কী খায় কিছুই জানি না। এই হালে একটা চিঠি দিয়েছে। লিখেছে কিছু টাকা পাঠাতে পারলে পাঠাস। কাছে না থাকলে বরের কাছ থেকে চেয়ে দিস। টাকাপয়সার জন্য মরে গেলেও বাড়িতে

জানাবে না। বাবা টাকা পাঠালে ও নেবে না, লিখেছে ফেরত দিয়ে দেবে। এমন ছেলে দেখেছ কোথাও? আমার মুখ চেয়ে তুই একটু সূর্যকে দেখিস। তাকে একটু যত্নআত্তি করিস।

কামনা করি, বাসন্তী বেঁচে বর্তে থাক, চাঁদের কলার মতন রোজ দিনেরাতে তার বাড়বাড়ন্ত হোক। মেয়েটাকে সবসময় হাসিখুশি রাখিস তো?

তোরই ললিতা।'

চিঠি পড়া শেষ করে সীতা ঘড়ির দিকে তাকায়। রাত সাড়ে আটটা। এখনো বাড়ি ফিরল না কেন? মেয়েটাকে নিয়ে একলা থাকি—জানে। তবু এত দেরী করছে?

সীতা আর তার মেয়ে বাড়িতে সত্যিই একলা আছে আজ কিছুদিন। জুনের শুরু। দিল্লীর তাপমাত্রা একশো দশ ডিগ্রী ছাড়াচ্ছে। দিনের বেলায় বাইরে বেরোতে হলে মনে হয় গনগনে ইঁটের ভাঁটায় পড়লুম। রাত্তিরে ঘরের ভেতর জ্বলন্ত চুল্লীর দহন। কী দিন কী রাত বাতাস আগুন ওগরাচ্ছে। বড় লাটসাহেব এবং তার অধীনস্থ শাসকীয় বর্গের মাথা মাথা লোকেরা তাঁদের মূল্যবান মাথাকে গরম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে শিমলা পর্বতের শীতল শৃঙ্গে চলে গেছেন।

রাঘবন-সীতারও যাবার কথা ছিল। কামাক্ষী দেবী বলেছিলেন যে ওঁর পার্বত্য আবহাওয়ায় স্বাস্থ্য টেঁকে না। এই সময় দেশ থেকে চিঠি এল যে তাঁর ভাইঝির বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। কাজেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেছেন, একমাসের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

কিন্তু একটা জরুরী কাজের চাপ এসে পড়ায় সেবার আর রাঘবনের সিমলা যাওয়া হল না। রাঘবন সীতাকে বললে, 'তুমি যাও তো মেয়েকে নিয়ে ঘুরে এসো-না। কত মেয়েই তো একা একা যাচ্ছে। ভয়ের তো কিছুই নেই।'

কিন্তু সীতা পষ্ট জবাব দিয়েছে— 'তুমি না গেলে আমিও

যাব না। তোমাকে ছেড়ে গিয়ে আরামে থাকা আমার পোষাবে না।'

সেদিন চাকরানীও কাজ করতে আসেনি। তাই বিকেল থেকেই সীতা মেয়েকে নিয়ে একলা বাড়িতে রয়েছে। আটটা পর্যন্ত বাসন্তী সমানে জিজ্ঞেস করেছে—'বাবুজি কখন আসবে?' তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। ও ঘুমোবার পর সীতার আরো বেশি একলা লাগছে।

সেদিন আপিসে যাবার সময়ে রাঘবন বলে গিয়েছিল যে আজ যেমন করেই হোক সূর্যকে খুঁজে বার করে তাকে হাত-কড়া দিয়ে বেঁধে আনবে। হয়ত সেইজন্যেই দেরী হচ্ছে ফিরতে!

সীতা ভাবল ললিতার চিঠির উত্তর লেখা যাক। তাহলে একলা থাকার অস্বস্তিটা খানিক কাটবে। ললিতা ছাড়া ওর আর আপনার বলতে কেই বা আছে? সীতা চিঠি লিখতে শুরু করে:

প্রিয় বোনটি ললিতা,

তোমার বিস্তারিত পত্র পেয়ে খুব আনন্দ পেলাম। দেবপট্টনমের নির্বাচনের কথা পড়ে বেশ মজা লাগল। তবে ইলেক্‌শনের দৌলতে তোমাকে একজন ভাল সখিকে হারাতে হল— এই যা দুঃখু।

তিন সপ্তাহ আগে ওঁর সঙ্গে ভাইসরয়ের প্রাসাদে গার্ডেন পার্টিতে গিয়েছিলাম। আহা! কী সুন্দর বাগান। তার কী বর্ণনা দেব! ফুলে ফুলে ভরপুর, গাছে গাছে ভরাট! গাছপালার আড়াল দিয়ে লুকোচুরি খেলার মতন 'জ্বলছে নিবছে' রঙীন আলোর বাহার। ওখানে যাঁরা এসেছিলেন— সবাই বড় বড় লোক। তাঁদের কী পুরুষ, কী মহিলা— যেমন রূপ, তেমনি সাজপোশাক, তেমনি অলংকারের জাঁকজমক! এক মুখে বলা যায় না রে ললিতা! গোরাদের বৌদের জমকাল কালো পোশাক আর দিশি মেয়েদের পরনে আমাদের প্রথামত রঙবেরঙের সুন্দর শাড়ি। সে এক-একটা শাড়ি এক-একরকম বাহারের নমুনা। তাদের গয়নার যে কত

বাহার, কী বলব। যেদিকে তাকাও যেন ঝিলিক দিচ্ছে। আমি ভাই দেখেশুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। রজনীপুরের দীওয়ানের তুই মেয়েও এসেছিল। অভ্যাগতদের অনেকেরই সঙ্গে ওদের বেশ চেনাশোনা দেখলুম। আমার সঙ্গেও ওরা অনেকের পরিচয় করিয়ে দিল। গোরাদের একটা বিশেষত্ব, পরিচয় হলেই ওরা 'হাউ ডু য়ু ডু?' ব'লে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করবে। জানিস ললিতা, আমরা যতই ওদের নিন্দেমন্দ করি, ওদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে।

দেবপট্টনমে নির্বাচনের কথা তুই লিখেছিস। নির্বাচন ইংরেজদের দেশেও হয়। কিন্তু ফলাফল বেরোবার পর, সবচেয়ে আগে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিনন্দন জানায়, সম্মান জানায়, তার প্রশংসা করে। আর আমাদের দেশে বিপক্ষ যদি জিতে গেল তো ব্যস, চিরজীবনের শত্রু হয়ে গেল। একি মূর্খতা বল তো?…'

হঠাৎ সীতার চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে যায়, কল থেকে জল পড়বার আওয়াজ আসছে। আওয়াজটা আসছে স্নানঘর থেকে। সীতার হৃৎস্পন্দন থেমে যায়। পা তুটো ভারী হয়ে, অবশ হয়ে পড়ে। পাথরের মতন অনড় হয়ে যায়। —কেউ ভেতর দিকের কলঘরে গেছে। নইলে জলের কল খুলল কী করে! কিন্তু এঘর দিয়ে না গেলে গেল কী করে? তার মানে ওর নজর এড়িয়ে কেউ ভেতরে গেছে। কে হতে পারে?

বহুকষ্টে ভয়কে সংযত করে পা তুটোকে টেনে টেনে চানঘরের দোরে নিয়ে গেল। দেখতে হবে কে? কলঘরের দরজা ভেতর থেকে ভেজানো, ছিটকিনি দেওয়া নেই। কম্পিত হাতে সীতা দোরে ধাক্কা দেয়। ভেতরে কল বন্ধ হয়ে গেল। সীতা সাহস সঞ্চয় করে বলল—'ভেতরে কে?'

চানঘরের ভেতরে পদধ্বনি শোনা গেল। এক-একটা পদক্ষেপের

সঙ্গে সীতার হৃৎপিণ্ডে ন-দশটা করে স্পন্দন উঠছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ··· । দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল।

খোলা দরজায় একজন দাঁড়িয়ে, হাতে ধারালো ছোরা। 'সীতা, তুমি আমাকে চেন?'

সীতার মুখে রা সরে না, গলা কাঠ; ইতিবাচক ঘাড় নাড়ে।

'বল তো আমি কে?'

সীতা নিজের গলায় হাত দেয়, রত্নহারটা ছুঁয়ে বলে—'আপনি এটা দিয়েছেন।'

'বাঃ বড় ভাল মেয়ে তো তুমি। তোমার স্মরণশক্তি খুব প্রখর। এই বাড়িতে তুমি একলা থাক, না তোমার সঙ্গে আর কেউ থাকে?'

সীতার জবাব দিতে দেরী হয়। ইতিমধ্যে আর একটা জিনিস নজরে পড়ে ও অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। মহিলাটির কোমর থেকে সাদা রুমাল ঝুলছে—সেটার আধখানা রক্তে লাল। সীতা নিশ্চল হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'খুন! রক্ত!' তারপর হাহা করে কেঁদে ওঠে।

মহিলা দুপা এগিয়ে এসে সীতার কাঁধে হাত রেখে তাকে বার দুই ঝাঁকুনি দেয়। তারপর তার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি ফেলে বলে—'দেখ সীতা, আমি তোমাকে বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম। এখন দেখছি তুমিও অন্য মেয়েদের মতই মূর্খ। এরকম কান্নাকাটি চেঁচামেচি যদি করতে থাক, তবে কী করব জান? খানিক আগেই রাস্তার ওপরে একটা ক্ষেপা কুকুরকে যেভাবে এই ছুরি দিয়ে সাবাড় করেছি, তোমাকে ঠিক অমন করে নিকেশ করব।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সীতার ফোঁপানিও থেমে যায়।

'মনে হচ্ছে তুমি রক্ত দেখলে বিচলিত হয়ে পড়। একটু দাঁড়াও। কলের জলে ধুয়ে আসছি।'

ব'লে মহিলা আবার কলঘরে গিয়ে কল খুলে রুমাল ধুতে থাকে। সীতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে।—'পাগলা কুকুরকে মেরেছে? সত্যি নাকি! তা বেশ তো। তা এত জায়গা

থাকতে আমার বাড়িতে কেন ? আমি এখানে থাকি জেনেই এসেছে, নাকি কাকতালীয়··· ? এখন যদি ও এসে পড়ে তো কী হবে ! কোনমতে মিষ্টি কথায় উনি আসার আগেই বিদেয় করে দিতে হবে। যদি যেতে না চায় ? হে ভগবান। আমি কি পাগল হয়ে যাব ? এবাড়িতে কেন এল ? আর কোথাও যেতে পারল না ?'

ইতিমধ্যে মহিলা আবার ফিরে এলো। সীতার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে, চানঘরের সামনে যে ঘরটা ছিল সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্লল—'এ ঘরে কী থাকে ?'

'কাঠ, কয়লা টুকিটাকি জিনিসপত্র'— সীতা জবাব দিল।

ঘরটা খুলে দেখে মহিলা বলে—'ঠিক আছে। আজ রাত্তিরে আমি এই ঘরেই পড়ে থাকব। কারুর কানে যেন না ঢোকে। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দেবে।'

'এ ঘরে কী করে শোবেন ? হাওয়াও ঢোকে না। তাছাড়া চারদিকে জঞ্জাল ছড়ানো।'

'কিছু ভেবো না সীতা। এর চেয়ে ঢের খারাপ জায়গায় থাকা আমার অভ্যেস আছে।'

শুনে সীতার মনটা নরম হয়ে গেল। এই স্ত্রীলোকটির জীবনে যা যা ঘটে গেছে, ও যা যা কল্পনা করেছে— সব কথা মনে পড়ে যায়। —'মানুষটা সারাজীবন বহু দুর্ভোগ ভুগেছে। আর সম্ভবতঃ সেই-সমস্ত কষ্টের আর যন্ত্রণার মূলে ছিল রজনীপুরের রাজা। কিন্তু কী সেই দুর্ভোগ, কিসের যন্ত্রণা ?'—সীতার তীব্র কৌতূহল হয় জানবার। এর কাছে জানতে চাইবে ?··· কিন্তু এটা তার উপযুক্ত সময় নয়। যে-কোন মুহূর্তে স্বামী বাড়ি আসবেন। ফিরে যদি একে দেখেন তো পাগলী বলে গলাধাক্কা দেবেন।

'আমি একটা বালিশ আর বিছোবার কিছু এনে দিচ্ছি'—সীতা ক্ষিপ্র পায়ে ঘর থেকে বালিশ-বিছানা এনে দেয়। কী একটা কথা ও অনেকক্ষণ ধরে মনে করতে চাইছিল কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছিল না। এবার মনে পড়েছে। তারিণীর অনুরোধ। সীতা মহিলাকে বললে—

‘আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?’

‘যা জিজ্ঞেস করবে তাড়াতাড়ি কর। আমি খুব ক্লান্ত।’

‘আপনার নাম কী ?’

‘তোমার তাতে কী দরকার ?’

‘আপনি না বললেও আমি জানি।’

‘জান !···কী জান, বল তো শুনি।’

‘রাজিয়া বেগম !’

চোখে রাগ এবং বিস্ময় নিয়ে মহিলা সীতার দিকে তাকায়। বলে— ‘আমার ঝুটো নাম। আমার আসল নাম রমামণি। বিশেষ প্রয়োজনে আমি রাজিয়া বেগম নাম নিয়েছিলাম। কেউ সেই নামটা তোমাকে বলেছে। কে বলেছে ? সেই মুখ্যু বামুনটা বোধহয় ?’

মুখ্যু বামুনটা কে সীতা বুঝতে পারল না। মুখ ফস্‌কে বলেই ফেলল— ‘আর কেউ নয়, আপনার মেয়ে তারিণীই বলেছে।’ রাজিয়া চমকে উঠে সীতার দিকে তাকায়। বলে—‘তারিণী বলেছে ? সত্যি ? তাকে তুমি কোথায় কবে দেখলে ?’

‘দিন কয়েক আগেই। আমরা একসঙ্গে আগ্রায় ছিলাম।’

‘তারপর ?’

‘আগ্রা থেকে রজনীপুর যাই···’

সম্ভবতঃ মহিলার মনের ভেতর তোলপাড় করছিল। কিন্তু মুখে তার কোন আভাস ফুটতে দিল না। দারুমূর্তির মত অভ্যস্ত নির্বিকার মুখে সে বসে রইল।

সীতা বলে চলে—‘রজনীপুরে থাকতে আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক মনের ও প্রাণের কথা হয়। কথায় কথায় আমি তারিণীর মা-বাবার কথা জানতে চাই। তাতেই সে বলে— আপনি ধাইমা। তার কথায় আর আমার আন্দাজের ওপর ভিত্তি করেই ঠাওর করেছি— আপনিই সেই লোক।’

‘ও ! তোমরা তাহলে দুজনে খুব প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছ !’—রাজিয়া বেগম ওরফে রমামণি বলে।

‘না হয়ে উপায় ছিল না। আমি ঝিলের জলে পড়ে গিয়ে ডুবতে বসেছিলাম। তারিণী নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।’ শুনে রাজিয়া উল্লসিত হয়—‘সাবাস! এই না হলে আমার মেয়ে!’

‘মেয়ের ওপর যখন এতই টান তবে বছরের পর বছর তার সঙ্গে দেখা করেন না কেন? তারিণী আমায় বলে দিয়েছিল— যদি কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হয়, তাকে যেন খবর দিই।’

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সীতার হাত থেকে চাদর-বালিশ টান মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাকে ধমকে ওঠে রাজিয়া বেগম। বলে —‘এদিকে এস। আমার হাতের ওপর হাত রাখ। জলদি!’ সীতা আদেশ পালন করে।

‘আজ রাত্রে তোমার এখানে আমার আসার কথা তারিণীকে বা তোমার স্বামীকে কাউকে জানাবে না। আমার নাম ভুলেও উচ্চারণ করবে না। আমায় ছুঁয়ে শপথ কর। নইলে ঐ পাগলা কুকুরের দশা তোমারও হবে। খুব সাবধান।’—রাজিয়া বাঁ হাতে কোমর থেকে ছোরা বার করে। সীতা ত্রস্ত কণ্ঠে শপথ করে। বাইরে মোটরের হর্ন বেজে ওঠে। সীতা বলে—‘উনি এসে গেছেন। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ুন।’ সীতাকে আর-একবার সতর্ক করে রাজিয়া কয়লা ঘরে ঢোকে। সীতা দোর বন্ধ করে তালা লাগায়। তারপর সদর দরজা খুলতে যায়।

কুড়ি

বাইরের দরজা খুলে সীতা যে দৃশ্য দেখল, সেটা একইসঙ্গে বিস্ময়কর এবং আতঙ্কজনক।

ফটকে দাঁড়ানো গাড়ির দরজা খুলে সামনের সীট থেকে তিনজন আরোহী নামল— রাঘবন, তারিণী আর সূর্য। ওরা নামার সঙ্গে সঙ্গে সীতার নজর পড়ল পেছনের সীটে। সেখানে লম্বাটে আকারের একটা পোঁটলা পড়ে রয়েছে। কিন্তু পোঁটলা কি··· না আর কিছু!

ইতিমধ্যেই সীতা আতঙ্কিত হয়েছিল। এবার বিহ্বল হয়ে পড়ল। ওর শরীর মন থরথর করে কাঁপতে লাগল।

একসময় সীতার মনে সামাজিকতা বোধের উদয় হয়—অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে ফটক অবধি এগিয়ে যায়। রাস্তার বাতির আবছা আলোয় তাদের মূর্তি দেখে সীতা ঘাবড়ে যায়—একী! ওদের মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন? যেন সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরছে···।

'সরে যাও না, রাস্তা ছাড়ো না! পথ আগলে দাঁড়ালে কেন?' রাঘবন ঝাঁঝিয়ে ওঠে, সেই আগে আগে আসছে। তার গলা শুনে সীতার অবাক লাগে। ঠিক রাগ নয়, উদ্বেগ আর ভীতির মিশ্রণ তার স্বরে।—'এত ঝাঁঝ কিসের রে বাপু।' সীতা সরে দাঁড়ায়। রাঘবনের পেছনে তারিণী। সীতা তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলবে ভাবছিল, কিন্তু তার মুখ দেখে থতিয়ে গেল। তারিণী দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল। তার পেছনে সূর্য এল।

'কী হয়েছে সূর্য, ব্যাপারটা কী? তোমরা কোথা থেকে

আসছ ? তোমাদের এ কী মুখের ছিরি হয়েছে— যেন এইমাত্র খুন করে এলে !'—সীতা ব্যাকুল হয়ে বলে।

খুন করার কথা শুনে সূর্য চমকে উঠে সীতার আপাদমস্তক দেখে, তারপর চাপা গলায় বলে—'ভেতরে চল বলছি, খুব গুরুতর ব্যাপার।'

সীতা আর সূর্য ভেতরে ঢুকে দেখল টেলিফোনের রিসিভার তুলে রাঘবন দাঁড়িয়ে। তারিণী সোফায় বসে আছে। সীতা কিছু বলবার আগেই রাঘবন জিজ্ঞেস করল—'মেয়ে কী করছে সীতা ? ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ?'

তখনই ভেতরের ঘর থেকে বাসন্তী সাড়া দিল—'বাবুজী, বাবুজী !' সীতা বললে—'এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল, তোমার সাড়া পেয়েই জেগে উঠেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুলালী বাপের চিন্তা করতে ভোলে না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আদিখ্যেতা রেখে, যাও আবার ওকে ঘুম পাড়াও গে। বল, বাবুজী এখনই আসবে। যাও, তাড়াতাড়ি কর।'

রাঘবনের উতলা কণ্ঠস্বর শুনে সীতা অনুমান করে যে কিছু একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে নিশ্চয়।

বাসন্তী প্রশ্ন করে—'বাবা এসে গেছে মা ?'

সীতা মেয়ের পিঠ থাবড়ায়। বলে—'হ্যাঁ মা এসে গেছে। তোমার কাছেই শোবে, এখন তুমি ঘুমোও।'

—বাবা রাগ করেনি, মা ?

নানান উৎকণ্ঠার মাঝখানেও মেয়ের কথা শুনে সীতা হেসে ফেলে। বলে, 'না। রাগ করেনি। একজন দেখা করতে এসেছে। তার সঙ্গে কথা বলছে। তুমি ঘুমোও।'

রাঘবন তখন টেলিফোনে কথা বলছিল—'হ্যালো, পুলিস স্টেশন ! ওখানে কে আছেন ? আমি পি· এল· এস· রাঘবন কথা বলছি। এখানে একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। না, কার-অ্যাক্সিডেণ্ট নয়। মনে হচ্ছে··· খুন। হ্যাঁ, মার্ডারই মনে হচ্ছে। চট করে কাউকে পাঠাবেন ?···থ্যাংক্স।'

সীতা মৃদুকণ্ঠে তারিণীকে জিজ্ঞেস করে—'কী হয়েছে? পুলিস ডাকছে কেন?' তারিণী নিরুত্তর। মনে হচ্ছে সেও চিন্তাবিহ্বল।

রাঘবন সূর্যকে বলে—'সূর্য, চল আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। পুলিস এখনই এসে পড়বে।'

পুরুষ দুজন বাইরে যেতে সীতা তারিণীর পাশে এসে বসে। বলে—'তারিণীদি, কী হয়েছে আমায় বল তো। টেলিফোনে ও যে ভয়ংকর কথা বলছিল। কোথায় কী হয়েছে?'

তারিণী বললে— 'হ্যাঁ.কথাটা ভয়ংকরই বটে।'

'কী হয়েছে? তাড়াতাড়ি বল।'

'তোমার সেসব না শোনাই ভাল সীতা, শুনে কী করবে?'

'তুমিও আর ঐ মানুষটার মত কথা বোলো না তো। আমি শুনলে কী হবে? এই রকম লুকোছাপা করলেই আমার মন বেশি উতলা হয়ে পড়ে।'

'তা সত্যি। তোমার শোনাই ভাল। তাছাড়া আমি না বললেও একথা কখনো লুকানো থাকতে পারে না। আমি না বললে আর-কেউ বলবে। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে আমার গা ঘিনঘিন্ করছে। তাই আমি ইতস্তত: করছিলাম। যাক, শোন।—আমরা তিনজনে কার-এ আসছিলাম। তোমাদের বাড়ির রাস্তার মোড় ঘুরতেই…' বলতে বলতে তারিণী থেমে যায়। তার গা কাঁপতে থাকে।

সীতা বলে— 'তোমায় তো দারুণ সাহসী বলে জানতুম। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

তারপর তারিণী আমতা আমতা করে যা বলল, তা এই :

ওরা তিনজন গাড়িতে আসছে। বাড়ির রাস্তায় রাঘবন গাড়ি ঘোরাল। ঘুরিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল। তারিণী আর সূর্য একসঙ্গে বলে উঠল—'কী হল?' কোন জবাব না দিয়েই রাঘবন গাড়ি থেকে নেবে পড়ল। তার দেখাদেখি ওরা দুজনেও গাড়ি থেকে নামল। গাড়ির সামনে রাস্তা জুড়ে কি একটা পড়ে রয়েছে।

কাছাকাছি গিয়ে দেখল— মনে হল একটা মানুষের শরীর।

রাঘবন অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে— 'যত সব শয়তানের দল। নেশা করে চুর হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে।'

'গাড়ির ধাক্কায় পড়ে যায় নি তো?'—সূর্য আস্তে আস্তে বলে।

'ননসেন্স। গাড়িতে ধাক্কা-টাক্কা লাগেনি।' রাঘবন জোর দিয়ে বলল।

সূর্য বলল— 'ঠিক আছে। ধাক্কা হয়ত লাগেনি। হয়ত আগে শুয়েছিল পরে চাকায় বেধেছে। কাছে গিয়ে দেখাই যাক-না।'

রাঘবন বললে—'আমরা চুপচাপ গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলে কী হয়? যাও, গাড়ির ভেতরে বোসো গিয়ে।'

কিন্তু তারিণী আর সূর্য তার সৎ পরামর্শে কান না দিয়ে এগিয়ে গেল আর পড়ে থাকা লোকটার খুব কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। লোকটার পোশাক দেখে মনে হল বড় লোক। নাকের কাছে হাত দিয়ে সূর্য বলল—'নিঃশ্বাস পড়ছে। এখনো লোকটা বেঁচে আছে।'

তারিণী দেখল গাড়ির সামনের চাকা লোকটার গা ঘেঁষে রয়েছে।

রাঘবন বললে—'তোমরা গাড়িতে ওঠো, আমরা চলে যাই চল।'

তারিণী বললে—'বাঃ খুব বললেন। মাঝ রাস্তায় একটা লোককে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন আবার বলছেন চুপচাপ সরে পড়ি চল। না, তা চলবে না। লোকটাকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।' সূর্যও তারিণীর কথায় সমর্থন জানালো।

'ও, তার মানে আপনারা পরোপকারীর দল চান যে এখন এই আধমরা লাশ আমি গাড়িতে ওঠাই, না? ওসব ছাড়, আমি কুটোও তুলব না।' রাঘবন স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিল।

'আপনি না তুললে আমি নিজেই তুলব।'—বলে তারিণী লোকটার শিয়রে বসে মাথাটা তুলে ধরে। সূর্য ধরে কোমরের দিকটা। তোলার সময় লোকটার ঘাড়ের নিচে তারিণীর হাত পড়তেই, হাতটা ভিজে ওঠে। মাটি থেকে শরীরটা তোলার পর, যে জায়গায় তার মাথাটা ছিল, সেখানটায় ওদের নজর পড়ল—

থৈ থৈ করছে রক্ত। তবু তারিণী অবিচলিত থাকে। হাতের কাঁপন সামলে তুজনে মিলে দেহটা তুলে এনে গাড়ির পেছনের সীটে শুইয়ে দেয়।

রাঘবন বলে—'এবারে খুশি হয়েছে তো। নাও, এখন তাড়াতাড়ি বোসো—'

ওরা তুজনে ত্বরিতে সামনের সীটে বসে পড়ে।

গাড়ি চালাতে চালাতে রাঘবন বলে—'তোমরা তুজনেই ভারী বোকা। তোমাদের খুঁজতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে।'

তারিণী বললে—'তা হয়েছে। কে বলেছিল আপনাকে আমাদের খুঁজতে যেতে।'

'সে ভুলের খেসারতই দিচ্ছি। তোমরা তুজনে মিলে আমায় এখন খুনের মামলায় ফাঁসালে। আমার গাড়ি ওকে মোটেই চাপা দেয়নি। তা হলে অত রক্ত জমা হত না। কেউ নিশ্চয় লোকটাকে ছুরি মেরে ঘায়েল করে ফেলে রেখে পালিয়েছে। মিছিমিছি তোমরা আমাকে হাঙ্গামায় জড়ালে। একা আমিই জড়াইনি। তোমরা নিজেরাও জড়িয়ে পড়লে।'

'আপনি যা বলছেন সেটা সত্যি হলেই বা কী হয়েছে। আমাদের ওপর খুনের অভিযোগ কে আনবে বলুন না ?' —সূর্য বলে।

'ও, তাহলে তুমি চাও দোষটা আমার ঘাড়েই পড়ুক। খুনের মামলায় আসামী হ'তে হয় না, সাক্ষী হলেই যথেষ্ট ক্ষতি। খবরের কাগজে আমাদের নামে যা-তা কেচ্ছা লিখবে।'—রাঘবন গজগজ করতে থাকে

তারিণী বলে—'যা হবার হয়ে গেছে। এখন কী করা উচিত, সেটাই ভাবা দরকার।'

রাঘবন বলে—'আমার ভাবনাচিন্তার শক্তি নেই। তোমরাই পরামর্শ দাও। গাড়ি কোথায় নিয়ে যাব বল।'

'সোজা হাসপাতালে নিয়ে চলুন। নয়তো থানাতেও যাওয়া যেতে পারে।'—সূর্য বলে। তারিণীও প্রস্তাব অনুমোদন করে।

'ভাল কথা। তা দু জায়গায় তো একসঙ্গে যাওয়া যায় না। কোথায় আগে যাব সেটা বলুন।' রাঘবন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে। ওরা দুজনেও সেটা স্থির করতে পারে না। চুপ করে থাকে।

তখন রাঘবন বলে—'আমার হাত কাঁপছে। এখন ভয় হচ্ছে, গাড়ি চালাতে গিয়ে হয়ত গাছটাছে ধাক্কা মেরে বসব। তার চেয়ে আগে সিধে বাড়ি যাই। সেখান থেকে টেলিফোনে কথা বলব।'

তারিণীর এতে ঠিক মত ছিল না। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ওরা বাড়ি পোঁছে গেল।

সীতা ভীতিব্যাকুল ঔৎসুক্য নিয়ে সব ঘটনা শুনছিল। এবার কম্পিত স্বরে বললে—'এখন কী হবে। পুলিস ওঁকে গ্রেপ্তার করবে না তো।'

—'ভয় পেয়ো না সীতা। দিল্লীর পুলিস এমন মূর্খ হবে না। তাছাড়া তোমার স্বামী বড় সরকারী অফিসার, সমাজের প্রতি-পত্তিশালী লোক। হয়ত স্টেটমেণ্ট দিতে একবার থানাতে যেতে হতেও পারে। তার বেশি কিছু হবে না।'—তারিণী বলে।

শুনে সীতা কিছুটা আশ্বস্ত হয়। তার বুক থেকে একটা বোঝা নেবে গেল। খানিকটা হাল্কা মন নিয়ে এবার ও সমস্ত পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখতে থাকে। খিড়কির বারান্দায়, খুচরো জিনিসের গুদোম ঘরে তারিণীর মা রয়েছে। এ ঘরে তারিণী বসে। অথচ ও তাকে সে-কথা বলতে পারবে না। ও তারিণীর মাকে কথা দিয়েছে। শপথ ভাঙতে পারে না। ভাঙলে তার পরিণাম কী হবে তাও বলা যায় না। সীতার চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা ভেসে ওঠে—রাজিয়া বেগম কলের জলে রক্তমাখা ছোরা ধুচ্ছে। তবে কি তারিণীদের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে? না থাকবার কী আছে। তাহলে? বাড়ির ভেতরে যাকে ও এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছে, সেই হত্যাকারী। এই খুনের মামলার আসামী! একথা জানাজানি হলে তার স্বামী কী বলবে।···

'তোমাদের তিনজনের এক জায়গায় দেখা হল কী করে।' সীতা তারিণীকে জিজ্ঞেস করে।

তারিণী বললে—'আমি সূর্যর কাছে গিয়েছিলাম। তোমার স্বামী সূর্যকে খুঁজতে এসেছিলেন। আমরা একসঙ্গে তোমাকে দেখতে আসছিলাম। পথে এই বিপত্তি।'

'ও, তুমি সূর্যকে দেখতে গিয়েছিলে?...আমাকে তো কই একবারও দেখতে আসনি এর মধ্যে? আমায় ভুলে গেছলে নাকি?'

'না ভুলিনি, ভুলব কেন? আমি তো আসতেই চাই। কিন্তু পাছে তোমার স্বামী দেবতা আবার কিছু মনেটনে করেন। সেই ভয়েই এদিক মাড়াই না ভাই। সেই কথাই সূর্যকে বলছিলাম।'

শুনে সীতা জ্বলে ওঠে। —ও, তার মানে সূর্যর সঙ্গে খুব হলায়-গলায় জমেছে। সূর্যরও বলিহারি আক্কেল। আমার ওপর আর টান নেই। যত টান এখন তারিণীর ওপর। মুখে বলে—'ওঁকে আবার তোমার ভয়টা কিসের? তোমায় তো খেয়ে ফেলবে না। ওঁর মুখে তো তোমার নামজপ লেগেই আছে। তা সূর্যর মনে মনে যে এত শত ছল চাতুরী ছিল তা তো জানা ছিল না!'

তারিণী সীতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে—'এ কী বলছ বোন? সূর্যর মতন সরল মানুষ আমি তো আমার জীবনে দুটো দেখলাম না।'

'হ্যাঁ, সাদাসিধে সরল বলেই তো এতদিন জানতুম ওকে। হালে দেখছি অনেক মারপ্যাঁচ শিখে ফেলেছে।—আগ্রা থেকে ফেরার পর তোমার সঙ্গে বুঝি আজই প্রথম দেখা?'

'না সীতা। ফিরেই আমি সূর্যর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। আমার কপালে চোট লাগার ব্যাপারে দুঃখ করে চিঠি লিখেছিল না? তাই আমার কর্তব্য ছিল ওর সঙ্গে দেখা করা।'—তারিণী সাফাই গায়।

'হুঁ। আমিও তাই ভেবেছিলুম।' সীতা বলে।

তারিণী কিছু বলবার আগেই মোটর সাইকেলের 'ভটভট' শব্দ শোনা গেল।

পুলিসের লোক খানিকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েই কী সব বলাবলি করে। কয়েক মিনিট পরে রাঘবনের সঙ্গে একজন পুলিস অফিসার ভেতরে এল। তারিণীকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে রাঘবন বলে—'এই ভদ্রমহিলা।'

'মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভয় পেয়ে গেছেন। ভয় পাবার কথাই।'

'হ্যাঁ, ওর কথা বিবেচনা করেই আমি সোজা থানায় না গিয়ে বাড়ি চলে এসেছি।—যাই হোক। মামলা মোকদ্দমায় ওঁর নামটা না জড়ালেই ভাল।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি ওঁর ঠিকানা জানেন তো? যদি কখনো ওঁর সাক্ষির দরকার পড়ে, তখন···'

'যদি দরকার পড়ে আমায় জানালেই আমি নিজে ওঁকে নিয়ে যাব। কিন্তু এমন ব্যবস্থা করতে পারেন না যাতে এঁর যাবার দরকারই না হয়?'

'আমি তো বলেছি চেষ্টা করব।—তোমার কোন ভয় নেই বোন। মেয়েদের এসব ব্যাপারে কখনো এগনো উচিত নয়। এই ঘটনায় তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত। এসব কথার উল্লেখ কারো কাছে কোরো না। এ ব্যাপারে তুমি যে বিন্দুবিসর্গ কিছু জান, এমন ধারণাও যেন কারো না হয়।'

তারিণীকে উপদেশ দিয়ে অফিসার রাঘবনকে বলে—'চলুন আমরা যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

'সীতা, আমি এঁর সঙ্গে যাচ্ছি। তারিণী আজ আমাদের এখানেই থাক।' বলে রাঘবন বেরিয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদরে মোটর সাইকেল আর 'কার' ছাড়ার আওয়াজ হয়। সীতা বাইরের দোর বন্ধ করে আসে। তারপর তারিণীকে বলে—'আমি আর এ গাড়িতে চড়বই না, মেয়েকেও চড়তে দেব না। গাড়িটা তাড়াতাড়ি বেচে দিয়ে আর একটা গাড়ি কিনতে বলব।'

তারিণী বলে—'যা বলেছ। আমিও আর এ গাড়িতে উঠব না, যে যতই বলুক। তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'এখন আমার শাশুড়ি এখানে থাকলে একদম ঘাবড়ে অস্থির হয়ে যেতেন। ভাগ্যিস বাসন্তী ঘুমোচ্ছে।'

'সীতা, তোর মেয়েকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার আগে আমায় চান করতে হবে। কলের জলে চান করা যথেষ্ট নয়। গঙ্গাস্নান করতে হবে।'

'আপাততঃ কলঘরেই নেয়ে নাও। গঙ্গাস্নানটা পরেই কোরো।' —বলে সীতা তাকে সামনের দিকের বাথরুমে নিয়ে গেল। পেছনের দিকে যাবার দরকারই হল না।

রাঘবন আর সূর্য ফিরে এসে দেখল সীতা আর তারিণী রান্নাঘরে বসে রুটি তৈরী করছে। দেখে দুজনেই বেজায় খুশি হয়ে বলল—'আমাদের একটুও ক্ষিদে নেই। কিন্তু তোমরা এত কষ্ট করে রান্না-বান্না করছ। না খেলে তোমাদের মনে দুঃখু হবে।' এই বলে সূর্য পেছনের দিকের আর রাঘবন সামনের দিকের স্নানঘরে চলে গেল।

সূর্য স্নান সেরে এসে সীতাকে বলল—'কলঘরের সামনের ঘরটায় কী রেখেছ। যেন চলাফেরার শব্দ পাচ্ছিলুম।'

সীতা মুখ ফিরিয়ে বললে—'ইঁদুর ঢুকেছে বোধহয়।'

সূর্য তারিণীকে বললে—'কলঘরে রুমাল ফেলে এসেছেন নাকি? রুমালে এত রক্তের দাগ···আমি রগড়ে ধুয়ে দিয়েছি।'

'রুমাল!' তারিণী সীতার মুখের দিকে তাকায়, সীতা তারিণীর দিকে।

সীতা কথা ঘোরায়—'সূর্য, গাড়িটা তাড়াতাড়ি বেচে ফেলা দরকার। আমি ওতে চড়ব না।'

রাঘবন বলে—'সে আমি আগেই স্থির করে ফেলেছি। কাল আমার প্রথম কাজই হবে 'কার'টা বেচে ফেলা। আর দ্বিতীয় কাজ একটা রিভলবারের লাইসেন্স নেওয়া। উঃ দিনকাল কী হল! পথ-চলতি লোকের গলায় ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে। কী অন্যায়!'

সবাই খেতে বসে। খেতে খেতে রাঘবন বলে—'সীতা, তোমার মামাতভায়ের যা সাহস, না? সে আর কী বলব! যতক্ষণ গাড়িতে বসে ছিল হাতপা ঠকঠক করে কাঁপছিল। আর যেই নীচে নেমে এল সেই কী ঝুড়ি-ঝুড়ি কথা, বুঝলে?'

সীতা বলে—'ঢের হয়েছে, এসব কথা এবার বন্ধ কর। অন্য কিছু বল।'

'অন্য কী বলব, তুমিই বল-না?' রাঘবন বলে।

'এঁদের দুজনকে জিজ্ঞেস কর, এতদিনের মধ্যে একবার দর্শন দেবার কথা মনে হয়নি কেন?'

'আমি মাপ চাইছি, বাবা। কতকগুলো কাজের চাপ এসে পড়েছিল। এবার থেকে রোজ আসব, অবিশ্যি জামাইবাবুর আপত্তি না থাকলে।'

'তোমার আসায় আমার আপত্তি কিসের? বাজে ওজর না দেখিয়ে আসল কথাটা বল।'

'ঠিক বলেছ। তোমার জামাইবাবুর তোমার আসায় কোনদিনই আপত্তি নেই। তুমি আজকাল খুব কাজের মানুষ হয়েছ। তা তারিণীদির সঙ্গে দেখা করার সময় তো খুব পাও।'

'তা নয় বোন। উনি আর আমি একই দলের কর্মী। কাজের দরকারেই আমাদের দেখাশুনো করতে হয়।'

'তা তোমাদের দলটল আমি বুঝি না বাপু। তোমরা দুজনে যখন এখানে আবার আসতে থাকবে, তখনই আমি শান্ত হব, তার আগে নয়।' সীতা বলে।

খাওয়াদাওয়ার পরে সবাই এসে বৈঠকখানায় বসতে না বসতেই টেলিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল। রাঘবন রিসিভার তুলে কথা বলতে লাগল।

'হ্যালো!…ও…ও, মারা গেছে? আহা!…ডাক্তার ডেথ সার্টি-ফিকেট দিয়েছেন? কী লিখলেন? ছুরির আঘাতে মৃত্যু?—লোকটা কে? কী বললেন? …বিনায়ক রাও মদনকর…? ঠিক

কথা যে পৃথিবীর খুব একটা ক্ষতি হয়ে যায়নি। তবুও খুন খুনই। খুনী কে? কিছু আন্দাজ তো পেয়েছেন? কে? রজনীপুরের পাগলী? নাম শুনিনি তো! ...আচ্ছা, আচ্ছা। আমি দেখব। অনেক ধন্যবাদ।'

রাঘবন টেলিফোন হুকে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন— 'কী ব্যাপার!'

'হাসপাতালে যাবার আধঘণ্টার মধ্যেই মারা গেছে। ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে—ছুরির আঘাতে মৃত্যু। লোকটার নাম বিনায়ক রাও মদনকর। রজনীপুরের ভূতপূর্ব মহারাজের কুপরামর্শ-দাতা ছিল। গত কয়েক বছর যাবৎ দিল্লীতে ছিল। ক্লাবে লোকটার অনেক পরিচিত লোক আছে। প্রায়ই মাতাল হয়ে ঝামেলা করত। রজনীপুরের পাগলী বলে একটা মেয়েমানুষ কিছুদিন থেকে ওর পেছু নিয়েছিল। মদনকর পুলিসকে এ-ব্যাপারে জানিয়েছিল। এই মেয়েছেলেটাই আগে একবার রজনীপুরের রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। অনুমান করা হচ্ছে যে এই খুনটাও সেই পাগলীই করেছে।...আরে, তোমরা এরকম গুম খেয়ে বসে রইলে কেন? সীতা, তুমি না গোয়েন্দা কাহিনী খুব ভালবাস?'

রজনীপুরের পাগলীর নাম শোনামাত্র সীতা আর তারিণী পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে। দুজনের চোখেই করুণ বিলাপভরা চাউনি।

রাঘবনের কথার জবাবে সীতা বললে—'হ্যাঁ, যতক্ষণ কাহিনী পর্যন্ত থাকে, ততক্ষণই ভালবাসি। বাস্তবে ঘটলে তখন আর ভাল লাগে না।'

সূর্য বলে—'আমার কী মনে হচ্ছে জান? রজনীপুরের পাগলীর মতন আরো কিছু লোকের এগিয়ে আসা দরকার। তবেই আমাদের দেশের এইসব স্বদিশি রাজারাজড়া আর তাদের কুমন্ত্রণাদাতাদের বুদ্ধিশুদ্ধি শোধরাবে।'

সীতার মন তখন খিড়কির উঠোনের সেই ঘরটায়। রজনীপুরের

পাগলী এখন তার ঘরেই। এ কথা কি ও-ঘরে উপস্থিত মানুষগুলির কর্ণগোচর হওয়া উচিত? কিন্তু একবার সে-কথা শোনার পর কী প্রতিক্রিয়া হবে? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না? তারিণী চেয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করে নিজের মা-বাপের পরিচয় জানতে! এমন সুযোগ আর কখনো আসবে কি?··সীতার ওপর, সীতার মার ওপর পাগলীর অত দয়া, সহানুভূতি কেন? সেটার কারণ জানার জন্যে সীতার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। এই মুহূর্তে অন্যান্য চিন্তা তার মনে চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

একুশ

ঢং ! ঢং !

ঘড়িতে দুটো বাজার সঙ্গে সঙ্গে সীতার ঘুম ভেঙে যায়। হে ভগবান ! কী ঘুম ঘুমিয়েছি ! দুটো বেজে গেল !…ঘরের মৃদু লাল রঙের বাল্‌বের আলোয় সীতা দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকায়…হ্যাঁ, দুটোই ! হ্যাঁ, এখনো সময় আছে। এইবেলা উঠে সেইঘরে যাওয়া যায়। খুব আস্তে। পায়ের সাড়া যেন কেউ না পায়। পাশের ঘরে পুরুষরা ঘুমোচ্ছে। এঘরে তারিণী গভীর ঘুমে মগ্ন।

ও কিসের শব্দ ? দরজা খোলার না ? এসময় কে দোর খুলছে ? তবে কি…না ! পাশের বাড়ির শব্দ বোধহয়। না কি, ও ভুল শুনেছে ! যাই হোক, এখনই উঠে পড়া যাক। নইলে ঘুমিয়ে পড়বে।

পাশের ঘরে জাগরণের কোন সাড়া নেই। এঘরে তারিণীও ঘুমন্ত। এই যথার্থ সময়। রাজিয়া বেগমকে সাবধানে জাগাতে হবে। সাবধান করে দিতে হবে—ভোর হবার আগেই যেন এখান থেকে চলে যায় !

সন্তর্পণে বালিশের তলা থেকে চাবি বের করে সীতা। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠে। এত মৃদু পা ফেলে যে পায়ের শব্দ নিজের কানেও পৌঁছয় না। খুচরো জিনিসের সেই ঘরটার সামনে এসে অন্ধকারেই তালায় চাবি লাগাতে যায়। নাঃ চাবি লাগানো যাচ্ছেনা। সীতা বিপন্ন বোধ করে। ইতস্ততঃ করে। তারপর অন্ধকারে হাতড়ে আলোর সুইচ্‌টা খোঁজে ? আলো জ্বলে ওঠে।…তালা

খোলা, দরজাও খোলা ? সীতা ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে—কেউ কোথাও নেই। ঘরে ঢুকে ভাল করে চারিধারে দৃষ্টি ফেলে—নাঃ ? ঘর বেবাক ফাঁকা !

আজব ব্যাপার ! রাত্রির প্রথম যামে তবে কি সত্যিই কিছু হয়নি, সবটাই নিতান্ত স্বপ্নের ব্যাপার ? সেই মহিলার ঘরের ভেতরে ঢোকা, বাইরে থেকে তার তালা লাগানো—সবটাই নিছক ভ্রম !

হঠাৎ খিড়কির দোরের দিকে সীতার নজর যায়। দোরটা খোলা। ঘটনার আসল তথ্যের সন্ধান পায় সীতা। ঐ দোর খুলেই রাজিয়া বেগম বেরিয়ে গেছে। পুলিসের আসা, জিজ্ঞেসাবাদ করা—সব খবরই সে জেনেছে নিশ্চয়। গোলমাল কমতেই সরে পড়েছে। তার কাছে সীতার কিছু প্রশ্ন ছিল, জানা হল না। নাই হল ! সে যে নিরাপদে এ বাড়ির বাইরে চলে গেছে—এই ঢের।

সাতপাঁচ চিন্তা করতে করতে সীতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাতে থাকে। হঠাৎ ওর মনে হয় কেউ যেন পেছন থেকে সাগ্রহে দুচোখ মেলে ওর কার্যকলাপ দেখছে। সীতা মুখ ফেরায়। শোবার ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে—তারিণী !

সীতা ভীতিবিহ্বল চোখে তারিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার হাতের চাবি হাতেই রয়ে যায়। তালা লাগাবার শক্তি নেই আর ওর ! ওর অবস্থা দেখে তারিণী কাছে এগিয়ে আসে, তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। বলে—'সীতা। ভয় পাচ্ছ কেন ? তুমি যাকে দেখতে এসেছিলে, আমিও তাকেই দেখতে এসেছিলুম। তোমার চেয়ে তার ওপর টানটা তো আমারই বেশি হবার কথা, তাই না ?'

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সীতা বলে—'তুমি কেমন করে জানলে ?'

'আন্দাজে, সীতা। তোমার চালচলন আর কথাবার্তায় আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর সূর্যর কলঘরে রুমাল পাওয়ায়, সন্দেহ দৃঢ় হয়।'

'আমি উঠে এসেছি তুমি জানলে কী করে। ঘুমোও নি ?'

'ঘুমোই কী করে বল ? এত বড় ঘটনার পর ঘুম কি সহজে আসে ? ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দ শুনে তুমি যখন উঠলে, তার কিছুক্ষণ আগেই আমি কাউকে বাগানের পথে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। ঘরে কজন ছিল, একজন না দু'জন ?'

'একজনই তো। তুমি যাকে রাজিয়া বেগম বল, সেই। দুজনের কথা মনে হল কেন ?'

'আমি দুজনকে যেতে দেখলুম কিনা। মনে হচ্ছে কেউ এসে রাজিয়া বেগমকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

'ঐ মহিলা তোমার মা, সত্যি ? আমার বিশ্বাস হয় না।... চল ঘরে গিয়ে বসি। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার দরকার নেই। মেয়ে উঠে পড়ে আমায় না দেখে কাঁদবে, বেটাছেলেরা উঠে পড়বে। চল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করব। ঘুম তো আর আসবে না। আজ তোমার সব কথা আমায় বলতে হবে।'—সীতা বলল।

ঘরে গিয়ে দুজনে বিছানার ওপর বসল। তারিণী জানতে চাইল সব কথা। সীতা একটি একটি করে সন্ধের পর যা যা ঘটেছে সব বলে গেল তাকে। তারপর প্রশ্ন করল—'হ্যাঁ দিদি, সত্যিই ওর আসল নাম রাজিয়া বেগম ? মুসলমান মেয়ে ?'

'না সেকথা পরে বলব। আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই ওকে মা বলে জেনেছি। পৃথিবীতে আর কোন মা এত আদরযত্ন করে সন্তান পালন করে না। ও আমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসত। কিন্তু আর সব মেয়ের মতন আমার মাকে কোন পুরুষের ঘর করতে দেখিনি। কেমন যেন মনে হত কারুর ভয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। কেবল একজন পুরুষকেই দেখেছি—মার কাছে আসত, প্রায়ই আসত। আমি তাঁকেই বাবা বলে জেনেছিলাম, তাঁকেই 'বাবা' বলে ডাকতাম। কেউ আমায় শিখিয়ে দিয়েছিল, না কি নিজে থেকেই ডাকতে শিখেছিলাম, আজ আর মনে নেই। তাঁকে আর মাকে কখনো বেশ প্রেমমুগ্ধ দেখতাম, আবার কখনো বাঘ-ভালুকের মতন ঝগড়া করতেও দেখেছি। কেমন

করে যেন সেই বয়েসেই আমি বুঝে ফেলেছিলাম যে আর-পাঁচজনের মত বিবাহিত দম্পতি এরা নয়। কিন্তু তবুও ওদের তুজনকেই আমার মা-বাপ বলে জেনেছিলাম। হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে কখনো তাদের মতভেদ দেখিনি। সেটা হল--আমার প্রতি বাৎসল্য। অগাধ অপত্য স্নেহের প্লাবনে তাঁরা তুজনেই আমায় ডুবিয়ে রাখতেন। কোন জিনিস আমার মুখ ফুটে চাওয়াটুকুর অপেক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। আমার এতটুকু শরীর খারাপ হলে তাঁরা যেন প্রাণ দিতে তৎপর। আমাকে বড় করা, লেখাপড়া শেখানোর জন্যে তাঁরা তুহাতে খরচ করতেন। তার মানে তাদের যে বাতাসে পয়সা ভেসে বেড়াত, তা নয়। যখন খুব ছোট, তখন দেখেছি মার অনেক দামী দামী গয়নাগাঁটি ছিল। একটি একটি করে সেগুলো তুলে দিয়েছে বাবার হাতে—বিক্রি করার জন্যে। মাঝে মাঝে বাবাও কিছু টাকাকড়ি আনতেন। মা কিন্তু নিতে চাইতেন না। মা জানতেন বাবার আয় বেশি নয়, তাছাড়া আরো একটি পরিবার তাঁর মুখ চেয়ে ছিল। কনভেণ্ট স্কুলে পড়ার সময় নিরুপমা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব হয়। আমার জন্মকথা, আমার জীবনের স্মৃতি নিয়ে যখনই আমি বিষাদে ডুবে গেছি, নিরুপমার সান্নিধ্য আমাকে তুঃখ ভুলিয়েছে।

'আমরা সমবয়সী। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হল। আমরা একে অপরের কাছে অন্তরের সব কথা উজার করে বলতাম। তুজনেই স্থির করে ফেলি যে আমরা বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে যাব না, দেশের সেবায় জীবন অর্পণ করব। নিরুপমা সম্প্রতি তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয়েছে।—সীতা! তুমি তো তাকে দেখেছ? বিশ্বের দৃষ্টিতে তাকে সুন্দরী বলা যাবে না। নিরুপমা বুদ্ধিমতী, তার যে রূপ নেই, একথা সে বুঝত। তাই কুমারী থাকতেই চেয়েছিল। তার সৌভাগ্য, বাইরের রূপে না ভুলে অন্তরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার মত মানুষ তার জীবনে

এসেছে। তাকে বিয়ে করে নিরুপমা এখন সুখের সংসারে ঘরকন্না করছে।...'

তারিণীর চোখে তুফোঁটা জল মুক্তোর মতন চকচকিয়ে উঠতে দেখে সীতার মন কেমন করে উঠল। বললে—'তারিণীদি, নিরু-পমার মতন তোমার ভাগ্যও একদিন প্রসন্ন হয়ে উঠবে।'

'তাতে আর আমাতে অনেক তফাত, সীতা। আমার ত্রুটি জন্মগত বোন। যার মা-বাপের নিশ্চয়তা নেই, তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হবে, এমন পুরুষ এদেশে কোথায়? আর যদি কেউ রাজিও হয়, তার আত্মীয়স্বজন রাজি হবে কেন? আমাদের দেশে বিয়েটা তো বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনের সম্মতি না হলে হয় না। ছেড়ে দাও ওসব কথা। বিয়েটিয়ের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহই নেই। দেশের কাজ করাতেই বরাবর আমার উৎসাহ। আমি আর নিরুপমা বোম্বাইয়ে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিলাম। আমাদের বয়েস কম বলে আমাদের জেলের সাজা হল না। বেশ বারকতক শহরের বাইরে ছেড়ে দিয়ে এল। আমি আর নিরুপমা সব সময়েই এক-সাথে ছিলাম। আমরা বেশ মজা পেয়ে গিয়েছিলাম। আন্দোলন শেষ হলে আমরা করাচী কংগ্রেসে যাই।...'

এখানে এসে তারিণী একটুক্ষণ থেমে যায়। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'তারপর ভারতবর্ষের পুণ্যভূমি ঘুরে দেখবার ইচ্ছে হয়। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা আর করাচী থেকে কলকাতা—গ্রাম-নগর তন্ন তন্ন করে ঘুরে দেখি। এরপর বিহারের ভূমিকম্প এল। সমস্ত দেশের মন কেঁদে উঠল। তুর্গতসেবার জন্যে বোম্বাই থেকে যে সেবাদল বিহারে যাচ্ছিল, আমি আর নিরুপমা তাতে ভর্তি হয়ে গেলাম। এই সময় আমাদের তুজনের জীবনেই একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। নিরুপমার বেণীপ্রসাদের সঙ্গে মিলন হল, আর কিছুদিনের মধ্যেই তারা পরস্পরের জীবনসঙ্গী হয়ে গেল!'

তারিণী এই পর্যন্ত বলে একেবারে মৌন হয়ে গেল দেখে সীতার ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। বললে—'বা রে, তারপর কী হল? বিশেষ

জায়গায় এসে গল্প থেমে গেলে চলে ? তোমার জীবনে কী ঘটল সেটা বল।'

'তারপর আর কী। নিরুপমার বিয়ে হল, আর আমার মরণ হল। ভাবছ যা খুশি বকছি, না। সত্যিই। আমার জানাশোনার পরিধিতে আমি নিজেকে মৃত বলে জাহির করে দিয়েছি। এমনকি সেবাদলের সবাইকেও একথা বিশ্বাস করতে হয়েছে যে আমি বেঁচে নেই। তার কারণ কী জান ? খবরের কাগজে যে-খুনের খবর শুনে তুমি আমার মাকে সন্দেহ করেছিলে, সেই খবরই তার কারণ। হত্যাপরাধে মার ধরা পড়া আর জেল হওয়ায় আমি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ি। পৃথিবীতে মার মতন ভালবাসার পাত্র আর কেউ নেই আমার। যাঁকে আমি বাবা বলে জানতাম, তাঁকেও আমি অতখানি ভালবাসতে পারিনি কোনদিন। কিন্তু মার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারতাম। মার চালচলন দেখে প্রায়ই আমার সন্দেহ হত। কিন্তু তাতে আমার ভালবাসা কখনো কমেনি। যদিও কয়েক বছর যাবৎ আমি মাকে ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তবুও তার প্রতি ভালবাসা আমার এক তিল কমেনি। তার দুর্নাম, তার কষ্ট আমি যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

'কেন একজন মহারাজাকে আমার মা খুন করতে গেল। এই নিয়ে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আমার মনে নানান রকম সন্দেহ তোলপাড় করতে লাগল। এর মধ্যেই একবার দিল্লীতে বাবার সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমায় সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এমন কয়েকটা কথা বললেন, যা শুনে সান্ত্বনা পাওয়া তো দূরের কথা, আমার দুঃখ হাজারগুণ বেড়ে গেল। তার একটা কথা হল এই যে এতদিন ধরে আমি যাকে আমার মা বলে জেনে এসেছি, সে আসলে আমার মা নয়। অন্ধকার-ভরা আমার জীবনে ঐ একটাই দীপশিখা জ্বলছিল, সেটাও নিবে গেল। আমার বুক দশহাত দমে গেল। সে যখন আমার মা নয়, তখন ইনিও আমার বাবা নন। তাহলে আমি কার সন্তান ?

—সীতা ! মাঝে মাঝে আমার মা রাগ করে এমন সব কথা বলতেন যার মানে আমি এতদিনে বুঝলাম। আমার মনে বিচিত্র সন্দেহ জাগল—সম্ভবতঃ আমি কোনো দিশি রাজ্যের রাজার কন্যা! মার বারবার বাড়ি বদল, এক শহর ছেড়ে অন্য শহরে যাওয়া, তার রমামণি নাম পালটে রাজিয়া বেগম সেজে থাকা—এসবের কী কারণ থাকতে পারে?—এতদিনে তার কিছু কিছু বুঝতে পারলাম। বাবা অর্থাৎ আমার পালক পিতা বুঝতে পারলেন না, আমার মনে কী গভীর বেদনা বাজল। তাঁর অন্য কী একটা জরুরী কাজ ছিল, আমায় সান্ত্বনা দিয়ে উনি নিজের কাজে চলে গেলেন। আমায় দেখা করার স্থান, সময় সব নিশ্চিত করে জানিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। দেখা করার আর সাধ ছিল না আমার।'

সারা ঘরে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা ছেয়ে রইল। তারপর মৌন ভেঙে সীতা প্রশ্ন করল—'তোমারও কি রাজিয়া বেগমকে পাগলী বলে মনে হয়?'

'আমি জানি না সীতা। কী করে জানব? চারবছরের ওপর তার সঙ্গে আমার দেখা নেই। শুধু জানি তার মনে একটা ভয়াবহ বিদ্বেষবিষ জমে ছিল। চরমসীমায় উঠে সেটা উন্মত্ততায় দাঁড়াতে পারে না এমন নয়। যদি পাগল হয়ে গিয়ে থাকে, সেটা একরকম ভাল। পুলিসের হাতে ধরা পড়ায় আজকের ঘটনার জন্যে তার ফাঁসি হবে না। পাগলাগারদে পাঠাবে।'

খানিকক্ষণ পরে সীতা বললে—'আর একটা প্রশ্ন তারিণীদি। আমার গলার রত্নহার দেখে তুমি জানতে চেয়েছিলে কে দিয়েছে। তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে ও-হার রাজিয়া বেগমই দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমার ধাই-মা এক এক করে সব গয়না বেচে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই একটা হারই তার গলায় ছিল। আমি দেখেই চিনেছিলাম।'

'এই হারটা আর দু'হাজার টাকা সে আমায় কেন দিয়েছিল?'

'এটা আর আমায় কেন জিজ্ঞেস করছিস সীতা? আমার মুখ থেকে আর কী শুনবি। নিজেই আন্দাজ কর। বুঝতে পারবি।' তারিণী থামে।

কিছুটা আন্দাজ সীতা আগেই করেছিল। এবার ওর অনুমান প্রত্যয়ে দাঁড়াল। জ্ঞান হবার পর থেকে তারিণী যাকে 'বাবা' বলে জেনে এসেছে, তিনি আর কেউ নন—তিনি সীতার বাবা তুরাইস্বামী। তার শৈশবের পারিবারিক দৈন্যদশা, মার বিষাদসিন্ধু—সবকিছুর মূলে তাহলে এই কাহিনী! তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে মহিলা ঐ মহার্ঘ উপহার দিয়ে গিয়েছিল।—সীতা ভাবনার স্রোতে ভেসে গেল, আবার ফিরে এল। বললে—'সে যাই হোক, আজ থেকে তুমি চিরকালের জন্যে আমার বোন হলে।' ঘড়িতে চারটে বাজল।

বাইশ

হঠাৎ একদিন ধামা আর ভামা সীতার বাড়ি এসে হাজির। সীতা বিশেষ রকম খুশি হল। হাসি খুশি আর আমোদ-ফুর্তিতে সারা বাড়ি জমজমাট হয়ে উঠল।

বাসন্তীকে কোলে তুলে নাচাতে নাচাতে ভামা বললে—'মিস্টার রাঘবন কোথায়? আজ তো তাঁকে কনগ্র্যাচুলেট করতেই আসা।'

'আজ আমার শাশুড়ি আসছেন দেশ থেকে। তাঁকে নিয়ে আসতে স্টেশনে গেছেন।'—সীতা বললে।

'হায় হায়—শাশুড়ি! আসছেন? কী সর্ব্বনাশ। আমার বুক কাঁপছে ভাই।' ভামা কপাল চাপড়ায়।

ধামা বলে—'জান সীতা, আমরা বিয়ে করিনি কেন? শাশুড়ির ভয়ে। বিয়ে করলেই শাশুড়ি হবে। ওরে বাবাঃ—রক্ষে কর।'—দুইবোনের অট্টহাসিতে পাড়া কাঁপতে থাকে। সীতার ঠোঁটেও হাসির রঙ লাগে। বলে—'এঁকে কনগ্র্যাচুলেট করতে এসেছ কেন?'

'বিলেত গিয়েই রাঘবনের এত সাহস হয়েছে। নইলে এদেশের লোক বলবে—পরের ঝামেলায় জড়ানো কেন বাপু, এস পাশ কাটাই। কিন্তু রাস্তায় ছোরায় ঘায়েল লোককে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে রাঘবন হাসপাতালে দিয়েছে, থানায় খবর দিয়েছে। কম কথা! তোমার স্বামীর কর্তব্যপরায়ণতার কথা শুনে আমার বাবা খুব প্রশংসা করলেন। ওঁর সাহসের জন্যে অভিনন্দন জানাতেই বিশেষ করে আজ এলুম।'—ভামা বললে।

সীতা সেদিন রাত্রের আসল কথা খুব ভাল ভাবেই জানে। তার বিলেত-ফেরত স্বামীই বলেছিল—বৃথা ঝামেলায় না পড়ে চুপচাপ

কেটে পড়ি এস। সূর্য আর তারিণীই লোকটাকে তুলে নেবার জন্যে জেদ করেছিল। তাদের রাঘবন কয়েকবার বলেওছে যে তোমাদের জন্যেই আপদ আমার ঘাড়ে পড়ল। সীতা সব কথা তারিণীর মুখে শুনেছে। তবু, সেকথা এসময় তো বলা যায় না। ভামা-ধামা যদি ওর স্বামীকে সম্মান দেখাতে চায়, তাতে ও আপত্তি করবে কেন? তাই সীতা চুপ করে থাকে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। সীতা রিসিভার তুলে বলে—'কে?' টেলিফোনে কথা বলছে সূর্য। বললে—সে আর তারিণী সীতার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

সীতা বললে—'খুবই খুশির খবর। তোমাদের অনেকদিন দেখিনি। এক্ষুনি চলে এস।'

ধামা-ভামা জানতে চাইল কে আসছে। শুনে খুব খুশি হল। বললে—'তোমার স্বামীর সঙ্গে তো দেখা হলই না। অন্ততঃ তারিণীর সঙ্গে দেখাটা তো হয়ে যাক।'

সীতা বললে—'তারও আসার সময় হয়ে গেছে। বড় জোর আর আধ ঘণ্টার ভেতর এসে পড়বে। দেখা করেই যাবেন।'

সীতার সূর্যকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল, তারিণীকেও। কিন্তু দুজনকে একসঙ্গে দেখাটা তার খুব মনঃপূত নয়। তার ওপর রাঘবন সেদিন যে অভিযোগ করেছে, সেটার ঘা-ও সীতার মনে তাজা হয়ে আছে। সে বলেছিল, সূর্য আর তারিণী একেবারে খোলাখুলি এক সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে। এ তো আদৌ উচিত নয়। সূর্যর কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? তার মা-বাবার কানে কথাটা উঠলে তাঁরা কীরকম দুঃখু পাবেন?

সীতারও মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু রাঘবন দোষটা কেবল সূর্যর ঘাড়েই চাপাতে চাইছে। সীতা এ ব্যাপারে মনে মনে তারিণীকেই দোষ দেয়। তার ধারণা সূর্য গ্রাম থেকে আসা অবোধ বালক। চৌকস মেয়ে তারিণীই তাকে বিগড়ে দিচ্ছে। সূর্যকে

একা পাবার সুযোগ পেলে সে তাকে সাবধান করে দিতে পারত, যেন তারিণীর ফাঁদে পা না দেয়।

তারিণীর প্রতি সীতার মনোভাব দ্বৈত। তাকে সামনে পেলে সীতা তার ওপর ভালবাসা আদর-সোহাগের বন্যা বইয়ে দেয়। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে রাগে আক্রোশে জ্বলতে থাকে। তাদের বাড়িতে যে দারিদ্র্য গেছে, তার মাকে যে জ্বালা-যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, তার যে অকাল-মৃত্যু এই সবকিছুর জন্যেই সীতা মনে মনে তারিণীকে দায়ী করত। তাছাড়া, অতীতে তার স্বামীর সঙ্গেও তারিণীর অন্তরঙ্গতা ছিল। পরস্পর ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল—এটা সে জেনেছে। আজ আবার তারিণী সূর্যকে পাগল করেছে। এসব কি ভারতীয় নারীর চরিত্রে শোভা পায় ?

ভাবতে ভাবতে সীতা ধামা-ভামাকে বলে—'আপনারা এখানে, মানে এই শহরে থেকে যান তো বেশ হয়। এখানে আমার সময় কাটে না।'

ভামা বলে—'আমরা এখানে এসে গেলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। বাবা হয়ত ভারত সরকারের কোন চাকরী নিতে পারেন, সম্ভাবনা আছে। বাবাই একটু দ্বিধা করছেন। নেবেন কি নেবেন না।'

ধামা বলে—'এখানে তোমার বন্ধুর অভাব কী সীতা, তারিণী তো রয়েছে !'

সীতা বললে—'তারিণীর থাকা না-থাকা দুইই সমান। সে তো এলেই খালি সোশ্যালিজম, কংগ্রেস, বিপ্লব—এইসব বড়বড় কথার তুবড়ি ওড়াতে থাকে। আমার ওসব ভাল লাগে না।'

'তাই নাকি ! আমি তো ভেবেছিলুম এসব কথায় তোমার খুব উৎসাহ !'

'মোটেই না। আমার গান্ধী মহাত্মার ওপর একটু ভক্তি আছে। তাঁর কেউ সমালোচনা করলে আমার ভাল লাগে না। সে আমার স্বামী হলেও, আমি বাধা দেব।'

'গান্ধীজী মহামানব। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর

অর্থনীতি বড়ই অচল। তাঁর কথা শুনে সবাই চলতে থাকলে ভারতবর্ষ হাজার দুই বছর পিছিয়ে যাবে।'—ধামা বললে।

'দিন দিন সময় খারাপ হচ্ছে। বিলেতে যারা শূওর-গোরু চরাত, তাদের ধরে ধরে এখানে গভর্নর আর ভাইসরয় করে পাঠাচ্ছে।'—ভামার কথা শেষ হবার আগেই ধামা মাঝখান থেকে বলে ওঠে—'এখনই হয়েছি কি, দাঁড়াও। ইংলণ্ডে লেবা·' গভর্নমেণ্ট হয়ে যাক, তারপর রেলওয়ের পোর্টার আর ডাকপেয়াদাদের গভর্নর করে পাঠাবে। আর আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা আর নবাবরা তাদের সেলাম বাজিয়ে বেড়াবেন।'

তার কথার উত্তরে ভামা বললে—'তা বিলেত থেকে কষ্ট করে পেয়াদা-পোর্টার আনবার দরকার কী? আমাদের দেশের কংগ্রেস-সোশালিস্টদের কথামতন চললেই তো আমাদের এখানকার কুলি আর পেয়াদাই গভর্নর হয়ে যেতে পারে। তা সীতা, এদের দু-দলের মধ্যে কাদের তোমার বেশি পছন্দ হয়?'

সীতার রাজমপেট্টাইয়ের ডাকঘরের কথা মনে পড়ে যায়। ডাকঘরের পিওন বালকৃষ্ণণকে গভর্নরের পোশাকে চিন্তা করে সীতা মনে মনেই হেসে ওঠে। তার মনে হয় ভারতের সরকার আর সরকারী চাকরী যেমন আছে তেমনই থাকলেই মঙ্গল।

এমন সময় সূর্য আর তারিণী ভেতরে আসে। ধামা আর ভামা—'হ্যালো মাই ডিয়ার!' ব'লে তারিণীর গলা জড়িয়ে ধরে তার হাত ধরে। এই সুযোগে সীতা সূর্যকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে—'তুমি তারিণীর সঙ্গে এত বেশি মাখামাখি করছ কেন? তোমার মা-বাবা শুনলে কী ভাববেন? কেন বৃথা বদনাম কুড়োবে। আমি শীগ্যিরি তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা!' সূর্য বেজায় খুশি হয়ে ওঠে—'মেয়ে কোথায় দেখলে? এদের দুজনের একজন নয় তো?'—ভামা-ধামার দিকে ইশারা করে সূর্য মিটিমিটি হাসে।

'ছিছি। এরা হল আধুনিক মেয়ে। তোমার মা সেকেলে মানুষ,

একটা মিনিটও বনবে না। আমি ভাল মেয়ের খোঁজ করব। তুমি খালি তারিণীর ফাঁদে পোড়ো না।'

'সীতা, এসব কথা তুমি কার কাছে শিখলে? তারিণীর ওপর মনে মনে কোন খারাপ ধারণা করে থেকো না। আমি তো আগেই তোমায় বলেছি, আমরা দুজনেই সমাজবাদী দলের লোক। সেইজন্যে বারবার দেখাশুনো কথাবার্তার দরকার পড়ে। আমরা খুব শীগ্যিরই লাহোর যাবার কথা ভাবছি।' সূর্য বলে।

ধামা-ভামার সঙ্গে পরিচয়ের পর সূর্য বললে—'আমরা যখন এলুম, শুনলুম পোর্টার-পিয়নের কথা চলছে। কী ব্যাপার?'

সীতা সংলাপের চুম্বক বলে দিতে সূর্য প্রায় বক্তৃতা দিয়ে বসল। বললে—'একদিন সেটা হবেই হবে। রেলের কুলি গভর্নর হবেন। কারখানার মিস্ত্রি গভর্নর জেনারেল হবেন। ডাকহরকরা প্রধানমন্ত্রী হবেন। এসবের জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। এমন কল্পনায় মশগুল থাকবেন না যে চিরকাল ইংরিজিঅলা বড় বড় লোকেরাই পায়াভারী হয়ে থাকবেন। আজ জার্মানীর উন্নতি দেখে সারা দুনিয়া যে হিটলারের নামে নাল ফেলছে, সে লোকটা কে? দেয়ালে কলি ফেরানোর রাজমিস্ত্রি। ভেবে দেখুন রাশিয়ার কথাটা।'

'আরে বাপরে। ইনি যে একেবারে আগুন ঝরানো সোশালিস্ট দেখছি।'—ভামা বলে।

সীতা বললে—'হ্যাঁ, আমার মামাত ভাই ঐ মতেরই। গাঁয়ের জমি নিয়ে চাষীর পক্ষে কথা বলে বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ করে চলে এসেছে। শুনতে পাই সার্বজনিক সভায় গরম গরম বক্তৃতা দেয়। তা এযাবৎ ভাষণ শোনার সুযোগ হয়নি আমার।' বড়দের কথা না বুঝলেও বাসন্তী খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। কারের ভেঁপু শুনেই—'বাবা এসেছে, ঠাকুমাকে নিয়ে এসেছে'—বলতে বলতে দোরের দিকে ছোটে।

'হ্যাঁ, ওঁরা এসে পড়েছেন মনে হচ্ছে। আপনারা গল্প করুন,

আমি এক্ষুনি আসছি।' ব'লে সীতা দেউড়ির দিকে এগোয়। মেয়েকে কোলে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। গাড়ি ফটক পেরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল। মা নামবার আগেই রাঘবন তাড়াতাড়ি নেবে আসে। বারান্দার কাছে গিয়ে গলায় আগুন ঝরিয়ে বললে—'সীতা! তুমি গ্রামে কী চিঠি লিখেছ? কেন লিখেছ ওরকম চিঠি? একদিন তুমি খুব মার খাবে আমার হাতে। খুব তেল বেড়ে গেছে না? গাধা কোথাকার।'

'ছি ছি, কী বলছ কি তুমি? আমি তো কিছুই লিখিনি।'—দুরন্ত ক্রোধ আর কান্নার উচ্ছ্বাসকে চেপে সীতা বলে। এই প্রথম রাঘবন সীতাকে রাগ করে এরকম কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করল।

'তুমি লেখোনি তো কে লিখেছে? মিথ্যে কথা বোলো না। তোমার প্রাণের সখি ললিতাকে তুমি লেখনি যে রজনীপুরের ঝিলে আমি তোমায় নৌকো থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলুম?'

এবারে সীতার আসল কথাটা বোধগম্য হয়। সূর্য ললিতাকে যে চিঠি লিখেছিল, সেটাই কেউ রঙ চড়িয়ে রাঘবনের কানে পৌঁছে দিয়েছে। কেউ হয়ত শাশুড়িকে বলেছে, তিনি ট্রেন থেকে নাবতে না নাবতে ছেলের কানে তুলেছেন।

'জবাব দিচ্ছ না কেন? বল লিখেছ কি না।' রাঘবন চেঁচাতে থাকে।

'ভগবানের দোহাই, অত চেঁচিও না। মেয়েটা ভয় পেয়ে গেছে। তাছাড়া ঘরে বাইরের লোক রয়েছে।' সীতা স্বামীকে সংযত করার প্রয়াস পায়। বাইরের লোকের কথা শুনে রাঘবনের হুঁশ ফেরে। বলে—'কে এসেছে?'

'তারিণী।'

'অ।' রাঘবনের মুখের চেহারাই বদলে যায়।

'ধামা আর ভামাও এসেছে।'

'ও, ঐ পেত্নী ছুটোও জুটেছে। তাই এত চেঁচামেচি। এরাই, না আর কেউ ?' রাঘবন জিজ্ঞেস করে।

'সূর্য এসেছে।'

'ও রাস্কেল এখানে কেন আসে ? কোনদিন দেব রিভলবার চালিয়ে নিকেশ করে'—রাঘবন চাপা গলায় গজরায়।

মা-বাপের ঝগড়া দেখে হতভম্ব বাসন্তী ঝাঁপ দিয়ে ঠাকুমার কোলে চলে যায়।

বাইরের রাঘবন আর ঘরের ভেতরে আসা রাঘবনের মধ্যে একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ। তার চণ্ডালমূর্তি আর নেই, কোথায় মিলিয়ে গেছে। মুখের ভাবে, ভাষায় ভঙ্গীতে মাধুর্য ঝলকাচ্ছে। সীতা এ পরিবর্তন দেখে প্রকৃত খুশি। আমার ওপর রাগ-ঝাঁজ যত খুশি দেখাক। বাইরের লোকের সামনে যে ও ভদ্র ব্যবহার করছে এতেই সীতার আনন্দ।

প্রথমেই ধামা আর ভামাকে রাঘবন বিশেষ আড়ম্বর করে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর তারিণীর দিকে ফিরে বলল—'কী আশ্চর্য ! আজ যে দ্বিতীয়বার চাঁদের দর্শন পেলাম !'

তারিণী বলল—'হ্যাঁ। পূর্ণিমার চাঁদ একদিন যে দ্বিতীয়ার চাঁদ হবে, এতো স্বাভাবিক, তাই না ?'

'পূর্ণিমার চাঁদ চিরদিনই পূর্ণিমার চাঁদ থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে কখনো তাকে পূর্ণিমার চাঁদ বলে মনে হয়, কখনো দ্বিতীয়ার চাঁদ বলে ভ্রম হয়। তবে একটা কথা সত্যি যে সূর্যর সান্নিধ্যে থাকলে চাঁদ একেবারেই লুকিয়ে পড়ে। লাখো চেষ্টা করলেও তাকে দেখা না।'—বলে রাঘবন সূর্যর দিকে ফেরে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে—'তুমি কখন এলে ?'

রাঘবনের সূর্য চন্দ্র নিয়ে শ্লেষের নকশাকাটা ব্যঙ্গোক্তি শুনে সূর্যর মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। মনের বিচলিত ভাব বাইরে প্রকাশ না করে সে সহজ সুরে বলে—'এই তো প্রায় আধঘণ্টা হল। আমি আর তারিণীদেবী দুজনে একসঙ্গেই এসেছি।'

কথাবার্তার মাঝখানেই ধামা-ভামা রাঘবনের ব্যাজস্তুতি করে বলল—'সেদিন রাত্রে মুমূর্ষু লোকটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়াটা প্রকৃত মহৎ কাজ হয়েছে।' জবাবে রাঘবন বলল—'আমি আর এমন কি একটা বিরাট কাজ করেছি যার জন্যে এত প্রশংসা করতে হবে? এ তো সকলেরই কর্তব্য। ওকথা ছাড়ুন, অন্য কথা বলুন।'

ইতিমধ্যে টেলিফোন বেজে ওঠে। রাঘবন রিসিভার তোলে।

"বলুন। কী? ও মদনকরের ব্যাপারটা···? কী বললেন? দোষী ধরা পড়েছে?—কে? বলেন কী? কী সাহস! খুব ভাল কথা! আমি যা জানি, সাক্ষীর এজাহারে বলতে প্রস্তুত। না, কোথাও যাব না!—শহরেই আছি। রাইট ও!"

অন্যের অলক্ষ্যে তারিণী আর সীতার চোখে চিন্তা আর উদ্বেগের রেখাপাত ঘটে যায়।

রাঘবন টেলিফোন নামিয়ে রেখে আসতেই সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করে—'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

'মদনকরের আততায়ী গ্রেপ্তার হয়েছে। কয়েক বছর যাবৎ তার বাড়িতে কাজ করত লোকটা। সেই খুন করেছে। দোষী অপরাধ স্বীকার করেছে।'—রাঘবন সমাচার শোনায়।

তেইশ

দিন কয়েক পরে সুন্দর রাঘবন একদিন তারিণীর ঘরে গেল। সে সময় সূর্যও সেখানে উপস্থিত ছিল। রাঘবন দেখল দুজনে কোথাও যাবে বলে তৈরী হচ্ছে। জিজ্ঞেস করল—'কী ব্যাপার, আপনাদের লাহোর যাত্রা স্থির হয়ে গেছে?'

তারিণী বলল—'হ্যাঁ, আজ রাত্তিরের গাড়িতেই যাচ্ছি।'

রাঘবন সূর্যকে বলে—'দেখ সূর্য, তুমি লাহোর যাও আর রাওলপিণ্ডিই যাও, কাবুল যেতে চাইলেও আমার কোন আপত্তি নেই। মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে যাও তো আরো উত্তম কথা। সোশ্যালিজম—কমিউনিজম ইত্যাদি মরীচিকার খোঁজে মরু সফরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তারিণীকে সঙ্গে নিয়ে যেও না। তাতে তোমারও কোন লাভ নেই, ওরও কোন লাভ হবে না।'

হাসি হাসি মুখে, সব কথা শুনে সূর্য বলে—'জামাইবাবু, আপনার শেষের কথাটাতেই সামান্য ভুল রয়ে গেছে। তারিণী দেবীকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না। উনিই আমায় জোর করে টেনে নিয়ে চলেছেন।'

রাঘবন প্রশ্ন করে—'তারিণী, একথা সত্যি?'

'হ্যাঁ। জানেনই তো আমি ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছি। সেইজন্যে আমায় একবার পাঞ্জাবে যেতে হচ্ছে।'

'রাখ, রাখ। চুলোয় যাক তোমার ইতিহাসের গবেষণা। ভারতে হিন্দুধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করা স্ত্রীলোকদেরই কর্তব্য। থাক সে কথা! সে-কথা নিয়ে বিতর্ক করার সময় এটা নয়। তারিণী, তোমার সঙ্গে আমার একান্তে কিছু কথা বলার আছে।'—রাঘবন বলে।

রাঘবনের মুখে অস্থিরতা আর ব্যাকুলতার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেখে তারিণী বলে—'আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরস্ত্রীর সঙ্গে পুরুষ একান্তে, গোপনে কথা বলতে পারে? সেটা ধর্মবিরুদ্ধ হবে না তো?'

শুনে রাঘবন মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে যায়। তারপর বলে—'অবিশ্যি তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে। তাহলে আমারও কোন আপত্তি নেই। আমি রঙ্গ করতে আসিনি তারিণী। আমার খুব জরুরী কথা আছে।'

সূর্য বলে—'আমাকেও যাবার ব্যাপারে কয়েকটা কাজ সারতে হবে। আমি চলি, তারিণী দেবী। যাত্রার প্রোগ্রামে কোন পরিবর্তন হলে আমায় সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠাবেন।'—বলে সূর্য চলে যায়।

সূর্য যাবার পর কিছুক্ষণ ঘরে স্তব্ধতা বিরাজ করে। তারপর তারিণী কিছুক্ষণ রাঘবনের কথা শুরু করার প্রতীক্ষা করে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ না দেখে নিজেই বলে—'নিরিবিলিতে আপনি কী জরুরী কথা বলতে চাইছিলেন?'

রাঘবন নাটকের পাত্রের মতন তারিণীর সামনে দাঁড়িয়ে বলে—'তারিণী! তুমি কি সত্যিই বোঝ না আমি একান্তে তোমায় কোন্ কথা বলতে চাই। তুমি কি সত্যিই আমার মনের কথা বুঝতে পার না, না কি জেনেশুনে না বোঝার ভাণ কর?'

'আপনার মনের কথা যদি আমার জানার কথা হয়, তাহলে আমার মনের কথাও আপনার জানা উচিত। কথাটা ঠিক তো? সেক্ষেত্রে কথা বলার প্রয়োজনটা কোথায় রইল?'

'না। আমি তোমার মন বুঝতে পারি না তারিণী। সে একটা সময় ছিল, যখন তোমার মনে কোন কথা উদয় হবার আগেই আমি তার আভাস পেতাম। তুমিও তেমনি আমার মনের কথা জানতে পারতে। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলতে শিখিনি। আমি আমার মনের কথা সোজাসুজি সরলভাবে শুনিয়ে দিতে চাই।

তারিণী! তোমাকে ছাড়া আমি আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারছি না। তিন মাস আগে যেদিন তোমাকে দিল্লী স্টেশনে দেখি, সেদিন থেকেই আমার মন আর আমার বশে নেই। আগ্রায় তোমায় দেখার পর থেকে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি। এই তিনমাস যাবৎ আমার মন কোন কাজে বসছে না। অফিসেও ঠিক করে কাজ করতে পারছি না। যে ওপরঅলা সাহেব আমায় অগাধ স্নেহ করেন, তিনিও বারবার অনুযোগ করছেন আর জানতে চাইছেন, আমার কী হয়েছে। তোমার জন্যেই আমি সিমলা-যাত্রা স্থগিত করে দিয়েছি, তোমায় দিল্লীতে ফেলে সিমলায় গিয়ে আমি কী আনন্দ পাব? তোমার মনে আছে তারিণী, বিয়ের পর 'হানিমুন' করতে আমাদের কাশ্মীর যাবার কথা ছিল···মনে আছে তোমার, বল?'

'বন্ধু! আমি হাত জোড় করে মিনতি করছি— অতীতের কথা আর নতুন করে তুলবেন না। সেসব কথা পুরনো মুদ্রার মত ভুলে যান।'

'তুমি ভুলে গেছ তারিণী, আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। তুমি খুব ভাগ্যবতী, তাই এত অনায়াসে সব ভুলতে পেরেছ। কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। অতীতের স্মৃতি দিনরাত কাঁটার মতন আমার বুকে বিঁধে আছে। সে স্মৃতি আমার সুখের, না দুঃখের তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে পড়ে সেই কবে আমরা বম্বের মালাবার হিলসের উপবনে গিয়েছিলাম। নেমে আসতে আসতে সন্ধে নেমেছিল। নিচে বোম্বাই শহরের লক্ষ লক্ষ বিজলী বাতি আকাশের তারাদের সঙ্গে রেষারেষি করে জ্বলছিল। গোটা পৃথিবীটা আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের এক বাড়ি থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডে চিত্রাভিনেতা সায়গলের গলায় বেজে উঠেছিল—'প্রেমের ভুবনে কুটির বাঁধিব গো?'···শুনে আমি বলেছিলাম—'এ গান যেন আমাদের জন্যেই গাওয়া। আমরাও প্রেমনগরে ঘর বাঁধব?'...সেকথা কি তোমার মনে পড়ে তারিণী!

অন্ততঃ এখন, আমি বলার পরেও কি তোমার মনে পড়ছে না ?··· না কি আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ ভেবে উড়িয়ে দিয়ে আর কোন কথা ভাবছ তুমি ?'

শুনে তারিণীর মনের ভাব কী হল, ঠিক বলতে পারব না। তবে বেশ কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর অতি কষ্টে থেমে থেমে বলল—'আপনার সব কথা আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। সেসব দিনের স্মৃতি আমার মনে সজীব হয়ে আছে। আমি কিছুই ভুলে যাইনি। কিন্তু সেদিন আমরা যে ভুল করেছিলাম, আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আসলে প্রেম-নগর বলে কোন বস্তু নেই। ওটা নিতান্তই মায়ানগর। নিছক কবিদের ভাববিলাস। আর প্রেমের ভুবন যদি সত্যিই কোথাও থাকে, তবে আমি আজ আর সেখানে ঘর বাঁধতে চাই না। তার বদলে আমি সেবানগরে ঘর বাঁধতে চাই। রাঘবন! আমি যা-কিছু দেখেছি, তা যদি আপনিও দেখতেন, আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই একই উপলব্ধি যদি আপনারও হত, তবে আজ আপনিও আমার মত একই কথা ভাবতেন। প্রেম ভালবাসার মোহজালে জড়িয়ে মনকে কষ্ট দিতেন না। আপনিও তাহলে আমার মতই দিনরাত চিন্তা করতেন পৃথিবীর জীবদের, অন্ততঃ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে আমরা কী করতে পারি ?'

'এ তুমি কী বলছ তারিণী! পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কখনো তুমি-আমি দূর করতে পারি ? আমরা কি বিধাতার চেয়ে বেশি শক্তিমান ? যে যার নিয়তি অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। প্রত্যেকের জন্যে ভগবান আলাদা আলাদা পথ নির্মাণ করে দিয়েছেন। যে যার নির্দিষ্ট পথ দিয়েই চলতে হবে। আমরা পৃথিবীর উন্নতি করব, পৃথিবীর মানুষের দুঃখ দূর করব, সুখ বাড়াব—এসব কতবড় অহংকারের কথা, একবার ভেবে দেখেছ ? তুমিও ঐ মূর্খ সূর্যটার মতন কথা বলছ ? এসব কথা ওর কাছেই শেখনি তো ?'—রাঘবন সংযম হারিয়ে ফেলে।

তারিণী কিন্তু শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দেয়—'আপনি বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। তাই যা মুখে আসে বলে ফেলছেন। সূর্যর কথা উঠছে কিসে? তার সঙ্গে দেখা হবার আগেই আমি এসব কথা চিন্তা করেছি, আমার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার নিজেরও কিছু সিদ্ধান্ত তৈরী হয়েছে। ঈশ্বর-সৃষ্ট এই পৃথিবীতে উন্নতি নিয়ে আসব—এরকম অহংকার থেকে, কিংবা বিধিলিপি বদলে দেব এইরকম অন্ধ প্রমত্ততা নিয়ে আমি সেবা করতে নামিনি। দুঃখী মানুষের সেবায় আমার মন সুখ পায়, শান্তি পায়। অন্যধরনের জীবনে আমার কোন আকর্ষণ নেই। আমি কী করব? আপনিই তো এইমাত্র বললেন প্রত্যেক মানুষের পথ ভগবান আলাদা করে বেঁধে দিয়েছেন। আপনার পথ আর আমার পথ যদি আলাদাই হয়ে থাকে তাতে ভগবানেরই-বা দোষ কোথায়? প্রথম যখন আপনাকে দেখি, তখন বুঝতে পারিনি যে আমাদের উভয়ের রাস্তা স্বতন্ত্র। তখন আমার বুদ্ধির ওপর মায়ার জাল বেছানো ছিল। সে জাল কেটে গেলে সত্যের উপলব্ধি হল। দয়া করে আমায় ক্ষমা করুন, আর আমার নিজের পথে চলতে দিন!'

'না, কখনো না। তোমার চোখে এখনই মায়ার ঘোর লেগেছে। তুমি সেদিন যা দেখেছিলে, সেটাই সত্য ছিল। তোমার পথ আর আমার পথ আলাদা—এও ভুল কথা। হিন্দুধর্মে পুরুষের পথই নারীর পথ। নারীর জন্যে আলাদা কোন পথের বিধান নেই।'

'ঐরকম পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আপনাকে দেবতার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলে পুজো করবে, এমন মেয়েকে তো স্ত্রী-রূপে পেয়েছেন। আপনি খুব ভাগ্যবান। রাঘবন! একবার ভাল করে ভেবে দেখে বলুন তো আমার সঙ্গে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে সীতার কথা আপনার মনে পড়ে না? আপনি তার একমাত্র অবলম্বন। আপনি ছাড়া তার কেউ নেই। আপনার দয়ামায়া নেই? ঐ মেয়েটার সঙ্গে এরকম নিষ্ঠুর আচরণ করতে আপনার বিবেকে বাধছে না?'

'ওঃ নিষ্ঠুর আচরণের কথা তুলছ— তুমি ? কে কার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। আমার ওপর সীতার ওপর যদি কেউ নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকে তো সে তুমি। তারিণী! সেদিন আমি তোমার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করে হাল ছেড়ে বসে ছিলাম। তুমি আমায় মাঝদরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে মাদ্রাজ ছেড়ে চলে গেলে। যাবার সময়ে একটা কথাও বলে গেলে না। একটা নির্বোধ পত্র রেখে গেলে, যা পড়লে যে-কোন লোক বিভ্রান্ত হয়। হয়তো এ সবই তোমার পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তারপর আবার এমন এক চিঠি লিখলে, যা পড়লে কেউ এ কথা না ভেবে পারে না যে তুমি ভূমিকম্পের ফাটলে পড়ে মারা গেছ। তোমার এইসব কপটতার জন্যেই আমাকে সীতাকে বিয়ে করতে হয়েছে।'

'যদি আমায় মেনে নিতেও হয় যে আমার আচরণে ত্রুটি ছিল, তবু তা অহেতুক ছিল না, সংগত কারণ ছিল তার। কিন্তু এ তো সত্যি কথা যে সীতাকে আপনি রামা-শ্যামা-যোদো-মোদোর মতন চোখ কান বুজে বিয়ে করেননি। বেশ ভাল করে মন দেয়া-নেয়া করেই বিয়ে করেছেন। তবে ? ···শুনুন। যদি সত্যিই আপনি আমায় ভালবেসে থাকেন, যদি সেই প্রেমের সত্যতার প্রমাণ দিতে চান, তবে সীতাকে আপন করে নিন। সে আপনার স্ত্রী, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুন। বেচারী অবোধ সরল মেয়েটাকে ঠকাবেন না।'

'কে বলেছে আমি তাকে ঠকাব ? আমি তাকে ঠকাবার কথা, ত্যাগ করার কথা তো একবারও ভাবিনি। সেও সঙ্গে থাকবে, আমার কোন আপত্তি নেই।'

'ও, তার মানে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, সামাজিকতা ইত্যাদির জন্যে মঙ্গলসূত্রপরা পত্নী একজন থাকবেন, আর আমিও রক্ষিতার মতন থাকব!'

'ছিছি— তুমি আমায় এত নীচ ভাবলে তারিণী, আমি কি এতই অধঃপতিত! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করব। তার জন্যে আমায়

অভিশাপ কুড়োতে হয়, কলঙ্ক অপমান মাথায় নিতে হয়— সব-কিছুর জন্যেই আমি প্রস্তুত।'

'বলুন বলুন। আবার বলুন!'— তারিণী তার বিস্ময় চাপতে পারে না।

রাঘবন বলে— 'বলছি তো আমি তোমায় অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করব। তুমি হবে আমার সহধর্মিণী। তোমার সম্মতির অপেক্ষা শুধু। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'রাঘবন! এ ব্যাপারে আপনার প্রথমা পত্নীর কী মতামত হতে পারে —সেটা কি ভেবে দেখেছেন?'—তারিণী প্রশ্ন করে। তার স্বর কঠোর।

'তা নিয়ে আমি ভাবি না। একজনের জন্যে আর-একজন তার জীবনের সব সুখ ত্যাগ করতে যাবে কেন? তা ছাড়া আমি তো তাকে একদম ত্যাগ করতে যাচ্ছি না। তাকেও আমি নিজের সঙ্গে রাখার কথাই বলছি।' রাঘবন বলে।

'আহা-হা। বেচারীর প্রতি আপনার কী অসীম উদারতা। আচ্ছা, আপনার ভাবনাটার একটু মোড় ঘুরিয়ে দেখলে কেমন হয়! ধরুন সীতাও আপনার মতন আর-একজন দ্বিতীয় পুরুষকে প্রেম করে বিয়ে করতে চাইল। আপনি কি তাকে অনুমতি দেবেন?'

'উঃ তোমার মুখে এসব কী কথা? এ তো হিন্দুধর্মের বিরোধী!'

'ও, হিন্দুধর্ম তা হলে কেবল পুরুষকেই যা খুশি করবার অধিকার দিয়েছে বলুন!'

'এসব ধর্ম উপদেশে আমার প্রয়োজন নেই। একটা কথা বলছি, শোন। সীতাকে আমি তালাক দেব। তার ইচ্ছা হলে সে আর-একজনকে বিয়ে করতেও পারে! সে ক্ষেত্রে তুমি আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজি আছ?'

'সীতা আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। আপনার পায়ে পড়ে থাকবে। সেটা ভালই জানেন বলে আপনার এত দুঃসাহসের কথাবার্তা। গোড়াতেই আমি আপনাকে যা বলেছি, এখনও তাই

বলছি। আপনার জীবনের লক্ষ্য আলাদা, আমার জীবনের লক্ষ্য আলাদা। কোনদিনই আমাদের জীবনের লক্ষ্য অভিন্ন হবে না!'— তারিণী স্পষ্ট করে বলে।

রাঘবন ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তারিণীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মনে মনে একটা সংকল্প করে ক্রুর হাসি হেসে বলে— 'তারিণী। দিন কয়েক আগেই আমি রিভলবারের লাইসেন্স পেয়েছি।'

'রাঘবন! আমার ভয় দেখানোর চেষ্টা নিরর্থক। বিহারের ভূমিকম্প দেখার পর থেকে আমার মন থেকে মৃত্যুভয় দিন দিন লোপ পাচ্ছে।'

'তুমি আমার কথার ভুল অর্থ করেছ। তোমায় গুলি করার কথা আমি বলিনি। আমি বলতে চাইছি— নিজেকে গুলি করার কথা।'

'আমার নিজের মরণেরও ভয় নেই, আর-কারু মরণেরও ভয় নেই। গীতায় বলেছে, 'শরীরকে ধ্বংস করা যায়, আত্মাকে ধ্বংস করার সাধ্য কারো নেই, বজ্রপাণিরও না'।'

'তারিণী! আজ আমি তোমার স্বরূপ বুঝতে পেরেছি। তুমি সাধারণ মানবী নও। তুমি পিশাচী। তোমার রূপ রাক্ষসী সূর্পণখার রূপ। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। তুমি আর সূর্য কাল কেমন করে ট্রেনে চড়, তাও দেখব।'— রাঘবন শপথ নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

রাঘবন দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর তারিণীর চোখ সজল হয়ে আসে। তারপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মত জলের প্লাবন নামে তার চোখে।

চব্বিশ

পদ্মাপুরমের বাড়িতে বসে রাঘবনের বাবা পদ্মলোচন শাস্ত্রী কোন কাগজের 'সম্পাদকের নামে চিঠিপত্র' স্তম্ভের জন্যে গরম গরম নিবন্ধ লিখছিলেন। পরিব্রাজক শর্মার সঙ্গে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর মতভেদ এখন একটা চরমসীমায় পৌঁছে গিয়েছে। চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসের সপক্ষে কড়া জবাব দেবার চিন্তায় তিনি যখন বিশেষ রকম বিপন্ন, এমন সময় ফটকের কাছে 'ভিক্ষান্ দেহি' রব শোনা গেল। ওপরের বারান্দা থেকে ঝুঁকে শাস্ত্রী দেখলেন— এক যুবক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। শাস্ত্রীজীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। জীবনে এই প্রথমবার তাঁকে এমন উতলা হতে দেখাল। সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে এসে কর্মনিরতা গৃহিণীকে ডেকে বললেন— 'কামাক্ষী! কী আশ্চর্য! দুয়ারে এক বালক সন্ন্যাসী। অনিন্দ্যকান্তি, তেজ ফেটে বেরোচ্ছে। তাঁর মুখে 'ভিক্ষান দেহি' শুনে আমার শরীরে শিহরণ জাগছে। শীগ্যির সদরের চাবি দাও। আমার যেন মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ শংকরাচার্য আবার অবতীর্ণ হয়েছেন! পূর্বপুরুষের পুণ্যপ্রতাপের ফলে এক জ্যোতির্ময় ঋষির পদার্পণ হয়েছে বাড়িতে। দেখ, এখনো তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

কামাক্ষী ততক্ষণে সদরে দাঁড়ানো সন্ন্যাসীকে এক নজর দেখে নিয়েছেন। বললেন—'এত উতলা হবার কী আছে? সদর তো খোলাই আছে। অত বড় মহাত্মা এখন কোথা থেকে আসবেন, সগ্‌গো থেকে। রামকৃষ্ণ মঠটঠের স্বামীজীরা কেউ এসেছেন বোধহয় চাঁদা আদায় করতে!'

শুনে শাস্ত্রীজীর সব উৎসাহে ঠাণ্ডা জল পড়ে গেল।

ততক্ষণে স্বামীজী দরজা খুলে ভেতরে এসেছেন। শাস্ত্রীজী আর কামাক্ষী দুজনেই অবাক হয়ে ভাবছেন— চেহারাটা যেন চেনা চেনা। কোথায় যেন দেখেছি। কে বলো তো?

'মামীমা, চিনতে পারেন?'—স্বামীজীর মুখ থেকে কথাটা বেরোতেই কামাক্ষী তাকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারেন। বলেন— 'আরে তুমি তো আমাদের সূর্য! এ কী পোশাকের ছিরি হয়েছে?'

'সত্যি নাকি? এ সূর্য? তাই তো বলি, চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে কেন।'—শাস্ত্রীজী বলেন।

'হ্যাঁ, পূর্বাশ্রমে এই দেহের নাম সূর্যই ছিল। বর্তমান আশ্রমে স্বতন্ত্রানন্দ।'—সন্ন্যাসী বলল।

'আচ্ছা। শুনে খুব খুশি হলাম। আমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। 'সোনায় সোহাগা' বলব, নাকি 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে' বলব, বুঝতে পারছি না। তা আসুন, পায়ের ধুলো দিন।' শাস্ত্রীজী স্বতন্ত্রানন্দজী মহারাজকে সাদর আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসালেন।

'তা এই অল্প বয়সে এরকম বেশভূষা! মা-বাবার অনুমতি পাওয়া গেল? যে-বয়েসের যা কাজ। বয়েস পাকবার পর কেউ সন্ন্যাস নেয় তাতে কারুর আপত্তি হয় না।'—কামাক্ষী দেবীর মন্তব্য।

স্বামীজী জবাব দেবার আগেই শাস্ত্রীজী বলে ওঠেন—'বাঃ বলিহারি বুদ্ধি তোমার! কেউ সন্ন্যাস নেবে কিনা তোমায় জিজ্ঞেস করে নেবে। আর সংসার ত্যাগীর আবার মা-বাবা কে? পরিব্রাজক হবার পর সংসারের বন্ধন আর থাকে না। ওর কথা ছেড়ে দিন, মহারাজ! আপনার মত অল্পবয়সে বৈরাগ্য নিয়ে যদি হাজার দু'হাজার ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে সনাতন ধর্মপ্রচারের ব্রত নেয়, তবে সনাতন ধর্মের উদ্ধার হবে। আচ্ছা বলুন দিকি এবার। আপনি কবে কোথায় ও-আশ্রমে দীক্ষিত হলেন? দীক্ষান্তে কোথায় কোথায় পর্যটন করে এলেন? এই শহরে কতদিন থাকবার ইচ্ছে আছে? সব কথা সবিস্তারে শোনান।— কামাক্ষী! তুমি রান্নার ব্যবস্থা

দেখ। স্বামীজীকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সেবা করতে হবে। বুঝলে ?'

'খুব বুঝেছি। তুমি বোঝ। আমার কোন ত্রুটি হবে না। তোমার চিন্তা নেই।'—ব'লে কামাক্ষী ভেতরের দিকে চলে গেলেন। বাসন্তীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে যাচ্ছে দেখে সন্ন্যাসী বললেন—'কী রে বাসন্তী, কথা বলছিস না যে ? আমায় চিনতে পারছিস না ?'

বাসন্তী তবুও স্বামীজীর সঙ্গে বাক্যালাপ না করে ঠাকুমাকে একটু নিচু হতে বলে। ঠাকুমা নিচু হলে তার কানে কানে বলে—'ঠাকুমা। সূর্যমামা মাথা নেড়া করেছে কেন গো ? বালাজী তিরুপতি থেকে এসেছে ?'

তার কথা শুনে সবাই হা-হা করে হেসে ওঠে। কামাক্ষী ভেতরে গেলে শাস্ত্রীজী তাঁর কথার খেই ধরে আবার পুরনো প্রশ্নে ফিরে এলেন।—

'আচ্ছা, আপনি সন্ন্যাস আশ্রম কেন গ্রহণ করলেন, কেমন করেই বা এই পথে এলেন ? আমি তো শুনেছিলাম আপনি কংগ্রেসে ভর্তি হয়েছেন এবং কায়মনপ্রাণ দিয়ে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছেন !'

"হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই শুনেছেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলাম। যখন হরিদ্বারে যাই, সেখানে এক মহাত্মার দর্শন পাই। তাঁর দর্শনই আমার জীবনের পরম লগ্ন। জানি না কোন জন্মজন্মান্তরের সুপ্ত সংস্কার আবার আমার মধ্যে জেগে উঠল।'

'আচ্ছা মহারাজ ! আমাদের ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হবে ? মহাত্মা গান্ধী, প্যাটেল, নেহরু সবাই কতবার করে জেলে গেলেন। তা কই স্বাধীনতা এল কই ?'

সন্ন্যাসী বললেন—'আপনার কি ধারণা, কোনদিনই স্বাধীনতা আসবে না ?'

'না। তা তো বলিনি। ভারত স্বাধীন হবেই। তবে এঁদের

দ্বারা নয়। ভগবানের ইচ্ছে অন্যরকম। অন্য উপায়ে তিনি এদেশকে স্বাধীন করবেন। কল্কি অবতার এবার জার্মানীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হিটলারের কথাই বলছি। হিটলার রুশ আক্রমণ করলেন কেন? যাতে কোনরকমে ভারতকে উদ্ধার করতে পারেন। স্তালিনগ্রাদ দখল করার পরই একলাফে উড়োজাহাজে ভারতে এসে পড়বেন। পঞ্চাশ হাজার বিমানপোতে করে তাঁর আকাশসেনাও এসে পড়বে। তিনি তো পষ্টাপষ্টি বলেই দিয়েছেন যে বিশ্বের আর্যজাতিই শ্রেষ্ঠ জাতি। তা হলে বিশ্বসাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতের চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর কোথায় পাবেন? হিন্দুস্থানে পা রাখার পরই হিটলারের প্রথম কাজ কী হবে জানেন। কয়েকজন বিদ্বেধর জাতিভেদ দূর করার জন্যে কোমর বেঁধে তাঁদের ঘোমটা পরিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে বিদেয়ের বন্দোবস্ত করবেন। তাঁদের তখন লজ্জায় হাঁটুজলে ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। দুনিয়ার সমস্ত লোককে এডল্‌ফ হিটলার চারিবর্ণে ভাগ করে দেবেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের মাহাত্ম্য তখনই লোকে বুঝবে। বেঁচে থাকলে আমিও দেখে যাব।'—শাস্ত্রীজী বললেন।

সন্ন্যাসী কোনমতে হাসি চেপে বলে—'কিন্তু কারো কারো মতে হিটলার হেরে যাবেন।'

'পাগলে কিনা বলে। পাগলের প্রলাপে ভবিতব্য টলে যাবে। জানেন, হিটলারের জীবনচর্যা কী রকম। মাংসাহার করেন না; মদ্য পান করেন না; নারীমুখ দর্শন করেন না। জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করছেন, বুঝলেন স্বামীজী! হিটলারকে সামান্য মানব ভাববেন না। তিনি হঠযোগী। সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত এখন এক জার্মানীতেই আছেন। মনে রাখবেন, হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, বার, তিথি, নক্ষত্র বিচার করেই হিটলার প্রতিটি কাজের শুভারম্ভ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের সময়ও তাই করেছিলেন, ফ্রান্স দখল করার সময়ও তাই করেছিলেন। নইলে কখনো মহাপরাক্রমী নেপোলিয়নের দেশটাকে

দশদিনের ভেতর নাকে দড়ি পরানো সম্ভব হত। কী, আমি ঠিক বলছি ?'— শাস্ত্রীজী অনর্গল বলে চলেন। থামবার নাম করেন না।

শাস্ত্রীজীর বক্তৃতা শোনা ছাড়া সন্ন্যাসীর কোন উপায় ছিল না। একদিকে তার অবাক লাগছিল যে শাস্ত্রীজী একজন লেখাপড়া জানা লোক— বি. এ. বি. এল. উপাধি পেয়েছেন, সাবজজের মতন পদস্থ সরকারী কাজ করেছেন। অভিজ্ঞতাও কম বলা যায় না। তবুও এইসব অন্ধবিশ্বাসের পেছনে সময় নষ্ট করেন কী করে ? অন্যদিকে তার চিন্তা লেগেছিল— কামাক্ষী মামীমাকে নিরিবিলিতে কখন পাওয়া যাবে ? সীতা আর রাঘবনের ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ কখন হবে ?

সুযোগমতন শাস্ত্রীজীর বকবকানি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সন্ন্যাসী মহারাজ এক সফল অস্ত্র প্রয়োগ করে বসলেন—'আপনার সকল কথাই অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু এত জোরে জোরে বলবেন না। দিন-কাল ভাল নয় তো। সি. আই. ডি.-র লোক যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় কার কানে কথা যাবে, রিপোর্ট করে বসলে, তখন বৃথা হয়রানি, বুঝলেন না ?'

ব্যস। কথাগুলো যাদুমন্তরের মতন কাজ করল। শাস্ত্রীজী একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে দিলেন।

এরপর শাস্ত্রীজী সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার কামরায় চলে গেলেন। ওদিকে কামাক্ষী আম্মাল বকতে বকতে হাজির হলেন—'ও সূর্য। তোমাদের বাপু সকলই বিচ্ছিরি। এতটুকু বয়েসে আবার সন্নিসি হওয়া কি। দেখ দিকি কাণ্ড। আমি বাপু কী বলে ডাকব টাকব জানি না। স্বামীজী-ফামীজী, আজ্ঞে আপনি করতে হবে নাকি ?'

'মামীমা'— সূর্য ফাঁক পেয়ে বলে, 'আমি আসল কথাটা আপনাকেই বলি। আমি সত্যিকার সাধুসন্ত নই। বিশেষ দরকারে ভেক ধরেছি।'

'শোন কথা। তা এরকম অলুক্ষণে পোশাক নেবার বুদ্ধি হল কেন !"

'আমি স্বরাজ আন্দোলনে নেবেছি না।'

'আরে রাখ তোমার স্বরাজ-টরাজ। তোমার জন্যে আমি একটা ভাল মেয়ে দেখে রেখেছি। তোমার ভেকটেক দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছল।'

'মামী, জীবনে বিয়ে করাটা এমনই জরুরী ব্যাপার? দুনিয়ায় যারা বিয়ে করেছে, তারা কি সবাই সুখী?'—সূর্য প্রশ্ন করে।

"কতলোকই তো বিয়ে-থা করে বালবাচ্চা নিয়ে সুখে ঘরকন্না করছে। কারুর কারুর বরাতটাই ফুটো, কপালে সুখ লেখা নেই। সে কথা যদি বল তো দুনিয়ায় এমন কে আছে যে সদাই সুখী? শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বিয়ে করেও কত কষ্ট পেলেন। তা বলে কি বলব যে শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ে করা উচিত হয়নি?'— কামাক্ষী তর্ক জোড়েন।

সূর্য বলে—'রাম-সীতার মধ্যে কীরকম গভীর প্রেম ছিল। আজকাল কটা দম্পতি ওরকম আছে?'

'সূর্য, তুমি যা বলতে চাইছ আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি তো বলবে যে আমার ছেলে-বউয়ে মিলমিশ নেই। আমি মানছি কথাটা ঠিকই। কিন্তু এমন দশা হল কেন? গুরুজনের কথা অমান্যি করে নিজের ইচ্ছেয় চলার দরুন! আমাদের গুরুজনরা যে আশীর্বাদের আগে জন্মকুণ্ডলী বিচার করার প্রথা মানতেন, সেটা কি মিছিমিছি! অনেক চিন্তাভাবনা করেই নিয়ম করেছিলেন তাঁরা, যে, বিয়ের পর যেন সোয়ামী-ইস্তিরিতে সাপে-নেউলে না হয়। আমরা তোমাদের দেশে গেলুম কেন? তোমার বোন ললিতাকে দেখতে গিয়েছিলুম তো? ললিতা আর রাঘবনের জন্মকুণ্ডলীতে মেল খেয়েছিল। সে বিয়ে যদি হত, তো আজ এ দুর্দশা হত না।'—কামাক্ষী খেদোক্তি প্রকট করেন।

সূর্য বললে— 'তা হলে আজ আমার পিসতুত বোন যে দুর্ভোগ ভুগছে, আমার নিজের বোন সেই দুর্ভোগ ভুগত।'

কামাক্ষী রাগে লাল হয়ে গেলেন। বললেন— 'বাঃ সূর্য, বাঃ।

তোমার তা হলে ধারণা যে তোমার পিসতুত বোন খুব মাটির মানুষ, আর আমার ছেলেই যত দোষের দোষী, তার জীবনটাকে বরবাদ করে দিচ্ছে! নতুন নতুন বিয়ের পর আমিও তাই ঠাউরেছিলাম যে মেয়েটা বড়ই সাদা-সরল। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলুম যে ও কতবড় রাক্ষুসী।'

'একটা সরল মেয়ে যদি রাক্ষুসী হয়ে ওঠে তা হলে তার পেছনে কিছু কারণ থাকে নিশ্চয়ই।'—সূর্য বলে।

'কারণ আবার কী, কারণ? আমি যে তাকে সাদাসিধে ভাল-মানুষ বলে ভেবেছিলুম, সেটাই আমার ভুল। আমি জীবনে এমন বিষের চুবড়ি দুটো দেখিনি, বুঝলে? মাঝে মাঝে আমার তো ভয় করে, যে কখন না জানি ভাতে বিষ মিশিয়ে…!'

'বলুন মামী, বলুন না। থামলেন কেন? বিষ মিশিয়ে স্বামীকে খাওয়াবে।'

'না, তা আমি বলিনি। সূর্য!… ভাতে বিষ মিশিয়ে নিজেই যদি খায়, আর রাঘবনের ওপর দোষ বর্তায়, তখন? 'স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমি নিজেকে নিজেই শেষ করে দিচ্ছি'— এই বলে যদি একটা চিঠি লিখে রেখে যায়, তখন?… ও-মেয়ের আক্রোশ দেখে আমার মনে এমনি সব ভাবনাই ওঠে। যখন তখন!'

'মামী, সীতার মনে যদি বিষ খেয়ে মরার ভাবনা আসে, তা হলে নিশ্চয় ভেতরে কোন গোলমাল আছে মনে হয়, তাই না? বাঁচবার সাধ যখন মানুষের ফুরিয়ে যায়, তখনই তো মরবার ইচ্ছে প্রবল হয়। এতে যদি আপনাব ছেলের কোন দোষ না থাকে, তা হলে অন্য কোন কারণ থাকা দরকার, কী বলেন? বিনা কারণে তো কেউ মরবে বলে বেঁকে বসে না!'—সূর্য বলল। এর জবাবে কামাক্ষী আম্মার মুখ থেকে বাক্যবন্যা অনর্গল বয়ে চলল। যেন আষাঢ়ের বর্ষায় ঢল নেমেছে :

'কে বলেছে আমার ছেলের কোন দোষ নেই। অনেক দোষ

আছে তার ! তোমার বোনকে দেখতে গিয়ে সেই পরীকে দেখে মন মজিয়ে এলেন ! গোঁ ধরলেন— বিয়ে যদি করতে হয় তো ওকেই করব। এ তো গেল একটা দোষ। একটা কানাকড়ি না নিয়ে বিয়ে করল— সেটা দ্বিতীয় দোষ ! আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতকে সগ্গে তুলেছে— এও তো তার দোষই। আমি তখন কত করে পাখি পড়িয়েছি যে এত মাথায় তুলিসনি। ও কে কার কড়ি ধারে ? কথা কি কানে নেয় ? আজ আগ্রা, কাল সিমলে, পরশু কাশ্মীর। —যেখানে যাচ্ছে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমায় কাশী নিয়ে গঙ্গার চান করাবার সময় হয় না। বউকে নিয়ে লন্দন যেতেও এক পায়ে খাড়া। বড়লাটের বাড়ির পার্টিতে নিয়ে যাওয়া... ইংরিজি পড়ানো...সে কত...'

সূর্য দেখল কামাক্ষীর সঙ্গে এরকম কথাকাটাকাটি করে কোন লাভ নেই। সে কথা ঘোরাল, বললে— 'দেখুন মামী, আমি আমার পিসতুত বোনের সাফাই গাইতে আর আপনার ছেলের নিন্দেমন্দ করতে এসেছি, তা ভাববেন না। আপনি জানেন সীতার মা নেই। তার বাবা বেঁচে আছেন কিনা কেউ জানে না। আপনি আর আপনার ছেলে ছাড়া তার আর দুনিয়ায় কেউ নেই। আপনারা তাকে মেরে তাড়ালে কুয়োয় ডুবে মরা ছাড়া তার আর উপায় নেই। আমার পিসিকে তো আপনি জানতেন। সারাটা জীবনভর দুঃখু পেয়ে পেয়ে মরেছে। প্রায়ই বলত 'আমার জীবনটা বিষময়। সীতার একটা ভাল ঘরে বিয়ে হোক, তাকে সুখী দেখে আমার মরেও সুখ।' এই বিয়েতে আমারও কিছুটা হাত ছিল। পিসি তাই মরার আগের দিন অবদি আশীর্বাদ করে গেছে। যখন আপনার ছেলে-বউয়ের ভেতর মনোমালিন্য দেখি, তখন পিসির কথা মনে করে বড় কষ্ট হয়। মনে হয়, এমন কিছু করি, যাতে রাঘব-সীতার মধ্যে আগের সম্প্রীতি ফিরে আসে, ওরা যেন আবার সেইরকম সুখী হতে পারে। যদি জানতে পারি, সীতার দোষগুলো কী জাতের, তা হলে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা করি।'

সূর্যর সুর নরম দেখে কামাক্ষীরও রাগটা একটু ঠাণ্ডা হয়। বলেন— 'আমিও তো তাই চাই বাবা। ছেলে-বউ আবার আগের মতন হাসিমুখে বেড়াবে— তার চাইতে আনন্দের আর কী থাকতে পারে, বল। ওরা যে একে অপরকে প্রাণের থেকে ভালবাসে, এটা কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু কী যে হয়েছে ওদের। ভোর না হতে হতে ঘরে কাগ উড়ছে, চিল পড়ছে ; বাড়ি নয়, যেন নরক। আমার মতে সব দোষই বাপু তোমার বোনের। তার বড় তেজ। প্রথম যখন এ বাড়িতে বউ হয়ে এল, তখন মুখে কথাটি নেই। আর এখন। জিভ যেন কাঁচির মতন চলছে। দেখি আর অবাক হই। এখন যা দশা হয়েছে, এ এককথা বলে তো ও দশকথা শুনিয়ে দেয়। তা হাজার হোক বেটাছেলে তো, মাঝে মাঝে সেও ক্ষেপে যায়। তা তুই মেয়েছেলে, চুপ করে গেলেও পারিস। তা চুপ করতে শেখেনি। মুখ ছুটিয়ে আগুনে ঘি ঢালবে। তারিণীকে তো তুমিও চেন। ইচ্ছে হয় তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। সেবার আমি যখন কাশী যাই, সীতার সেকি যায়-যায় জ্বর। সেই অসময়ে তারিণী কী সেবা-যত্নটাই করলে। সেরে উঠে সীতা তাকে হাজার গালমন্দ করে তাড়ালে। তারিণী একটা কথা কইল না। গালাগাল খেয়ে উলটে তাকে ভালকথায় বুঝিয়ে চলে গেল। আহা আমিও একদিন সে বেচারীর মনটা ভেঙে দিয়েছি। এই বাড়ির ঠাকুরঘরে আমার পায়ে ধরে রাঘবনের সঙ্গে বিয়ের সম্মতি চেয়েছিল। 'কে জানে বাপু, কী জাতির মেয়ে, ভেবে আমি মত দিইনি। উলটে মুখের ওপর দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলুম। আজ মনে মনে ভাবি, সেদিন কেন অমন করতে গেলুম। তারিণীকে বিয়ে করলে আজ আমার ছেলে কতই সুখে থাকত। আমার মন বলে, তারিণীর মন ভেঙেছিলুম বলেই আজ তার ফলভোগ করছি। তা কী করব বল ? 'যেমন কর্ম, তেমনই ফল' তো হবেই। কর্মফল থেকে কি কেউ বাঁচতে পারে ?"

'মামীমা, যা হবার তা হয়ে গেছে। কী হলে ভাল হ'ত, তা

ভেবে এখন তো আর কোন লাভ নেই।'— সূর্য কামাক্ষীকে বলে। মনে মনে তারিণীর ওপর রাগও হয়। ভাবে—'অতীতের এমন একটা দগদগে কাহিনী থাকতে, আবার সীতা-রাঘবনের সংসারে যাওয়া-আসা তার আদৌ উচিত হয়নি।'

বলে—'বিধিলিপি কেউ খণ্ডাতে পারে না, মামী। এখন আমাদের দেখতে হবে যে কী করলে আপনার ছেলে সুখী হতে পারে। আমি আমার দিক থেকে সীতাকে বোঝাবার সবরকম চেষ্টা করব, সে চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখব না। আপনিও আপনার দিক থেকে চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, আপনি দিল্লী কবে যাচ্ছেন?'

'রাঘবনের চিঠির পথ চেয়ে আছি।—একটা কথা তোমাকে বলেই ফেলি, দোষ কী? সীতা একবার কী করেছিল, জান? শিখিয়ে পড়িয়ে এই ফুলের মতন মেয়েটার মনে বাপের বিরুদ্ধে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বাচ্চা, সে কি জানে? বাপকে বলেছে— তুমি মা-কে মার কেন, গাল দাও কেন? তাতে তারও হয়ে গেছে রাগ। রাগের বশে মেয়ের গায়ে হাত তুলে দিয়েছে। তারপর মেয়ের জ্বর।'

'উঃ!'—সূর্য শিউরে ওঠে।

'দেখ তোমারই শুনে কষ্ট হচ্ছে। আর সীতা কী করেছে জান? তিন দিন অবদি কাউকে কিছু বলেনি যে বাচ্চার জ্বর। শেষকালে কী ভাবে যেন রাঘবন জানতে পারে, তারপর ডাক্তার ডেকে আনে। মেয়েটা যে বেঁচে উঠেছে, তাই ভাগ্যি। তা এমন রাক্ষুসী স্বভাব, বুঝলে?'

সূর্য ভাবে রাক্ষুসী যদি প্রথম দিনেই ডাক্তার ডাকিয়ে ডাক্তারকে মেয়ের জ্বর হবার কারণ জানাত, তা হলে কি রাঘবন-সায়েবের মুখটা খুব উজ্জ্বল হত! কিন্তু সে কথা তো সীতার শাশুড়িকে বলে কোন লাভ নেই। বলে— 'যাকগে, পুরনো কথা ছেড়ে দিন। আমি কাল দিল্লী রওনা হয়ে যাচ্ছি। ওখানে পৌঁছে সীতার সঙ্গে দেখা করে কথা বলব। কী কথা হল তাও আপনাকে জানাব। যে

করেই হোক আপনার ছেলে আর পুত্রবধূকে সুখী করে তোলার চেষ্টা করে যাব।'

'দেখো বাবা। তাই যেন হয়। আমিও তো রাতদিন কত ঠাকুর-দেবতার থানে মানত করছি। সংসারে ঐ ছেলে-বউ আর কুটোটুকু ছাড়া আমারই বা আর কে আছে বল। নাতনিটা আমার প্রাণের বাড়া। তুমি সীতাকে যা বলবার বোলো। সেই সঙ্গে আর-একটা কাজ কোরো তো। চেষ্টা-চরিত্তির করে সীতার কুষ্ঠিটা একটু জোগাড় কোরো দিকি। যদি কোন দোষটোষ থাকে, একবার শান্তি-সস্তেন করবার ব্যবস্থা করব।'— কামাক্ষী আম্মাল বললেন।

পাঁচিশ

1943 সালের দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লী নগরীর জীবনে নিত্যি ধনবৃদ্ধি এবং জনবৃদ্ধি ঘটছিল। বিশ্বযুদ্ধ ভারত সীমান্তে এসে দোরে ধাক্কা দিচ্ছিল। দিল্লী সেই যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্যে নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছিল। ট্যাক্‌সি, রিক্‌শ, টাঙা সব-কিছুরই চাহিদা বেড়ে চলেছিল। যাত্রীদের হয়রানিও সমানুপাতে বাড়ছিল। দিল্লী স্টেশনে নেমে সূর্য এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। তারপর 'ঈশ্বর পা জোড়া দিয়েছেন কেন' এই চিন্তা মাথায় আসতেই ভাবল— কোন্‌দিকে যাওয়া যায়— নয়াদিল্লীর দিকে না পুরনো দিল্লীর দিকে ? ভেবেচিন্তে কিছু সিদ্ধান্তে আসার আগেই দেখল তার পা তাকে পুরনো দিল্লীর দিকেই টেনে নিয়ে চলেছে।

চাঁদনি চকের কাছাকাছি এসে তার গতি মন্থর হল। ততক্ষণে তার মন গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রোমন্থন শুরু করেছে।

উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতে যাবার সময় সে ধূপবাতির সদাগরের ছদ্মবেশ নিয়ে ঘুরছিল। সেই বেশেই সে দেবপত্তনমে ললিতার বাড়ি গিয়েছিল। তার মা-ও তাকে চিনতে পারেনি। শেষে পাগড়ি খুলে মুক্ত হাসির পরই মা আর বোন তাকে চেনে। তাদের বিস্ময়ের আর আনন্দের সীমা ছিল না।

তার পরদিন ললিতার ছেলের জন্মদিন। সেইউপলক্ষে কিট্টাবায়ার, সূর্যর দাদা গঙ্গাধরণ, ছোটভাই শুণ্ডু— সবাই দেবপট্টনমে এসেছিল। সূর্য গিয়ে পড়াতে চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল। সকলের মনেই পরিপূর্ণ আনন্দ। গঙ্গাধরণ বলল—'সূর্য পাঁচবছর ধরে সারা

হিন্দুস্তান ঘুরে বেড়ালি। ঢের তো হল। এবার রাজমপেট্টাইয়ে ফিরে চল। বাবার কাজকর্ম দেখ্। তোর যেমন খুশি তেমনি সংস্কার কর না। আমার কোন আপত্তি নেই।'

ললিতার স্বামী পট্টভিরামণ যে জেলে গেছে, সূর্য তা আগেই জানত। সে ললিতাকে বললে— আমাদের পট্টভি যে এমন সাহসী হয়ে উঠবে, তা কে জানত ?'

জবাবে ললিতা বলল— 'সবচেয়ে খুশির খবর কী জান, সূর্য। আর-পাঁচজনের মতন কাছারি পুড়িয়ে, লাইন উপড়ে কি পুর্ল ভেঙে জেলে যায়নি। গত দোসরা অক্টোবর এক জনসভায় দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়েই ওর জেল হয়েছে।'— বলতে ললিতা গর্ববোধ করে। ললিতা পট্টভির ঘরখানা সযত্নে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সূর্য সেই ঘরটা দখল করল।

ললিতার শাশুড়ি বছর দুয়েক আগেই দেহরক্ষা করেছেন। এখন ললিতাই এ সংসারের কর্ত্রী। কথায় কথায় সীতার কথা উঠল। সীতার কষ্টের কাহিনী সূর্যর মুখে শুনে ললিতা মর্মাহত হল।

'মা যে তোর ভাগ্যকে খুব নিন্দেমন্দ করেছিল না ? মার ইচ্ছে পূর্ণ হলে তোর বিয়ে আজ পট্টভির সঙ্গে না হয়ে সেই নিষ্ঠুর অমানুষ রাঘবনের সঙ্গে হত। বোঝ একবার ! সীতার দুঃখের কথা ভাবলে আমার বুকটা ফেটে যায়।'—সূর্য বলে।

'হ্যাঁরে দাদা। সীতা যখন নতুন নতুন দিল্লী গেল, তখন কত উৎসাহ নিয়ে আমায় চিঠি লিখত, জানিস ? আজকাল তো চিঠি লেখেই না। শুনলুম মেয়েটাকেও নাকি শাশুড়ির সঙ্গে মাদরাজে পাঠিয়ে দিয়েছে। কেন বল তো ?'—ললিতা জানতে চায়।

'সেসব কথা পরে কখনো বলব'খন। শুধু একটা কথাই জেনে রাখ যে, সীতার জীবনটা এখন একেবারে নরক হয়ে গেছে।'—ব'লে সূর্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর কথা বদলে ও সামনের বাড়ির খবরাখবর নিতে থাকে।

'দিন দুই হল ওঁর বন্ধু অমরনাথ আর তার স্ত্রী চিত্রা কলকাতা

থেকে ফিরে এসেছে। বড়দের মনকষাকষি তো সেই থেকে লেগেই আছে। মুখ দেখাদেখি নেই। ওসব পাগলামি এর একদম পছন্দ নয়। শাশুড়িও শ্বশুরের ভয়ে চুপ করে থাকতেন। আমি ভাবছি কাল জন্মদিনে ওদের নেমন্তন্ন করব।'—ললিতা বললে।

সূর্য বললে— 'নিশ্চয়ই করবি নেমন্তন্ন। আর আমি তো ও-বাড়ি যাবই।'

রাত্তিরে সূর্য সামনের বাড়িতে যেতেই অমরনাথ লাফিয়ে এসে ওকে স্বাগত জানাল— 'আসতে আজ্ঞা হোক, পায়ের ধুলো দিন। আরে ব্বাসরে, এ কী দেখছি! স্বাধীনতার বীর সৈনিক সূর্যজী!'

দুজনে হাত ধরাধরি করে ভেতরে গেলে দামোদরম পিল্লাই সূর্যর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলেন— 'আরে এই যে সূর্যনারায়ণ আয়ারজী। তবে যে শুনলুম আপনি নাকি ভারতের স্বাধীনতা আনতে আফগানিস্তানে গেছেন। আবার কে যেন বলল আপনাকে মস্কোয় দেখেছে। তারপর আবার কার মুখে শুনলুম আপনি সায়গনে এসে গেছেন। তা আপনি দেখছি এখানেই রয়েছেন। তা ভারতের স্বাধীনতার কদ্দূর বলুন দিকি। আপনারা কতটা পথ আনতে পেরেছেন। কোথা থেকে কোথায় আনলেন?'

'মামা, খুব খুশি হলুম আপনি আমার কথা মনে রেখেছেন, বরাবর আমার খোঁজখবর নেন, জেনে। তবে ভারতের স্বাধীনতা এই ভারতেই আছে। তার জন্যে আফগানিস্তান যাবার কী দরকার?' সূর্য বলে।

'ওকথা বলবেন না। শুনতে পাচ্ছি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস মালয়ে ভারতের স্বাধীনতা কায়েম করেছেন। আর জয়প্রকাশ নারায়ণ নাকি নেপাল না তিব্বতে ভারতের স্বাধীনতা স্থাপন করেছেন। তা এসব কি মিথ্যে?'—পিল্লাই প্রশ্ন করেন।

অমরনাথ বলে— 'সত্যি বলতে কি, আমেদাবাদের জেলে বসে গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল এইসব নেতারাই স্বাধীনতার যথার্থ কাজ করছেন।'

দামোদরম জিজ্ঞেস করেন—'তা এর মধ্যে কোন্ রাস্তায় স্বাধীনতা আসবে ?'

'মামা, নিশ্চিত করে কোন কথা বলা যায় না। যে-কোন পথেই আসতে পারে। তবে যখনই আসুক, যে-পথেই আসুক, তাকে গ্রহণ করার জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। তার জন্যে জনগণকে এখন থেকে প্রস্তুত করাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।'

'কী বলছেন আপনি ? স্বাধীনতার জন্যে জনতাকে প্রস্তুত করতে হবে ? সে তো কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের জনগণকে স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত করতে হলে কী দরকার জানেন ? জাপানীদের হিন্দুস্তানের ওপর হামলা করা দরকার। দশ বছর অন্ততঃ তাদের অধীনে রগড়ানো দরকার। আমাদের শায়েস্তা করার জন্যে জাপানী শাসনের চেয়ে শ্রেয় আর কিছু হয় না। জাপানীরা আমাদের টিকি ধরে ঝাঁকি মারবে, জাতিভেদ আর মতভেদ সব একেবারে জড়সুদ্ধু উপড়ে দেবে, ভাত-ডালখেকোদের চাবুকের চোটে মাছ-মাংস গেলাবে ! এইভাবে জাপানের অধীনে বছর দশেক থাকলে, শিক্ষা-টিক্ষা পেলে তখন হিন্দুস্তান স্বাধীনতার উপযুক্ত হবে। কী সূর্যবাবু, আমার সঙ্গে কি তুমি একমত ?'

'না, আমি একমত নই। জাপানীদের অধীনে গেলে দশ বছর নয়, তা হলে আরো একশো চল্লিশ বছর গোলামি করতে হবে। আমার মনে হয় জাপানীরা শাসন করতে চায় না, নেতাজীকে সাহায্য করে ভারতকে স্বাধীন করারই চেষ্টা করবে।'

অমরনাথ বলে, 'নেতাজীর ফৌজে এ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ভর্তি হয়েছে। জাপান অস্ত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করছে।'

'পঞ্চাশ হাজারই ভর্তি হোক আর পঞ্চাশ লাখই হোক। কিন্তু নেতাজী যে কবে আসবে কে জানে ! কিন্তু এখানে যে কিছু অতি চতুর পুরুষ পুঙ্গব 'স্যাবোটাজ' করতে নেবে পড়েছেন, এটা নিছক আহম্মকীর কাজ হচ্ছে ! জাপানীদের আসা অবধি অপেক্ষা করছে

না কেন? তার আগেই রেললাইন উপড়ে, পুল ভেঙে কী সুবিধেটা হবে? 'স্যাবোটাজ' তো সরকারের ক্ষতি করা নয়,.সাধারণ মানুষেরও তাতে লোকসান! এ তো নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা। আমি যদি জজ হতুম, তো এসব লোককে ধরে ফাঁসি দিতুম।'

দামোদরম পিল্লাইয়ের মুখে একথা শুনে সূর্যর মুখ চকিতে পাংশু হয়ে যায়। অমরনাথ মুহূর্তে সূর্যর মুখভাব পড়ে ফেলে। সূর্যও বুঝে ফেলে যে অমরনাথ ওর মনোভাব বুঝতে পেরেছে।

পরের দিন ধূমধামের সঙ্গে ললিতার ছেলের জন্মদিন উৎসব শুরু হল। সারা বাড়ি গুলজার। সূর্যর আগমনে ললিতার শ্বশুর আত্মানাথ আয়ার বেজায় খুশি। কারণ সূর্য এসেই সামনের বাড়ির সঙ্গে তাঁদের মনান্তর মিটিয়ে দিয়ে পুরনো বন্ধুত্বের স্রোত আবার অর্গলমুক্ত করে দিয়েছে। দামোদরম পিল্লাইয়ের সঙ্গে ওঁর আবার হাসিঠাট্টা চলছে। সকলের মুখেই সূর্যের জয়জয়কার শোনা ইস্তক ললিতার ছেলে আর কিছুতেই সূর্যর কোলছাড়া হবার নাম করছে না।

সূর্য এমন আনন্দের মুখ দেখছে আজ বহুদিন পরে। সে যখন উৎসাহ-আনন্দের জোয়ারে গা ঢেলে দিয়েছে, এমন সময় একটা গলা ওর কানে এল— এ বাড়িতে কে. এস. নারায়ণ বলে কেউ এসেছেন?

ডাকপিওন বালকৃষ্ণণ বাইরে দাঁড়িয়ে। সূর্য তার কাছে গিয়ে বলল, 'কে? বালকৃষ্ণণ। ভাল আছ? আমায় চিনতে পারছ না?'

'ও তাহলে আপনিই। আমিও তাই ভেবেছিলাম। এ চিঠি আপনার না?'

তারিণীর হস্তাক্ষর দেখে সূর্য সোৎসাহে খাম খোলে! বলে, 'হ্যাঁ আমারই।'

'ললিতাদির নামেও একটা আছে স্যর। সত্যি বলছি, খুলে পড়িনি।'

সূর্য তার দিকে তাকিয়ে হাসে। রাজমপেট্টাইয়ের ডাকঘরে থাকতে এই লোকটার নেশা ছিল অন্যের চিঠি লুকিয়ে চুরিয়ে পড়া।

সে কথা জানতে পেরে বালকৃষ্ণণের সঙ্গে একদিন সূর্যর হাতাহাতি হবার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত সূর্য তার বদ অভ্যেস ছাড়িয়েছিল। বালকৃষ্ণণ আজ বুঝি সেই কথাই বলছে। মনের কথা মনে রেখেই বলে—'বালকৃষ্ণণ কী বাজে বকছে রে?'

ললিতা বললে— 'না, বাজে বকেনি। উনি জেলে যাবার পর থেকে এবাড়ির সব চিঠিই তো 'সেন্সর' হচ্ছে, সেই কথাই ও বলছে, যে ও খুলে পড়েনি। আগেই খুলে পড়া হয়েছে।'

শুনে সূর্য কিঞ্চিৎ উদ্‌বিগ্ন হল। নিজের চিঠিটা তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে লাগল। তারিণীর চিঠিতে পুলিসের কাজের জিনিস কিছুই ছিল না। কিন্তু উদ্‌বেগের অন্য খবর ছিল— 'পিসতুত বোনের দশা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। শরীর মন দুই-ই খারাপ। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন। তাড়াতাড়ি না এসে পড়তে পারলে ভালমন্দ কিছু ঘটে যাবার আশঙ্কা আছে।—ইতিহাস।' খুবই সংক্ষেপে লেখা চিঠি। আন্দোলনের প্রয়োজনে তারিণীর ছদ্মনাম—'ইতিহাস', সূর্যর নাম—'দূত'।

চিঠি পড়ে সূর্য বিচলিত হল খুবই। যে কাজের জন্যে ওর দক্ষিণে আসা, সেটা এখনো পুরো হয়নি। তবুও ওকে ফিরে যেতে হবে। বড়ই দোটানা। আচ্ছা এক পিসতুত বোনের পাল্লায় পড়েছে, নাজেহাল! আর স্বামীটাও হয়েছে এক অমানুষ। বদমাস কোথাকার। কে জানে মেয়েটার কপালে কী আছে।

বেলা দশটা নাগাদ দামোদরম পিল্লাইয়ের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল।

'থানা থেকে? কী ব্যাপার? সামনের বাড়িতে? আমি তো ও-বাড়ির ছায়া মাড়াই না। কিছুই বলতে পারব না। তা চলে আসুন। আমি নিজের বাড়িতে বসেই তামাশা দেখব'খন!'—রিসিভার নামিয়ে রেখে দামোদর পিল্লাই ছেলেকে ডাক দেন—'অমরনাথ!'

'কী বলছেন বাবা ?'

'মনে হচ্ছে তোমার বন্ধু সূর্যর ব্যাপারে এখানকার পুলিস কিছু খবর পেয়েছে। ডি. এস. পি. আমায় জিজ্ঞেস করলেন। আমি বলে দিলুম যে সামনের বাড়ির সঙ্গে আমার জন্মগত শত্রুতা। এখনই ওরা এসে পড়বে। এখন আমরা যদি ওবাড়ি যাই, তাহলে আমি যা বলেছি সেটা মিথ্যে বলে প্রমাণ হবে।'

'তা হলে কী করা যায়, বাবা ? সূর্যকে সাবধান করে দেওয়া তো দরকার।'

'তোমার বিবেচনায় যা হয়, করতে পারো। আর পনোরো মিনিটের মধ্যে পুলিস এসে পড়বে। সেটা বুঝে যা করবার করবে। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। এ বাড়িতে আমার যতটা অধিকার, তোমারও ততটাই অধিকার। তাকে এ বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে চাও তো তাও করতে পারো। যাই কর, চটপট করো। সব তোমার নিজের ইচ্ছেয় করবে। আমায় জিজ্ঞেস করবে না। বুঝেছ ?'

পরমুহূর্তেই অমরনাথ নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের বাড়ি চলে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সূর্যকে নিয়ে ফিরে এল। ওপরতলায় ভেতর বাড়ির একখানা কামরায় তাকে পুরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল।

এরপর যা ঘটতে লাগল, সে কথা মনে করে সূর্যর রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। আত্মানাথ আয়ারের বাড়ির জনে জনের ওপর পুলিসের লাঠি পড়তে থাকল। আর সামনের বাড়ির দোতলার রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে সূর্য কাপুরুষের মতন হাত কামড়াতে লাগল। আর সেই কথা ভেবে ভেবে রাগে-ক্ষোভে কেঁদে ফেলল। কী ভয়ংকর নিয়ম—'গাধা ক্ষেতে পড়েছে বলে জোলার মাথায় লাঠি।'

সেদিন রাত্তিরে অমরনাথ তার গাড়িতে সূর্যকে নিয়ে গিয়ে গ্রামের ইস্টিশানে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে এল। সি. আই. ডি.-র ভয়ে সূর্য সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে মাদ্রাজে এল। কামাক্ষী আম্মার সঙ্গে দেখা করার পর তারিণীর চিঠি অনুযায়ী দিল্লী রওনা হয়ে গেল।

এখন তারিণীর সঙ্গে কোথায় কী ভাবে দেখা করা যায় ভাবতে ভাবতে সূর্য এগিয়ে চলে। তার চোখজোড়া কারুর খোঁজে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে চাঁদনি চক পেরিয়ে জুম্মা মসজিদের কাছে এসে পড়ল। মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে বেশ খানিকটা ওঠার পর সূর্য একটু দাঁড়াল। আশেপাশের রাস্তার ওপরে চোখ বুলোল। লালকেল্লার দিকে তাকিয়ে রইল। এই মসজিদ আর এই কেল্লার চারপাশ কোনো যুগে মানুষে ভরে থাকত। হাজার হাজার ঘরবাড়ি ছিল এখানে। ফিরিঙ্গি ফৌজ কামান দেগে উড়িয়ে দিয়ে জায়গাটাকে শ্মশান করে দিয়েছে। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদও একসময় গোরা সৈন্যের অধীন ছিল। তৈমুরলং, নাদির শাহ, আহমদশা— এরা ছিল বর্বর যুগের রাক্ষস। কিন্তু শিক্ষিত-সভ্য বলে যারা নিজেদের জাহির করে সেই সুসভ্য ব্রিটিশ শাসক এদেশে, এই নগরীর ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে তার কি কৈফিয়ত?

কিন্তু এদেশের হিন্দু-মুসলমান তাদের তুচ্ছ সংকীর্ণ মনান্তর ছেড়ে ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াতে পারবে কি? দিল্লীর সৌধশীর্ষে স্বাধীন ভারতের পতাকা কি কোনদিন উড়বে? নিজের চোখে সেই সুদিন দেখে যাবার ভাগ্য কি তার হবে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্য এইসব কথা ভাবছে— চমকে উঠে দেখল তার বাঁ হাতটা একজোড়া লোহার সাঁড়াশির মতন হাতের মধ্যে বন্দী হয়েছে।

ছাব্বিশ

লোহায় গড়া হাত দুটোর অধিকারী লম্বাচওড়া হৃষ্টপুষ্ট একটা পুলিস। মুহূর্তে সূর্যর মনে হাজার চিন্তা খেলে যায়। এতদিন এত দীর্ঘ সফর করে বেড়াল, ধরা পড়ল না। হায় রে বরাত। শেষ পর্যন্ত আলসেমির জন্যে বিখ্যাত সেই দিল্লী পুলিসের হাতেই ধরা পড়ল। চিন্তা ভয় চেপে রেখে ধমকে উঠল— 'কে তুমি? আমার হাত ধরলে কেন?'

'ইন্সপেকটর সায়েব ডাকছেন।'

শুনে সূর্যর বুক দমে গেল। তবুও বেপরোয়া হয়ে বললে—'কে তোমার ইন্সপেকটর আমি চিনি না। তাঁর সঙ্গে আমার কোন দরকার নেই। আমি যাব না।'

পাহারাওলা বলল— 'তাঁকে দেখলে একবার, আর এসব কথা বেরোবে না। চল, জলদি!' সূর্য একটু সচকিত হল। লোকটার চোখে ঔদ্ধত্য, কিন্তু স্বর মৃদু আর ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে তর্ক করার চেয়ে সঙ্গে যাওয়াই ভাল ভেবে জিজ্ঞেস করল— 'আচ্ছা, যাচ্ছি। কোথায় তোমার ইন্সপেকটর সায়েব?'

'চুপচাপ চলো আমার সঙ্গে। কিন্তু একটু দূরে দূরে চলো। কয়েক পা পেছনে পেছনে এসো। পালাবার নাম করবে না। আমি তোমাকে ইন্সপেকটর সায়েবের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'—সেপাই আগে আগে সূর্য পেছনে পেছনে চলল।

আজকাল যার নাম 'গান্ধী ময়দান' তার কাছাকাছি গিয়ে সেপাই দাঁড়াল। সূর্য কাছাকাছি আসতে একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল—'ঐ গাছের আড়ালে যাও, ওখানেই আছেন।'

লোকটার মুখে হাসি লেগেই আছে। সূর্য অবাক হল। তাড়াতাড়ি হেঁটে গাছের কাছে গেল। গাছের তলায় নিবিষ্ট মনে বই পড়ছেন এক মহিলা। সূর্যর পায়ের শব্দে তন্ময়তা ভেঙে মুখ তুলল মেয়েটি। সূর্য যেমন অবাক, তেমনি খুশি। তারিণী!

সাড়ম্বরে সূর্যকে অভ্যর্থনা জানাল তারিণী—'আসুন বীরবর সূর্যাজী। আপনার পায়ের ধুলোয় মাটি পবিত্র হোক।'

'ও তাহলে আপনিই ইন্সপেক্টর সায়েব? আমি প্রথমটায় ভড়কে গিয়েছিলাম একটু।' সূর্য গাছতলায় তারিণীর মুখোমুখি বসতে বসতে বলে—'আপনার শক্তিমত্তার পরিচয় আমি পেয়েছি, তবে পুলিসদেরও জালে পুরেছেন এতটা ধারণা ছিল না।'

তারিণী বলে—'এবার বলুন, যাত্রার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে তো?'

'কী করে হবে? তার আগেই আপনার চিঠির জরুরী তলব এসে গেল। সেই চিঠির দৌলতে দেবপট্টনমে যা ঘটেছে শুনলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। সীতার কী হয়েছে যে আপনি অত জরুরী চিঠি লিখলেন। সত্যি, সীতার কথা ভাবলে বেজায় রাগ হয়। একটা মেয়ের জন্যে, ভাবুন তো, দেশের কত কাজ আটকে যাচ্ছে! কর্তব্যে ঢিলে পড়ছে।'

'আমার তা মনে হয় না। দেশের রাষ্ট্রের সমস্ত কাজ আমাদেরই দায়িত্বে— এটা একটা মোহ। 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি…।' ভগবানের ইচ্ছেতেই সব হয়। আমার মতে দেশোদ্ধারের চেষ্টার চেয়ে চেনাশোনা কোন লোকের দুঃখ দূর করার চেষ্টা শ্রেয়তর আর বেশি ফলপ্রদ তো বটেই। সবচেয়ে আগে আমি চাই সীতার দুঃখ দূর হোক।'

'সীতার ওপর আপনার এই অপার করুণার কোন কারণ আমি বুঝতে পারি না।'

'কারুর ওপর কারুর স্নেহের কারণ কি একটা থাকতেই হবে?'

'না, এমন কোন কথা নেই। হেতু ছাড়াই মেয়েরা লুচ্চা-লম্পটদের প্রেমে পড়ে।'

'আপনার কথার মানে ঠিক ধরতে পারলাম না। মেয়েরা কেবল লুচ্চাবদমায়েশদের প্রেমে পড়ে— তাই বলতে চান? তা আমি মানতে পারলাম না। মেয়েদের প্রেমাস্পদ কিছু ভাল মানুষও আছেন, জানি।' এরকম একজন ভাল লোককে আমিই তো চিনি।'

'জানি, জানি' সূর্য ঝেঁজে ওঠে, 'সে ভাল মানুষের নাম সুন্দর রাঘবন। তাই তো।'

'রাঘবনের কথা আমি বলিনি। এমনিতে তাঁকেও আমি খারাপ লোকের' মধ্যে গণ্য করি না। হতে পারে হয়তো তাঁর কিছু ভুলচুক হয়েছে। কিন্তু সীতার প্রতি তাঁর যে কী আন্তরিক মমতা, আমি ভালই জানি। সীতা মিথ্যে ভ্রান্তিতে পড়ে তাঁর সমস্ত প্রেমকে বিষ করে তুলছে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হয়, রাঘবনের অন্তরের খবর সীতার চেয়ে বেশি করে আপনারই জানা আছে।'

'কোন জিনিসের ভালমন্দ, অনেক সময় কাছের মানুষের চেয়ে দূরের মানুষের চোখেই বেশি করে ধরা পড়ে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে, সীতার চেয়ে রাঘবনের অন্তরের খবর হয়তো আমিও বেশি জানতে পারি।'

'কে জানে? হয়তো সীতার চেয়ে আপনিই রাঘবনের অন্তরের বেশি ঘনিষ্ঠ।'

'সূর্য! মনে হচ্ছে আপনার মনে কোন একটা ভ্রম কাজ করছে। এরকম ভাবে কথা বলেন তো আমার কথা বলার দরকার নেই। আপনি চলে যেতে পারেন।'

'ময়দানটা কি আপনার অধিকৃত এলাকা?'

'আচ্ছা, তবে আমিই যাচ্ছি।'—তারিণী উঠে দাঁড়ায়। সূর্য তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বলে—'তারিণী, আমি আমার কথা প্রত্যাহার করছি। আমি যা ভুলটুল বলেছি, ক্ষমা করুন, দয়া করে বসুন।'

তারিণী আবার বসল। বলল— 'জানি না হঠাৎ আপনার মধ্যে

এই পরিবর্তন কেন? কেউ কি কোন কথা বলে আপনার মন খারাপ করে দিয়েছে? সীতার সঙ্গে দেখা করে তারপর আসছেন নাকি?'

'না। স্টেশনে নেবেই সরাসরি এসেছি। এখনো নিজের ঘরে যাইনি। সীতা কেমন আছে? তার ব্যাপারে আমার করবার কী আছে?'

'তার মনটা বিষিয়ে রয়েছে। আপনি তার মন বোঝবার চেষ্টা করুন। আমার মনে হয় ওকে কিছুদিনের জন্যে বাইরে পাঠাতে পারলে হয়।'

'সে গেলে তো। আর যাবেই বা কোথায়। কার আশ্রয়ে? আমার মতে তারিণী, সীতাকে সুখী করার একটাই পথ আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ। কিন্তু কি হিন্দুশাস্ত্র কি ব্রিটিশ কানুন— এর কোন উপায় নেই। কাজেই তিলে তিলে মরা ছাড়াও তার কোন উপায় নেই।'

'আমার মনেও এরকম ভাবনা এসেছে। দক্ষিণে তো মামাতো পিসতুত ভাইবোনের বিয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। আপনার সঙ্গে যদি সীতার বিয়ে হত, দুজনেই সুখী হতে পারতেন।'

'না। মোটেই না। আপনার ধারণা একেবারে ভুল। সীতার প্রতি আমার ভালবাসা ও-জাতের নয়। আমি পিসিকে শ্রদ্ধা করতাম, তাই তার মেয়ের মঙ্গল কামনা করি। নইলে সীতার চিন্তাধারার সঙ্গে আমার আদর্শের কোন সমতা সামঞ্জস্য নেই। সীতা প্রজাপতি জাতের মেয়ে। চাকচিক্য ঠাট-জুলুসে ওর জোরাল আসক্তি। পার্টিতে জলসায় যেতে পারলে তার জীবন ধন্য বলে মনে করে।'

'আহা সেটা কি আর ওর সহজাত চরিত্র? ওটা অন্যের দেখা-দেখি শিখেছে, ওটা একটা অভ্যেস। তার জন্যে ওকে দোষ দেওয়া অন্যায়। আপনি যান, তাড়াতাড়ি, ওর মনের অবস্থাটা জানুন আগে। আমার সঙ্গে প্রায় দিন কুড়ি দেখা হয়নি। কেমন আছে বেচারী জানি না, চিন্তায় অস্থির হয়ে রয়েছি।'

'ঠিক আছে। আমি গিয়ে দেখে আসব'খন।— কাল কি আমাদের এখানেই দেখা হচ্ছে ?'

'না, না। একবার চোখটা ফেরালেই বুঝতে পারবেন যে কতজনের নজর আমাদের ওপর। কাল বাড়িতেই দেখা হবে। আমাদের বন্ধুরা আপনার যাত্রার অভিজ্ঞতা শোনার জন্যে লালায়িত হয়ে রয়েছেন। কাল এই সময় ঘণ্টাঘরের কাছে থাকবেন। পুলিসের সেপাই ইন্দুলাল আপনাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে আসবে। এখন আমার সঙ্গে আসবেন না। আমি যতক্ষণ না ঐ পাহারা-ওয়ালার কাছে গিয়ে পড়ি, ততক্ষণ আপনার গাছতলায় বসে থাকাই ভাল।'— বলে তারিণী উঠে পড়ে।

সূর্য সেখানে বসে বসেই দেখল তারিণী আর সেপাই অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা যাবার পর সূর্যও মনে মনে স্থানত্যাগ করার কথা ভাবছে, এমন সময় দেখল তিনজন লোক যারা এতক্ষণ ওদের কাছাকাছি বসেছিল, এখন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। সে বসে বসে ওদের কাছে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তিনজন ওর কাছে এসে ওকে ঘিরে বসল। তাদের মধ্যে একজন ওকে প্রশ্ন করল— 'ভাই তুমি কোথাকার লোক ?'

'মাদ্রাজের'— সূর্য জবাব দিল।

'এখানে যে মেয়েটা বসেছিল, সে তোমার কে হয় ?'—একজন শুধোয়।

'আমার বন্ধু।'—সূর্য বলে।

'ওহো। তোমার বন্ধু!'—তিনজনে সমস্বরে বলে ওঠে।

তারপর কিছুক্ষণ কথাবার্তা আর এগোয় না। সূর্য অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে—'তোমাদের কী চাই কী ? কীজন্যে জিজ্ঞেস করছ ?'

একজন বললে—'ভাল বলেছ ভাই। আরে বলছি বলছি। কথা বলতেই তো আসা। না বলে কি আর চলে যাব ?'

আর একজন বললে—'বলেই ফেলি না ?'

বাকি দুজন বললে—'বলেই দিবি নাকি ?'

প্রথম জন তখন সূর্যকে জিজ্ঞেস করল—'তোমার টাকা চাই ?'

সূর্য জিজ্ঞেস করল—'কত টাকা ?'

তখন প্রথমজন আবার বাকিজনকে জিজ্ঞেস করলে—'জানতে চাইছে কত টাকা ? বলব ?'

'হ্যাঁ, বলে দে না।'—বাকিরা ঢালাও সম্মতি দেয়।

প্রথমজন তখন পাকাপাকি প্রস্তাব দেয়— 'কী ভাই, এক লাখ টাকা নেবে নাকি ? পুরো লাখ টাকা ? নেবে ?'

সূর্য হকচকিয়ে যায়। কিন্তু সে ভাবটা সামলে নিয়ে বলে—'জাল নোট না সাচ্চা টাকা ?'

'হা-হা জাল নোট !'—তিনজনে হেসেই খুন।

পয়লা লোকটা বলে—'নারে ভাই জালটাল নয়, আসল টাকা। তোমার নোট নিতে আপত্তি থাকলে আমরা খাঁটি সোনায় দেব।' শেষকালে ওদের একজন দ্বিধা সংকোচ করে বললে—'এক লাখ টাকা তো আর এমনি পাওয়া যায় না ! তুমি যদি আমাদের একটা কাজে সাহায্য কর তো পাবে !'

'নিশ্চয় করব। বল কীরকম সাহায্য চাও ?'

'খানিক আগে যে মেয়েটার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে না ? একটা বড় জায়গা থেকে আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে ঐ মেয়েটাকে আনবার। এই কাজে তুমি আমাদের সাহায্য করলে নগদ লাখ টাকা পাবে।'

এই ধরনের কোন প্রস্তাবই সূর্য প্রত্যাশা করছিল। তবুও কানে শোনার পর ওর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল যে রাগ করে কোন লাভ নেই। ওরা তিনজন আর প্রত্যেকেই বেশ তাগড়া। ওদের সঙ্গে ঝগড়া ফেসাদ করলে অনেক কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে। রাগ মনে চেপে ও খানিকক্ষণ ভাবনাচিন্তার ভাণ করল। তারপর বলল—'দুটো দিন সময় দিতে হবে। ভেবে বলব।'

'ঠিক আছে। তা হলে কবে কোথায় আমাদের দেখা হচ্ছে ?'

'এখানেই, এই জায়গায়, ঠিক এই সময়, কাল, না, পরশু দেখা হবে।'

'তুমি থাক কোথায়?' একজন প্রশ্ন করে।

'আপাতত কোনো থাকার জায়গা নেই। কোথাও একটা খুঁজে বার করব।' বলে সূর্য উঠে পড়ল। ওরাও উঠে পড়ল।

সূর্য যেখানেই যায় কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ঐ তিনজনও তার পিছু নেয়। কাজেই সূর্যকে বিনা কারণেই খানিক এগলি ওগলি ঘুরে বেড়াতে হল। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে 'সরে পড়বার ফিকিরেই ওর বেশ রাত হয়ে গেল। তবুও স্থির করল আজ রাত্তিরেই যে করে হোক সীতার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

সাতাশ

সীতা একা ঘরে বসে। দেয়ালঘড়ি টিক্‌টিক্‌ করে চলেছে। সীতার কলজেও তার সঙ্গে ধক্‌ধক্‌ করে চলেছে।

রাত্তির এখন সাড়ে এগারোটা। আর আধঘণ্টা ওর পরমায়ুর মেয়াদ। তার মধ্যে ওকে অনেক কাজ সেরে ফেলতে হবে। স্বামীর নামেও দু'ছত্তর লিখে রাখা উচিত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারছে না। কী করবে এখন? ঠিক রাত বারোটার সময় রিভলবারের গুলিতে নিজেকে শেষ করে দেবে বলে সংকল্প নিয়েছে সীতা।

নটা না বাজতেই ভাল ভাল গয়না পোশাক পরে প্রসাধন সেরে প্রস্তুত হয়ে গেছে। মরতে গেলে সাজগোজ করে মরাই তো ভাল।

প্রথমে মেয়ের চিঠিটা শেষ করাই ভাল। কিন্তু তার মুখটা মনে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়ে সীতা। মরার আগে মেয়েটার মুখ দেখে মরতে পারল না।··· কী লিখবে মেয়েকে?

আচ্ছা এক কাজ করা যাক। ললিতাকেই আগে লিখি! এই কথা ভেবে চিঠি লিখতে শুরু করে: 'প্রিয় সখি ললিতা···' তারপরে আর কী লিখবে ভেবে পায় না। সমস্ত পুরনো স্মৃতি ভিড় করে মনে হানা দেয়। আহা! বিয়ের আগে রাজমপেট্টাইয়ের দিনগুলো কত মধুর, কত আনন্দময় ছিল। ললিতার সঙ্গে কত মনের কথার আদান-প্রদান। তারপর রাঘবনের সেই 'মেয়ে দেখতে' আসা, ললিতার বদলে তাকেই পছন্দ করা, সেই কথা শুনে মনের কি তোলপাড়! আহা কোথায় গেল সেই আনন্দের দিন। সেদিন কোথায় লুকিয়েছিল আজকের এই নরকযন্ত্রণা!

আজ আর ললিতাকে চিঠি লিখে কী লাভ? সে বেচারী আছে তার সুখের সাধের সংসারে ডুবে, থাক্-না। তাকে আর নিজের দুর্ভোগের ভাগী করে কী হবে? তার দু'ফোটা চোখের জল পেয়েই বা আমার কী আসবে যাবে? আমি তো মরছি।

স্বামীকে চিঠি লেখার চিন্তা হতেই মনে হল এখনই বুকটা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। কী লিখবে?

'তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার দ্বিতীয় কোন আশ্রয় নেই। সেই তুমিই যখন আমায় মন থেকে দূর করে দিয়েছ, তখন সংসারে কারুর বোঝা হয়ে বেঁচে থাকার আমার দরকার কী? তাই....'— এইরকম লিখবে? 'তুমি আজকাল কথায় কথায় আমায় মরতে বল। তাই তোমার কথামতই আজ মরছি।' 'লিখব নাকি'?... ভাবতে ভাবতে সীতার চোখদুটো জলে ভরে যায়। তার স্বামী তার ওপর অসংখ্য অত্যাচার করেছে। তাতেও তার তত কষ্ট হয়নি। কিন্তু 'মরে যাও' 'মরতে পার না' শুনে আর তার হৃদয় বাঁধ মানে না।

সত্যিই তো মরা ছাড়া তার আর উপায় কী? মা নেই। বাপের খোঁজ নেই। কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবে? কে আছে আর ওর।

ভালই হয়েছে যে রাঘবন রিভলবার কিনেছে। স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে সীতা। তবে সেই ভাল। কৃতজ্ঞতা জানিয়েই চিঠি লিখে যাবে সীতা। একি ঘড়িটা এত দ্রুত চলছে কেন? বুকটা এত ওঠাপড়া করছে কেন? একি বারোটা বাজে! আর মিনিট কয়েক মাত্র বাকি! সাড়ে বারোটার সময় উনি এসে পড়বেন। ওঁর আসার আগেই সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়া দরকার। উনি বাড়িতে থাকতে এসব কাজ করলে মিথ্যে ওঁর ওপর হত্যার দায় এসে পড়বে। মেয়েটার মা থাকছে না। অন্ততঃ বাপ থাকলে দেখাশুনো করতে পারবে।

বাকি কয়েক মিনিটও কেটে গেল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা

বেজে গেল। সীতা এক···দুই···করে বারোটা ঘণ্টা গুনল। তারপর পিস্তলটা হাতে নিতে যাবে— এমন সময়···সীতার হাত থেমে গেল; হৃৎস্পন্দন একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল— কে যেন আসছে। কে? রাঘবন? সে কি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল?

হাতে রিভলভার দেখলে কি সে বুঝতে পারবে আমি কী করতে যাচ্ছিলাম? আমার মনোবেদনার পরিমাপ করতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে মাপ চাইবে?

পায়ের শব্দ কাছাকাছি আসার পরেও সীতা মুখ ফেরায় না। কেন ফেরাবে? যে এল সে পেছনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে রিভলভার কেড়ে নিয়ে ধমক দেয়—'সীতা!'—রাঘবনের গলা তো নয়!

সীতা অবাক হয়ে মুখ ফেরায়। সূর্য! সীতা মর্মান্তিক নিরাশ হয়। মুহূর্তে সীতার মনে এক বিচিত্র পরিবর্তন আসে। তার আত্মহত্যার সংকল্প দূর হয়ে যায়। সীতা ভাবে, মরতে যাবে কেন সে? তার চেয়ে বরং সে বেঁচে থেকেই রাঘবনকে জ্বালাবে, তার মনে কষ্ট দেবে। 'সূর্য, তুমি। বড় ভাল সময়ে এসেছ, এসো এসো!'—সীতা সূর্যকে স্বাগত জানাল।

'খুব ভাল সময়ে এসেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। তুমি যে পুণ্য কর্ম করতে যাচ্ছিলে তাতে বাধা দিয়ে ফেললাম— আমি এসে।'

'আমি কী করতে যাচ্ছিলাম বলে তোমার ধারণা?'

'আদ্ধেক রাত্তিরে হাতে রিভলভার নিয়ে একলা বসে আর লোকে কী করে বলো?'

'কোন চোর এলে তাকে মারার জন্যেও তো হতে পারে! তুমি কী ভেবেছিলে?···আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি? ওরকম পাগলামি করবার পাত্রী নই আমি!'

'তা যদি হয় তো খুবই খুশির কথা। কিন্তু তোমার মুখ চোখ দেখে আমি যা ভেবেছি, সবাই তাই ভাববে। এদিককার যা খবর-টবর পেয়েছি, তাতেও ঐ ধরনের আশঙ্কাই করা হয়েছে।'

'খবর? তোমাকে আমার খবর দিলে কে?'

'সে খোঁজে তোমার দরকার কী? দিয়েছে কেউ!'

'আচ্ছা থাক্। তা কী লিখেছে সেটা তো বলতে পারো?'

'লিখেছিল যে তুমি খুব মনোকষ্টে আছ। তাই জানতে এলাম যে কী তোমার মনোকষ্ট। কোনো ব্যাপারে কোন অসুবিধে নেই তো তা হলে! যাক আমার দুশ্চিন্তা দূর হল। এখন তবে যাই।'

'সূর্য। বোসো। তোমার কাছে লুকোবার কিছু নেই। তোমায় আমার বিশেষ প্রয়োজন। তাই বলছিলাম বড় ভাল সময় এসেছ। হ্যাঁ সূর্য। আমি মরব বলেই রিভলবার হাতে নিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটাকে একটা কিছু লিখে যেতে ইচ্ছে করছিল···কীই বা লিখি! ভেবে পাচ্ছিলাম না। তোমাকে বলে যাই। কখনো না কখনো তোমার সঙ্গে তার দেখা তো হবেই। তখন তাকে বলে দিয়ো।'

সীতার কণ্ঠ বেদনায় কম্পমান।

সূর্য বলে— 'শোনো সীতা, আমি মাদ্রাজ হয়েই আসছি।'

সীতা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে— 'তবে তুমি বাসন্তীকে দেখে এসেছ?'

'হ্যাঁ, দেখে এসেছি। তোমার শ্বশুর শাশুড়িকেও দেখে এসেছি।'

'বাসন্তী কেমন আছে? তোমার সঙ্গে কথা বলেছে?'

'শরীর ভালই আছে। তবে মা-বাপকে দেখবার জন্যে মনে মনে নিশ্চয়ই আকুল হয়ে থাকে। এমন মিষ্টি ফুলের মতন সন্তানকে ছেড়ে গুলি খেয়ে মরতে চলেছিলে কী করে? যতই ভাবি অবাক হয়ে যাই।'

'এই থেকেই তুমি আমার দশাটা আন্দাজ করতে পারো, সূর্য। পেটের মেয়েকে দূরে সরিয়ে রেখে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি— সে কি সাধ করে? জীবনে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি।'

'দেখ সীতা, স্বর্গ নরক সবই কল্পনার ফসল। মানুষ যেমন চায় তেমনই বাস করতে পারে। পৃথিবীকে স্বর্গপুরী কি নরকময় করে তোলাটা মানুষেরই ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।'

'এসব বৈদান্তিক জ্ঞান আর আমার কাজে লাগবে না ভাই।

তোমরা সবাই মিলে একদিন আমায় এই নরকে ঠেলে দিয়েছ। এঁকে বিয়ে করে আমি বড় ভুল করেছি সূর্য। আমাদের দুজনের মধ্যে এতটুকুও মিল নেই। এর উচিত ছিল কোনো ফিরিঙ্গি কি পারসী মেয়েকে বিয়ে করা। তোমারই বন্ধু তারিণী, কিংবা তারই মতন আর কেউ হ'লে...'

'অন্যলোকের কথা আমরা তুলব কেন, সীতা?'

'বলব না কেন? আমার রাস্তায় না এলে আমি বলতে যেতুম না! এই তারিণী আর আমার শাশুড়ি দুজনে মিলে আমায় বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিল, জানো সূর্য! যখন আমি রোগে শয্যাশায়ী, সেই সময়।'

'সীতা তুমি পাগল হয়ে গেছ না কি? তোমার অসুখের সময় ওঁরা দুজনে তোমায় সেবাশুশ্রূষা করে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। আর আজ তুমি তাঁদের বিরুদ্ধে এইরকম সাংঘাতিক কথা বলছ?'

'ওঁরা যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন সে কথা তুমি কার মুখে শুনলে? ওঁদেরই মুখ থেকে তো? যাক, এক কথা একশোবার বলে কোন লাভ নেই। আমি অসহায়, নিরুপায়, আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করবে কেন? তুমি কেন এলে এখানে? যাও, নিজের কাজে যাও।'—সীতা কাঁদতে থাকে।

'নিজের কাজেই গিয়েছিলাম। অনেক কাজ ফেলে রেখে হাজার মাইল ছুটে এসেছি, নিজের কাজ করতে নয়। আমার শুধু একটাই ইচ্ছে—তুমি সুখী হও। বলো কী করলে তুমি সুখী হতে পার? স্বামীর বিরুদ্ধে তোমার কিসের অভিযোগ? আমায় বলো। আমি তাকে ভয় করি না।'

'তুমি ভয় কর না, আমি করি। তার সঙ্গে কথা বলে তোমার কোন লাভ হবে না। তোমার ওপর যে-বিষ ঢালতে পাবে না, সেটা সুদসুদ্ধ আমার ওপর ঢালবে। জানতে চাও তার বিরুদ্ধে আমার কী নালিশ? আমার ওপর দিয়ে যা ঝড় বয়ে গেছে, তা

বললেও কেউ বুঝতে পারবে না। মেয়েমানুষই বোঝে না তা তুমি তো পুরুষ, তুমি কি বুঝবে? হুকুম হল—'পার্টিতে চলো।' নিয়ে গেল। সেখানে তাঁরই মন রাখার জন্যে যাই করি সবই তাঁর চোখে মন্দ, সব তাতেই ছিদ্র অন্বেষণ করবেন। মনে কর দু'পাঁচজনের সঙ্গে খোলামনে কথা বলতে গেলাম, অমনি বলবেন— 'কথার সাগর একেবারে। নিজের মুখ্যমি জাহির না করলে আর চলছিল না, না? মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে শেখনি? আমার মান ইজ্জত একেবারে ধুলোয়-মিশিয়ে দিলে।' গালমন্দর ভয়ে যদি চুপ করে থাকি, তাহলেও নানান চিপটেন কেটে কথা—'কেন অমন একচোরা হয়ে গোমড়া মুখে বসে থাকবার কী হল? পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পার না? তোমার মতন মুখ্যুকে বিয়ে করে যে কী আহাম্মকী করেছি!' যদি হাসি, কথা কই তো গালমন্দ করবে, মুখ বুজে থাকলে বিদ্রূপ করবে। তাতেও যদি না কাঁদি তো বলবে, অনুভূতি নেই, ভোঁতা, বেকুব! চারদিক থেকে ঘা খেয়ে অসহায় হয়ে ঘরের কোণে বসে যদি কান্নায় ভেঙে পড়ি, তাতেও নিস্তার নেই। ঝেঁজে বলবে, 'এ রকম করে আমার জীবনটা নষ্ট করছ কেন? মরতে পার না?' যখন তখন 'মরো, মরে যাও' মুখের বুলি। শুনে শুনে আমার ভেতরটা ঝাঁজরা হয়ে গেছে। আমি কোথায় যাই বলতে পার? মরব যে তাও তো মরবার আর জায়গা নেই, এই বাড়ি ছাড়া। মরণ ছাড়া আমার আর কোন রাস্তা নেই। দাও, পিস্তলটা দাও।'

'শোনো সীতা। মরবার কথা ভুলে যাও। ওরকম নিরাশ্রয় তুমি নও। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমি তোমায় ভেসে যেতে দেব না। বিপদ যত বড়ই হোক, উদ্ধারের পথ আছেই জানবে। কটা দিন তুমি সবুর করো। আমি ভেবেচিন্তে একটা রাস্তা বের করবই।'

'আর একদিনও সবুর করার উপায় নেই আমার। আমায় যদি বাঁচতে হয় তবে তার একটাই পথ আছে। কিন্তু সেটা তোমার পছন্দ হবে না।'

'তবু বলো শুনি, কী এমন রাস্তা। যদি মানবার মত হয়...'

'আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো। এই দিল্লী শহর আমার কাছে নরক হয়ে গেছে। তুমি আমায় যেখানে খুশি নিয়ে যাও, আমি চোখ বুজে তোমার সঙ্গে যাব। বোম্বাই, কলকাতা, লাহোর, লঙ্কা, লণ্ডন, আমেরিকা যেখানে বলবে আমি যেতে প্রস্তুত।'

'বোন, যদি সেই সময় কখনো আসে, যদি দরকার পড়ে তো আমি নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু এখন তার উপযুক্ত সময় নয়।' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শরিক, আমি। সহকর্মীদের কাছে আমি শপথ নিয়েছি, ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কাজে আমি মন দেব না। ভারত স্বাধীন হয়ে যাক। তারপর...।'

'তা হলে এক কাজ করো। আমায় নিয়ে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর যে-কোন আশ্রমে ছেড়ে দাও। শুনেছি তাঁর আশ্রমে বহু দুঃখী অনাথিনী থাকে। বিলিতী মেমসায়েবও থাকে। মুসলমান মেয়েও আছে শুনেছি। আমায় সেখানে রেখে এসো। ভারত স্বাধীন হলে আমায় নিয়ে এসো।'

'মহাত্মাজী তো এখন জেলে। এখন তাঁর আশ্রমে কে আছে, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানি না। তাঁর অবর্তমানে আশ্রমে এখন নতুন করে কাউকে নেওয়া হবে না।'

'তা হলে এক কাজ করো। কোন-একটা ভাল সিনেমা কোম্পানিতে আমায় ভর্তি করে দাও। দেখবে আমি অভিনয়ে সুনাম করব। আমি তামিল আর হিন্দি ছবি অনেক দেখেছি। শোকের ভূমিকায় অভিনয় কেউ করতেই পারে না। আমি যদি সুযোগ পাই, দুঃখের পার্ট এমন ভাল করব যে লোকে অবাক হয়ে তারিফ করবে। দু'দিনেই 'অদ্বিতীয় চিত্রতারকা' হিসেবে আমার খ্যাতি হবে। কী বল?'

সূর্য আর কী বলবে? সীতার কথা শুনে তার বাক্‌স্ফূর্তি হয় না। কোথায় গান্ধী আশ্রম আর কোথায় সিনেমা-স্টার হবার স্বপ্ন!

সূর্য হতবাক হয়ে ভাবে সীতার সত্যি সত্যি বুদ্ধিভ্রংশ হল না তো? স্থির করল আজ দু-চারটে সান্ত্বনার কথা বলে সীতার কাছ থেকে বিদেয় নেবে, কাল বরং তারিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে কোন প্রকৃত উপায় বার করবে।

'সিনেমার কোন জ্ঞান তো আমার নেই বোন। সিনেমার লোকের সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ও নেই। ও ব্যাপারে কাজেই কিছু করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তবে তুমি যদি কিছুদিন কোথাও গিয়ে কাটাতে চাও, তার জন্যে অনেক জায়গা আছে। দেবপট্টনমে ললিতা রয়েছে— তোমার বন্ধু সে। তার মতন ভালবাসতে তোমার কেউ নেই। তোমার জীবন সুখের নয়, এ কথা শুনে থেকে ললিতা ছটফট করছে, তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। তার স্বামী পট্টভিরামণ এখন জেলে। সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ললিতার শ্বশুরও খুব ভাল মানুষ। দেবপট্টনমে গিয়ে তুমি যতদিন খুশি থাকতে পারো। মেয়েকেও সেখানে নিজের কাছে রাখতে পারবে।'—সূর্য বলল।

'ললিতা যে আমায় কত ভালবাসে, তা কি আমি জানি না? ললিতা সুখী হয়েছে— এই আমার অনেক সুখ। কিন্তু সূর্য, আমার মনের কথা তুমি বোঝনি। আমি চাই না যে আমি কোথায় আছি, সে ঠিকানা ইনি জানবেন। দেবপট্টনমে গেলে উনি পরের দিনই জানতে পারবেন। তাতে কোন লাভ নেই। তুমি যদি আমায় এমন কোন দূরদেশে নিয়ে যেতে পার, যে ইনি আমার কোন সন্ধানই না পেয়ে খুঁজে মরেন, তবে বলো। আর নইলে তুমি তোমার কাজে চলে যাও। এখানে আসার দরকার নেই।'

'ওভাবে কাউকে কিছু না বলে কয়ে যদি আমরা চলে যাই, তা হলে তোমার স্বামী কী ভাববেন, লোকেই বা কী বলবে? সেটা কি ভেবে দেখেছ?'—সূর্য প্রশ্ন করে।

'লোকে ভুল বোঝে তো বুঝুক। আমার পরোয়া নেই। তিন মাস আগের কথা শুনবে? একটা মেয়েকে গাড়িতে তুলে কোথায় যেন যাচ্ছিল। পাণিপথের কাছে মিলিটারী লরীর সঙ্গে গাড়ির

ধাক্কা লাগে। এঁর চোট-ঘাট লাগেনি। কিন্তু মেয়েটার আঘাত গুরুতর। কথাটা দিল্লীভর চাউর হয়ে গিয়ে লোক-হাসাহাসি হয়েছে। কিন্তু তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না। কোন্ আইনে বলে যে, পুরুষ যা ইচ্ছে করতে পারে?'

'না, কোন আইনেই বলে না। অন্যায় সে পুরুষই করুক আর নারীই করুক সেটা অন্যায়ই। সেইজন্যেই আমি তোমার কথা মানতে পারছি না। আমার মনে আর একটা উপায়ের কথা এসেছে। দেবপট্টনমে আমার আর-এক বন্ধু অমরনাথন। অমর আর তার স্ত্রী চিত্রা এখন কলকাতায় আছে। এবার দেবপট্টনমে আমার ওদের সঙ্গে দেখা হল। ওরা দুজনেই ভারী ভাল স্বভাবের লোক। চিত্রা ললিতার মুখে তোমার কথা সব শুনেছে। আমার মত কি জান? তোমায় এখানকার কাছাকাছি কোন স্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিই। তুমি কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন অমর-চিত্রার সঙ্গে কাটাও। দরকার হলে আমি রাঘবকে জানাব তুমি কোথায় আছ!'

'না, ওকে কিছুতেই জানানো চলবে না যে আমি কোথায় গেছি। ওকে জানানো না-জানানোর ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। আমি কলকাতায় যেতে রাজি আছি। কিন্তু আমি একা যেতে পারব না। আজ হোক কাল হোক তোমাকেই আমায় নিয়ে যেতে হবে। কালকের পর আমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারব না। তোমার আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা হয়তো তোমার বান্ধবী তারিণীর পছন্দ হবে না। সেটা তুমি ভেবে দেখো। তোমার যদি তাকে ভয় থাকে, তবে এখনই বলে দাও।'

'সীতা। তোমার মাথায় যত আজগুবী খেয়াল বাসা বেঁধেছে। আমার কাউকে কোন ব্যাপারেই ভয় নেই। শুধু যে-কাজটা করতে যাচ্ছি, তাতে নিজের মনের সায় থাকলেই হল। আমায় একটু ভাববার সময় দাও।'—সূর্য বলে।

'হ্যাঁ নিশ্চয়। ভাববে বৈকি। ভেবে চিন্তে জবাব দিয়ো।

তবে ভাবনাচিন্তা যা করবার সেটা এখানে বসেই করে নাও, আর কী স্থির করলে সেটা আমায় জানিয়ে যাও। —ওঃ কতদিন পরে তুমি এলে সূর্য। আমি তোমায় জলটুকু খাবার কথাও বলিনি। রান্নাঘর থেকে ওভালটিন করে আনছি। ততক্ষণ তুমি ভাবো।' —বলে সীতা ভেতরে চলে গেল।

সূর্য আকাশপাতাল ভাবনায় পড়ে গেল। 'একি ভয়ানক ঝুঁকি নিতে চলেছি নিজের মাথায়! এর পরিণাম কী? ভাল না মন্দ?' ওর মনটা যেন তুফানে পড়েছে। 'ভগবান, এ থেকে বাঁচবার কি উপায় নেই?' সূর্য ভাবছে। টেলিফোন ঝনঝনিয়ে উঠল। নানান চিন্তা উদ্‌বেল হয়ে না থাকলে সূর্য বুঝতে পারত এই মাঝরাত্তিরে রাঘবন ছাড়া আর কেউ টেলিফোন করতে পারে না। ফোন তুলে বলল—'হ্যালো। কে?'...

সীতাও দ্রুত পায়ে এসে পড়েছিল। তার মুখে শঙ্কার আভাস।

আটাশ

রজনীপুরের প্রাক্তন দেওয়ান আদিবরাহাচার্য ইদানীং নতুন দিল্লীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। দিশি রাজারাজড়াদের আইনের পরামর্শ দেবার কাজ পেয়েছেন তিনি। এ চাকরীতে কাজ কম আয় বেশি। দাপটও বেশ। দিল্লীর সামাজিক মহলে তাঁর দুই যোগ্য মেয়ের খুব নামডাক। ভাইসরয়ের মহলে, দিশি রাজন্যবর্গের মজলিসে, হোমরাচোমরা অফিসারদের নেমন্তন্নে ধামা-ভামার উপস্থিতি অপরিহার্য।

সেদিনও তারা বাপের সঙ্গে পার্টিতে গিয়েছিল। ফিরতে রাত এগারোটা বেজে গিয়েছিল। ফেরার পথে রাঘবনও ওদের সঙ্গে ওদের বাড়িতে এল। চারজনে বসে গেল তাস খেলতে।

খেলা বেশ জমে উঠেছে, ভামা প্রশ্ন করল— 'মিস্টার রাঘবন। আপনি আপনার স্ত্রীকে পার্টিতে আনলেন না কেন? তাঁর শরীর-টরীর ভাল আছে তো?'

'শরীরটা তো একরকম ভালই এখন। কিন্তু অসুখ থেকে ওঠার পর থেকে ওর মনটা জানি না কেন সবসময়ই যেন বিচলিত থাকে। বাড়ি গেলেই একটা-না-একটা নালিশ শুনতে হবেই। আর তাই থেকে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে।' রাঘবন বলে।

ধামা বললে— 'উনি যখন এতবড় একটা অসুখ থেকে উঠলেন, তখন ওঁর কিছুদিনের জন্যে একটু হাওয়া বদল করা দরকার ছিল। এখানে রাখাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'

'সে তো বুঝি। আমি তো কতবার বলেছি যে তুমি কিছুদিন মাদ্রাজে আমার মার কাছে গিয়ে থাকো। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের

সঙ্গে দেখাশুনো করেটরে তারপর ফিরে এসো। তা শুনতেই চায় না। কী করব বলুন? আমার হয়েছে জ্বালা! অফিসে একরকমের যন্ত্রণা, বাড়িতে আর-একরকম। মাথা খারাপ হবার জোগাড়। কোথাও শান্তি নেই। মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয়। আপনাদের এখানে এসে ত্বটো গল্পগুজব করলে ভেতরটা একটু হালকা লাগে।'

ধামা বললে— 'ঘরের অশান্তির কথা তো বুঝলুম। অফিসে আবার কী হল?'

রাঘবন বলে— 'সেটা আপনি বুঝবেন না। আপনার বাবা বুঝবেন। বুঝলেন দেওয়ান সাহেব! আমি ভাবছি মুসলমান হয়ে যাব। কী বলেন আপনি?'

'সেকি কথা! মুসলমান হতে যাবেন কেন?' ভামা অবাক হয়।

'আজকাল সরকারী চাকরীতে উন্নতি করতে গেলে মুসলমান হতে হয়। আমার বারোবছর পরে একজন চাকরীতে ঢুকল। এক লাফে সে আমায় ডিঙিয়ে গেল। গত বছর অব্দি সে আমায় 'হুজুর হুজুর' করেছে। এবার আমাকে তার পেছন পেছন হুজুর হুজুর করে বেড়াতে হবে।—দেওয়ান সাহেব, আমাকে কিছু পরামর্শ দিন-না, একটা রাস্তা বাতলান। আমি ইসলাম গ্রহণ করব না চাকরীতে ইস্তফা দেব?'—রাঘবন ব্যাকুল প্রশ্ন করে।

'আপাততঃ ত্বটোর কোনটাই করবেন না। কিছুদিন সবুর করুন।' —বরাহাচার্য মুখ খোলেন।

'সবুর করে কী লাভ? তার চেয়ে কোন একটা দিশি রাজ্যেই আমায় কোথাও ঢুকিয়ে দিন না।' রাঘবন উমেদারী করে।

ভামা বললে— 'হ্যাঁ, দাও না বাবা রাঘবনকে একটা সুপারিশ করে।'

'আমি তো চেষ্টা করছিই। কিন্তু হুট করে চাকরীটা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। একটা চাকরীতে থাকতে থাকতেই অন্যত্র যাওয়া

শ্রেয়। এটা ছেড়ে দিলে আর-একটা সহজে পাওয়া যাবে না।'— আদিবরাহাচার্য অভিজ্ঞতা থেকে বলেন।

ধামা বললে— 'রাঘবনজী। আপনার চাকরীতে উন্নতি না হবার কি ঐ একটাই কারণ— যে আপনি হিন্দু, নাকি আরও কোন কারণ আছে?'

'আমার মাদ্রাজী হওয়াও একটা কারণ। এখানে এখন মুসলমান-দের প্রাধান্য। মুসলমান না পেলে কাঠ আহাম্মক নিরেট মুখ্যুদেরও ধরে ধরে বসাবে। কিন্তু মাদ্রাজী এদের দুচক্ষের বিষ!'

এবার আদিবরাহাচার্য নিজে থেকেই আলোচনায় যোগ দেন।

বলেন— 'ভামা সে কথা বলেনি রাঘবন। আপনার নামে একটা অভিযোগ আছে। সারা শহরে তাই নিয়ে কানাকানি হচ্ছে। আপনি সে বিষয়ে কিছু শোনেননি?'

'না—তো।' কিসের অভিযোগ?'—রাঘবন আশ্চর্য হয়।

'আপনি একটি বিপ্লবী মেয়েকে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন। কথাটা সত্যি নাকি?'

'ও। তারিণীর কথা! এক তো এটা সর্বৈব মিথ্যে কথা যে বিপ্লবী আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা আছে। তা ছাড়া আমি তো তাকে বাড়িতে লুকিয়ে রাখিনি। সীতার শরীর যখন খুব খারাপ হয়েছিল, সেই সময় সে নিজেই আমার বাড়িতে এসেছিল, সেবাশুশ্রূষা করে সীতাকে সারিয়ে তুলেছিল। তারিণী খুবই সাদাসিধে মেয়ে এবং বুদ্ধিমতী। আপনার মেয়েরাও তো তাকে চেনে!'—রাঘবন বলল।

ভামা বললে— 'সাদাসিধে বা বুদ্ধিমতী হলে কি কেউ বিপ্লবী হতে পারে না?'

'ধরুন যদি সে বিপ্লবী হয়ও তার জন্যে আমি কেন দায়ী হতে যাব? আমি কী করে জানব যে সে বিপ্লবী দলে আছে কিনা?— আচ্ছা ছেড়ে দিন ও কথা। এই নতুন দিল্লীতেই আসল বিপ্লবী নেতা কত বড় বড় অফিসারের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। কী? আপনারা জানেন না সে কথা? করুণাবতী দেবী কোথায় লুকিয়ে

ছিলেন ? চন্দ্রকান্ত সিংহ পুরো তিন মাস কার বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন ? এঁদের যাঁরা আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁদের কে কী করেছে ? একলা আমার ঘাড়েই দোষ পড়ল কেন ?'

'তাঁরা সব বড় বড় মাথাওয়ালা অফিসার। মাথায় বসে আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে চট করে কেউ নালিশ করতে সাহস করে না। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনি তো চাকরীতে উন্নতিও চান !'

'শুধু তাই নয় বাবা। এঁর স্ত্রীও একজন বিপ্লবীকে সাহায্য করেন—এমন একটা কথাও প্রচলিত। এখান থেকে মাদ্রাজ প্রদেশে একটা চিঠি গিয়েছিল। তাতে সীতাদেবীর নামের উল্লেখ আছে। কাল একটা পার্টিতে এক সি. আই. ডি. অফিসার সীতা আর সূর্যর সম্পর্কে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছিল। তাদের দুজনকার মধ্যে সম্বন্ধ কী, তাও জানতে চাইছিল। আমি বললাম ও-সব কিছু আমি জানি না !—মিস্টার রাঘবন ! সত্যি ওদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে নাকি ?'—ভামা জিজ্ঞেস করল।

'আছে। ওরা মামাত পিসতুত ভাইবোন। সূর্যর নামে কোন 'অ্যারেস্ট ওয়ারেণ্ট' আছে নাকি ? আপনি কিছু জানেন ?'

'আছে বৈকি। মাদ্রাজ, বোম্বাই আর মধ্যপ্রদেশে তার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।'

'আচ্ছা ! সূর্যর মতন ছেলেদের জেলে ভরতে পারলেই দেশের মঙ্গল। স্বাধীনতা-আন্দোলনেরও তাতেই কল্যাণ হবে !' বলে রাঘবন টেলিফোনের কাছে যায়।

ভামা বললে—'এত রাত্তিরে কোথায় টেলিফোন করবেন ?'

'আমি একটু জেনে নিতে চাই আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। জেগে থাকতে বাড়ি ঢোকার তো জো নেই। কথায় কথায় এমন হুল ফোটাবে যে তার বিষের জ্বালায় দুজনেরই সারারাত ঘুম হবে না। শিবরাত্রি করার কী দরকার বলুন ?'

'আহা। আপনার দশা দেখলে মন কাঁদে।'—ভামা বলে।

সুন্দর রাঘবন বাড়িতে টেলিফোন করল। টেলিফোনের অপর

প্রান্তে যে কথা বলল তার কণ্ঠস্বর শুনে বিস্ময়ে আর রাগে রাঘবন প্রায় পাগল হয়ে উঠল।

এদিকে টেলিফোনে রাঘবনের গলা শুনেই সূর্য সীতার মুখের দিকে তাকায়। সে শঙ্কিত হয়ে ভাবে তার টেলিফোন তোলায় আবার নতুন কোন অনর্থের সৃষ্টি না হয়। রাঘবন প্রশ্ন করে—'কে? সূর্য? তুমি কবে এলে?'

'আজই।'—সূর্য উত্তর দিল।

'আচ্ছা। তা আমি ফেরা অবদি থাকছ তো?'

'নিশ্চয়ই।'—বলে সূর্য সীতাকে ডেকে বললে—'সীতা, জামাইবাবু বলছেন।' রিসিভারটা সূর্য সীতার হাতে ধরিয়ে দেয়।

সীতা শঙ্কাবিহ্বল মুখে রিসিভার হাতে নেয়। রাঘবনের কথা আর সূর্যর কানে গেল না। কিন্তু দেখল সীতার চোখে জলের ধারা নেমেছে, সে বলছে—'না তো। ও তো আজই এল! আচ্ছা, আচ্ছা আমি থাকতে বলব।'—এই বলে সীতা টেলিফোন রেখে দিল।

'কী হল সীতা, কাঁদছ কেন? কী বললেন রাঘবন?'—সূর্য চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করে।

সীতা খানিকক্ষণ চুপ করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে—'সূর্য, তুমি চলে যাও। এক্ষুনি চলে যাও।'

'এ কী বলছ? উনি যে আমায় থাকতে বললেন!'

'সেইজন্যেই আমি তোমায় চলে যেতে বলছি। আমাকে বলে দিলেন যেন তোমায় আটকে রাখি। তাইতেই আমার সন্দেহ আরো ঘোরালো হচ্ছে। সূর্য তুমি আজ এখানে থাকলে বিপদের আশঙ্কা আছে। তাই বলছি তুমি বরং চলে যাও।'

'উনি আমায় থাকতে বললেন। এমন অবস্থায় যদি তাড়াতাড়ি চলে যাই, তাতেও বিপদ বাড়বে বই কমবে না। না বলে কয়ে চলে গেলে তাতে খামোকা সন্দেহের বীজ বোনা হবে।'

'সন্দেহের বীজ অনেকদিন আগেই বোনা হয়ে গেছে। আজ

নতুন নয়। তুমি কিছু বোঝ না, সূর্য। দোহাই তোমার, আমাকে আর ঝামেলায় ফেলো না। শীগ্‌গির চলে যাও এখান থেকে। তুমি কিছু ভাল করতে পার না পার, অন্ততঃ মন্দ কোরো না।'

'ঠিক আছে। একটা কথা নিশ্চিত জেনে রাখো। সত্যি যদি তোমার আমার সাহায্যের দরকার পড়ে, জানাতে দ্বিধা কোরো না। তুমি মনকে শক্ত করে আমায় যা বলবে আমি করতে প্রস্তুত। তোমার ভালই আমার প্রথম কাম্য। দেশের প্রতি কর্তব্য তার পরে।'—সূর্য বলল।

'আমি জানি, সূর্য। তবু তুমি আমায় বাঁচালে। আমার মা আমায় বলেছিল, অসময়ে সূর্যকে বলিস সে তোর সাহায্য করবে। তার কথা মিথ্যে হবে না। কাল বিকেলে ফোন কোরো। ততক্ষণে আমি মনঃস্থির করে ফেলব! আমি একবার ভাল করে ভেবেচিন্তে দেখব। নইলে আমি এখনই তোমায় বলে দিতুম— আমায় এখনই নিয়ে চলো।' সীতা বলল।

সূর্য যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সীতার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া রিভলবারটা সন্তর্পণে নিজের প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। এই পাগলের দরবারে এ জিনিস রেখে গেলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। তার চেয়ে নিজের কাছে রাখাই ভাল। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। সূর্য ভাবল।

সূর্য বেরিয়ে যাবে। ঠিক এইসময় গাড়ির ভেঁপু শোনা গেল। গাড়ি দ্রুত এসে দরজায় লাগল। সীতা আর সূর্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাঘবন সদর দরজায় গাড়ি রেখে জোরে জোরে পায়ের শব্দ করতে করতে ভেতরে এল। সূর্য আর সীতার দিকে দফায় দফায় কটমট করে তাকাল। যেন পেলে কাঁচাই চিবিয়ে খায়। তার মনের জ্বালা চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। তবু কথাবার্তায় তার কোন আভাস না দিয়ে বললে— 'কী সূর্য, মনে হচ্ছে চলে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছ?'

সূর্য বললে— 'হ্যাঁ, যেতে হবে না? সাড়ে বারোটা বাজল। আপনার জন্যেই বসেছিলুম, বিদেয় নিয়ে যাব বলে।'

'আরে রাখ। এত রাত্তিরে কোথায় যাবে? আজকাল দেখছি 'নাইট বার্ড' বনে গেছ।'

'না। থাকা চলবে না। খুব জরুরী কাজ আছে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব বলে কথা দিয়ে এসেছি।'

'বাঃ চমৎকার! এই মাঝরাত্তিরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার সময় হল! এখন দেখা করে কী করবে। ডাকাতি করতে যাবে নাকি?'

'না। ডাকাতি যারা করে তারা যেমন গভীর রাতে বেরোয়, তাদের যারা ধরে, তাদেরও তেমনি গভীর রাতে বেরোতে হয় তো! সারা দেশের ডাকাতদের মেরে তাড়াবার কাজে নেমেছি যে আমরা। সে তো জানেনই।'

'আমি কোত্থেকে জানব বল। জানলে তোমার ভগ্নী জানতে পারেন। তার সঙ্গে তো তোমার দেখাশুনা প্রায়ই হয়!'

'প্রায়ই— মানে তিনমাস আগে একবার এসেছিলুম। আপনি তখন শহরের বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিলেন।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তারপর এবার কোথায় কোথায় গেলে, বলো শুনি। শুনলুম নাকি মাদ্রাজেও গিয়েছিলে। তোমার কাছ থেকে বাড়ির খবর শুনব বলেই আমি দৌড়ে এলুম! তা গল্পটল্প হোক। রাত্তিরটা থেকে কাল সকালেই যেয়ো না?'

'না, আমায় এখন যেতেই হবে। মাদ্রাজে আপনার মা-বাবা-মেয়ে সবাই ভাল আছেন। মেয়েটা এখানে আসবার জন্যে খুব ছটফট করছে। আসার পথে অন্য কাজ ছিল। নইলে নিয়েই আসতুম। অন্যান্য খবর আর-একদিন এসে সবিস্তারে শুনিয়ে যাব। আজ চলি!'

'আর-একদিন মানে? কবে আসছ?' রাঘবন জানতে চায়।

'সম্ভব হলে কালই আসব। নইলে পরশু। সফরের সব অভিজ্ঞতাই শোনাব।'

'আচ্ছা তা হলে যাও। কাল এলে কখন আসবে? এইরকম রাত করেই আসবে নাকি?'

'তা তো বটেই। পুলিসের নজর বাঁচিয়ে আসতে হলে তো রাত করেই আসতে হয়। আর যাই হোক, আমার জন্যে আপনাকে অকারণ অসুবিধেয় ফেলতে পারি না তো। আপনি সরকারী চাকরীতে আছেন।'

'ও। সেইজন্যে!··· তোমার অশেষ কৃপা। তা সূর্য, তোমার বান্ধবী তারিণী দেবীর খবর কী? কোথায় তিনি আজকাল? তোমার সঙ্গে দেখাটেখা হয় না?'

সূর্য সীতার মুখের দিকে তাকায়। দেখে তার মুখে কেমন একটা নিষ্ঠুরতার ছায়া ফুটে উঠেছে। বলে—'আমার তো মনে হয় সে এখানেই আছে। দেখাও করব হয়তো!'

'যদি দেখা হয় তো বোলো একটা জরুরী দরকারে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ও আজকাল কোথায় থাকে বলতে পার?'

'পুরনো ঠিকানা জানি। কিন্তু আজকাল সেখানে থাকে না। শুনেছি আর কোথাও চলে গেছে। আচ্ছা চলি, দেরী হয়ে যাচ্ছে।' —এই বলে সূর্য বেরিয়ে পড়ে।

রাঘবন বিরস বদনে সোফায় বসে থাকে। তাকে বিদায় জানাতে উঠেও আসে না।

সীতা সূর্যর পেছনে পেছনে সদর দরজা পর্যন্ত যায়। তারপর দেউড়িতে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে—

'সূর্য! আমার মাথার দিব্যি! কাল ফোন করতে ভুলো না।'

'আচ্ছা।'—সূর্য রাস্তায় নামে।

উনত্রিশ

সূর্যকে সদররাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সীতা ফিরে আসতেই রাঘবন আগুন-ঢালা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে অঙ্গার-স্রাব করল— 'কানে কানে কী কথা হল ?'

সীতাও জবাবে কী বলছে না বলছে একবারও না ভেবেই বলে বসল—'যে কথাই হোক না তোমার তাতে কী ?'

'বটে ? আমার কী ?'— রাঘবন সজোরে সীতার গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়।

দাঁতে দাঁত চেপে সীতা বলে— 'থামলে কেন ? আরো-একটা গাল বাকী রয়েছে।'

'তাই নাকি ! তোমার বড় বাড় বেড়েছে বুঝি ! মহাত্মা গান্ধীর বেটি, তবে এই নাও, বাকি থাকবে কেন ?' রাঘবন অন্য গালেও চড় মারে।

সীতা তার দিকে তীব্র রোষের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

রাঘবন রাক্ষসের মত চেঁচিয়ে উঠল— 'কোথায় যাচ্ছ ? আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।'

সীতা গ্লাস ভর্তি ওভালটিন এনে টেবিলে রাখল।

'শুধুই ওভালটিন না বিষ মিশিয়ে এনেছ ?'—রাঘবন প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এনেছি বিষ মিশিয়ে।'

'তবে ওটা তুমিই খাও। না···না···তুমি খাবে কেন ? তোমার এখনো অনেক কিছু বাকি আছে দুনিয়ায়' বলতে বলতে গ্লাস তুলে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেয়।

'ঘরে খুনী পুষে আর অযথা দুর্ভোগ বাড়াবে কেন? আমি কালই বিদেয় হয়ে যাচ্ছি!'—সীতা তীব্র সুরে বলে।

'কোন্ চুলোয় যাবে? মরবার আছে কোন্ চুলো?'

'যে চুলোয়ই যাই-না কেন? তোমার সে খোঁজে কী দরকার। আমি মরলে তোমার তো আপদ চোকে!

'একশোবার। যাও-না, মর-না গিয়ে। কিন্তু তার আগে আমার কথার জবাব দেবে।'

'যে মরবে সে-জবাব দেবে কেন?'

'জবাব দিতেই হবে। তোমায় আর সূর্যকে আমি সন্দেহ করি।'

'কিসের সন্দেহ?

'কিসের আবার? তোমাদের চরিত্রে সন্দেহ হয় আমার।'

'শুনে সুখী হলাম।'

'সুখী হলে!'—রাঘবন সীতার গালে পরপর ঠাসঠাস করে চড় মেরে যেতে লাগল।

সীতা একপা নড়ল না। একফোঁটা চোখের জল ফেলল না। মুখ বিকৃত করল না। শুধু বললে—'এটা চমৎকার হচ্ছে। তুমি মেরে যাও। মারতে মারতে মেরে ফেল। যাতে আর কাল কোথাও চলে যাবার দরকার না হয়।'

'তোমার ভেতরে ময়লা আছে। পাপ লুকোন মুশকিল হয়ে পড়ছে বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা বলছ।'

'আমার ভেতরে কোন পাপ নেই, কোন ময়লা নেই...'

'তা না থাকলে বারবার চলে যাবার কথা তুলবে কেন? স্বামীকে ছেড়ে কোন স্ত্রী কখনো চলে যেতে চায়?'

'তোমার মন ভেঙে গেছে। ভাঙা মন আর ছেঁড়া সুতো জোড়া লাগে না। আমাদের যখন মনেরই মিল নেই আর, তখন একসঙ্গে থাকবার কী দরকার?'

'মন যদি আমার ভেঙে থাকে তার জন্যে দায়ী কে? তুমি, তোমার চরিত্র। আমার অনুপস্থিতিতে সূর্য কেন আসে তোমার

সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক আছে, তুমি যদি সতীসাধ্বী হও, পতিব্রতা হও তা হলে আমি যা বলব মানবে। মানবে?' রাঘবন প্রশ্ন করে। সীতা মৌন হয়ে থাকে।

'এখনই এই মুহূর্তে পুলিস স্টেশনে ফোন করে সূর্যর এখানে আসার আর চলে যাওয়ার খবর দিয়ে দাও!'

'না, দেব না।'

'তুমি জান, তোমার পেয়ারের মামাত ভাইয়ের দৌলতে আমি চাকরীটা খোয়াতে বসেছি। ও বেআইনী কাজ করে বেড়ায়। পুলিস ওর পেছনে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। এ বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। ওর জন্যে আমার চাকরীতে উন্নতি হচ্ছে না। আমার নিচের লোক ওপরে উঠে যাচ্ছে। এখন কমপক্ষে পুলিসে খবর দিলে চাকরীটা বাঁচবে, নইলে সেটাও ঘুচবে এরপর।'

'ঘোচে ঘুচুক, থাকে থাকুক! কোনমতেই আমি পুলিসে খবর দেব না। তাতে আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার!'

'সে আমি জানি। তুমি যে খবর দিতে পারবে না, তা আগেই বুঝেছি। তোমার খারাপ চরিত্র প্রমাণ করার জন্যেই তোমায় টেলিফোন করতে বলেছিলাম। এবার প্রমাণ পেলুম যে আমার ধারণা খাঁটি। যাও, দূর হয়ে যাও চোখের সামনে থেকে!' রাঘবন গলাধাক্কা দিয়ে সীতাকে শোবার ঘরের দিকে ঠেলে দেয়।

সীতা ঘরে এসে চুপ করে শুয়ে পড়ে। তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। চড় খেয়ে গাল দুটো জ্বালা করছে। সীতা অবাক হয়ে ভাবছে 'আজকে যা ঘটে গেল সেটা কি সত্যি, না স্বপ্ন দেখছি!'

ইতিমধ্যে ওঘরে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাবার আওয়াজ পাওয়া গেল। সীতা ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে এসে রাঘবনের টেলিফোন ধরা হাতটা জোর করে আঁকড়ে ধরল। জিজ্ঞেস করল—'কাকে টেলিফোন করছ?'

রাগে রাঘবনের চোখ ভাঁটার মতন জ্বলে উঠল। কঠোর কণ্ঠে বললে—'সে খোঁজে তোমার কী দরকার?'

'আছে দরকার। তুমি থানায় ফোন করতে যাচ্ছ, সূর্যর খবর দেবে বলে। আমি করতে দেব না ফোন। ফোন করতে হলে আগে আমায় খুন করবে, তবে ফোন করবে।'—সীতা বলে।

রাঘবন বললে— 'কাল যদি আপিস থেকে ফোন করি, কী করবে ?'

সীতা বললে— 'সেটা আমি দেখতে য'ব না। কিন্তু আমার চোখের সামনে এ কাজ কিছুতেই করতে দেব না।'

'তবে যে বললে সূর্যর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই ? তবে এত টান কিসের ?'

'আমি কখনো বলিনি ও-কথা। সংসারে আমার সাচ্চা হিতৈষী কেউ যদি থাকে, সে সূর্য। সে আমার জন্যে সব করতে পারে। তুমি তাকে ধরিয়ে দিতে চাইলে আমি মুখ বুজিয়ে থাকতে পারি না।' সীতা বলে।

'পাপীয়সী ! সূর্যর মোহে কতখানি পাগল হয়েছ, তা এবার বেশ বুঝতে পারছি !'

'বাঃ এ তো খুশির খবর !'

'খুশির খবর !' রাঘবন আবার মারবার জন্যে হাত তোলে।

'নয় ! যে এতবড় কথা বলতে পারে তার এখনো জিভটা খসে পড়েনি— এটা খুশির খবর নয় ?'

'ও ! আমার জিভ খসে পড়লে তুমি খুশি হও ! শাপ দিচ্ছ ?' বলতে বলতে রাগে উন্মত্ত হয়ে রাঘবন টেলিফোনের রিসিভারটা দিয়ে সীতাকে আঘাত করে বসে। রিসিভারটা গিয়ে সরাসরি সীতার কানের ওপর পড়ে। প্রচণ্ড চোট লাগে সীতার। চোখ জলে ভরে যায়। কানে হাত চাপা দিয়ে সীতা ফুঁপিয়ে ওঠে— 'মা ! মা গো। ঐ—ঐ আবার ঢেউয়ের তোলপাড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমাকে নিয়ে যাও মা।' ধীরে ধীরে তার চোখে উন্মাদের লক্ষণ ফুটে ওঠে। রাঘবন দেখে সীতার হিস্টিরিয়ার অ্যাটাক হচ্ছে।

চট করে হাত দিয়ে সীতাকে ধরে ফেলে সোফায় বসিয়ে দেয়। সান্ত্বনার সুরে বলে— 'কেঁদো না সীতা। আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলুম। সত্যি সত্যি বলিনি।' আদর করে পিঠে হাত রাখে। সীতা খানিক পরেই সোফায় ঢলে পড়ে। তার ফোঁপানির শব্দ থেমে যায়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায় ক্রমশঃ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সূর্য সদরের ফটক অবধি গেল, শব্দ করে দরজা খুলল, বন্ধ করল। তারপর চোরাপায়ে বাগানে ঢুকে পড়ে গাছপালার আড়ালে আড়ালে সীতা আর রাঘবন যে ঘরে ছিল তার কাছাকাছি এসে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল। তারপর জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরকার দৃশ্যে চোখ-কান রাখল।

রাঘবন যখন সীতাকে টেলিফোনের হাতল দিয়ে মারল আর সীতা আর্তনাদ করে উঠল— এইপর্যন্ত দেখেশুনে সূর্যর ধৈর্য আর বাঁধ মানতে চাইল না। একবার ভাবল, 'দিই রিভলবার চালিয়ে।' পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে সূর্য। 'থাক্ দরকার নেই। এটা ঠিক হবে না। আমার এখন বহু কাজ বাকি আছে। একটা দিন দেরী করলেও ক্ষতি হবে না।' এরপরের দৃশ্য দেখে সূর্য বেরিয়ে এল।

রাত্রির তৃতীয় যামে প্রাচীন দিল্লীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যর মনে ক্ষোভের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। 'দেশের ভাল হোক মন্দ হোক—স্বাধীনতা আসুক না আসুক—আমার কিছু যায় আসে না। দেশ উদ্ধারের জন্যে বহুলোক আছে। তারাই এগিয়ে আসবে। সীতা বেচারী অনাথ এবং নিরাশ্রয়। তাকে সুখী করাই আমার প্রথম ধর্ম—পরম কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কী করা যায়— তারিণীর সঙ্গে তাই নিয়ে কথা বলতে হবে। নইলে ঐ রাক্ষসটার পাল্লায় পড়ে সীতার প্রাণ বাঁচানো মুশকিল!' ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগল সূর্য। আস্তানায় পৌঁছে শোবার জোগাড় করল। কিন্তু ঘুম ওর ত্রিসীমানায় এল না। সারাটা রাত জেগে জেগেই কাটল। একসময় ভোরের আলো ফুটে উঠল।

ত্রিশ

পরদিন বিকেলে সূর্য চাঁদনি চক দিয়ে হাঁটছিল। ওর মনটা অশান্ত। গতরাত্রির ঘুমের অভাব ওর অবসন্ন চেহারায় স্পষ্ট।

বেলা এগারোটা নাগাদ সূর্য সীতাকে টেলিফোন করেছিল। প্রথম বার দুয়েক কোন জবাব মিলল না। তিনবারের বার সীতার গলা পেল। সীতা বললে—'সূর্য, তুমি কি কিছুক্ষণ আগে আমায় ফোন করেছিলে?' সূর্য বললে— 'হ্যাঁ দুবার ফোন করেছি। কিন্তু তোমাকে পাইনি।'

'শোনো, আধঘণ্টা আগে টেলিফোনের রিং হল। আমি ভাবলুম নিশ্চয় তুমি। তবুও নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করলুম— কে বলছেন? ওদিক থেকে জবাব এল—আমি সূর্য বলছি। আমাদের দেখা হবে কখন? গলাটা কিন্তু তোমার মতন লাগল না। তাই আমি ফোন রেখে দিলুম। কী ব্যাপার বলো তো?'—সীতা বিবৃত করল।

সূর্য আশ্চর্য হল। বললে— 'অবাক কাণ্ড। কে কথা বলল তোমার সঙ্গে। কিছু বুঝতে পারছি না তো।'

'যাক ছেড়ে দাও ও কথা। আজ আমাদের দেখা হওয়া একান্ত দরকার। কোথায় কখন দেখা হবে, বলো।' সীতার উতলা প্রশ্ন।

'কোথায় আবার, তোমার বাড়িতেই দেখা করব।' সূর্য বলে।

'না, না। এ বাড়ির দিকে তোমার না আসাই মঙ্গল। সন্ধে ছটার সময় আমি পুরনো দিল্লীতে আসছি। আমার কোন ভয় নেই। তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?'

সূর্যর টাউনহলের পেছনের ময়দানের কথা মনে এল। সেখানেই আসতে বলল। 'আচ্ছা'—সীতা টেলিফোন রেখে দিল।

এর মধ্যে সূর্যকে আগের দিনের প্রোগ্রাম মাফিক কাজগুলো সব সমাধা করে ফেলতে হবে। তারিণীদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারিণীর কথা মনে আসতেই গতকাল বিকেলের কথা মনে পড়ল। তারিণীকে ধরিয়ে দিলে লাখটাকা ইনাম পাবার কথাটা! শংকিত, চিন্তান্বিত সূর্য চাঁদনি চকের পথ দিয়ে হেঁটে চলে।

বিখ্যাত 'খুনী দরোয়াজা' পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ কামিজ গায়ে একজন মুসলিম লীগের লোক ইচ্ছে করেই ওর গায়ে ধাক্কা মেরে যেন দেখতে পায়নি এমন ভাণ করে বললে—'মাফ কীজিয়ে।'

'কায়দে আজম জিন্দাবাদ!' সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখল লোকটার চোখে কালকের মতন ধৃষ্টতার চাউনি। সূর্য তৎক্ষণাৎ তাকে কালকের পুলিসম্যান বলে চিনে ফেলে বলল—'বাঃ আজ যে ভেক পালটে গেছে দেখছি।'

'রোজ রোজ ভেক না পালটালে বাঁচা যাবে? তোমাকেও সাবধানে চলতে বলেছেন প্রধানজী। তুমি কালকের মতই সেজে রয়েছ!' লীগের কর্মী বললেন।

'প্রধানজী বাড়িতে আছেন?'

'আছেন। পঞ্চাশ গজ তফাতে পেছনে পেছনে এসো। বেশি কাছেও এসো না, বেশি দূরেও যেয়োনা। ঠিক আছে?' লম্বা পা ফেলে বক্তা এগিয়ে চলল।

সূর্য তার কথামত পেছনে চলল। জুম্মা মসজিদের ডানদিকের রাস্তা কেটে একটা সরুগলি বেরিয়ে গেছে। লীগের কর্মী আর সূর্য গলিতে ঢুকে পড়ল। আবার সেই গলি পেরিয়ে এমন একটা কানা-গলিতে গিয়ে ঢুকল যেখানে সূর্যের আলো সহজে ঢুকতে পায় না। একটা বাড়ির দোরে মুসলিম লীগের ঝাণ্ডা উড়ছিল। লোকটা সেখানে সূর্যের জন্যে দাঁড়াল। সূর্য আসতে দুজনে সেই বাড়ির ভেতরে ঢুকল। সামনের ঘরেই এক মৌলবী সাহেব ঝুঁকে বসে আরবী হরফে লেখা কুরান শরীফের ধরনের কোন বই পড়ছিলেন।

আগন্তুকদের দিকে একপলক চোখ তুলেই মৌলবী আবার বইয়ের ওপর ঝুঁকলেন।

পাঠমগ্ন মৌলবীকে দেখে সূর্য ভাবনায় পড়ে গেল। মুখটা খুবই চেনা। কোথায় দেখেছে? ইতিমধ্যে লীগকর্মী তার হাত ধরে টেনে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা পুরনো বইয়ের আলমারীর কাছে নিয়ে গেল। আলমারীর পেছনেই দেওয়াল। মাঝে এত কম ফাঁক যে সেখান দিয়ে গলে যাওয়া শক্ত। আলমারীর আড়ালে দেয়ালের গায়ে একটা দরজা। লোকটা সেই দরজা খুলে সূর্যকে ঠেলে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দোরটা বন্ধ করে দিল।

সূর্য অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে। এমন সময় তারিণীর গলা শোনা গেল—'এই যে আসুন আমার সঙ্গে।'

খানিকপরেই ওরা অত্যন্ত অস্পষ্ট আলোয় একটা সাবেকী আমলের মণ্ডপে এসে পড়ল। মণ্ডপের থামগুলো পাথরের। সর্বত্র সাবেক কালের স্বাক্ষর। দাঁড়ালে মাথা ঠুকে যায় এমন নিচু ছাদ। মণ্ডপটা কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশাল। নাদিরশাহ, আহম্মদশাহের মতন অত্যাচারী লুণ্ঠকদের হাতে যখন দিল্লী লুঠ হত, সেইসময় চাঁদনি চকের ধনীমানী সদাগরেরা এই মণ্ডপে নিজেদের মহার্ঘ ধনদৌলত লুকিয়ে রাখতেন। আঁধার মণ্ডপের পথ চিনে ভেতরে এসে লুঠপাট করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কাজেই এসব জায়গায় ধনসম্পত্তি একরকম সুরক্ষিতই থাকত।

এখন বিপ্লবীরা মণ্ডপটাকে কাজে লাগিয়েছেন। এটা তাঁদের একটা প্রধান আড্ডা।

মণ্ডপে জনাবিশেক লোক বসে। কেউ একলা বসে বই পড়ছে। কেউ কেউ আবার ছোট ছোট জোট বেঁধে গল্পগাছা করছে। কেউ নিবিষ্ট মনে চুরুট টানছে। কেউ কেউ শুয়ে আছে। পরনে প্রত্যেকের আলাদা রকমের পোশাক। আলাদা বসে এক ব্যক্তি লিখছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে তারিণী বলল—'উনি প্রধানজী।' সূর্য তাঁর সমীপে গিয়ে বলল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

নবাগতকে দেখে বাকি সবাই উঠে এসে প্রধানকে ঘিরে বসলেন।

প্রধান সূর্যকে বললেন— 'বলুন কোথায় কোথায় গেলেন এবার। দেশের পরিস্থিতি কেমন বুঝলেন?'

'মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ আর মাদ্রাজে গিয়েছিলাম। মাদুরাই পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। সর্বত্রই লোকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির আভাস দেখে এলাম। যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সেই অগ্নিস্রোতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভস্ম হয়ে ভেসে যেতে পারে।'

'আপনার এই বিশ্বাসের ভিত্তি থাকা দরকার। কিসের ভিত্তিতে এ কথা বলছেন? ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করা বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনি লোকের কাছে কী ধরনের সহায়তার আশা পোষণ করেন? আমরাও তো আশা করেছিলাম যে, গত বছরের নয়ুই আগস্টের মত এবছরও বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে! কই, কিছুই তো হল না।'

'নিরাশার বিষয় নিশ্চয়! অধিকাংশ লোকের ধারণা, জাপান কিংবা জার্মানী চলে এসে ভারতকে উদ্ধার করবে। অনেকের আশা, সুভাষবাবু মালয়ে সৈন্যবাহিনী গড়ছেন, তিনি সসৈন্য বার্মার পথে এসে পড়বেন। কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে নিজেদেরও যে কিছু করণীয় আছে, এটা কেউই মনে করেন না। অজ্ঞাতপরিচয় অখ্যাত কোনো কোনো দেশসেবক জায়গায় জায়গায় বিপ্লবের পতাকা ওড়াচ্ছেন। আর তাঁদের ওপর পুলিস যেভাবে দমননীতি প্রয়োগ করছে, তা দেখে সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। পুলিসী জুলুমের একটা নমুনা তো আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম।' সূর্য তার দেবপট্টনমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল।

মনোযোগ দিয়ে সব শোনার পর প্রধান বললেন— 'অন্যান্য দেশেও স্বাধীনতার জন্যে মানুষকে এর চেয়ে ঢের বেশি মাত্রায় দুর্ভোগ সইতে হয়েছে। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের অধীন থাকার ফলে আমাদের দেশের মানুষ অধৈর্য হয়ে পড়েছে, ভীতু হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও এখানে ওখানে লোকের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ চোখে পড়েছে।

তাদের নিষ্ঠাও অপরিসীম। বিদেশী শাসনের প্রতি লোকের মনে যে তিক্ততা জমা হয়ে আছে, একদিন তা জ্বলে উঠবেই, আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে ব্রিটিশ শাসন ছারখার হবেই। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গকে নিবতে না দেওয়া— তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা।— সূর্য, মনে হয় তোমার দিল্লী আসার খবর পুলিসের কানে পৌঁছে গেছে। তুমি আজই কলকাতা রওনা হতে পার না? ওখানে জরুরী কাজ পড়ে আছে।'

'নিশ্চয়। সানন্দে।' সূর্য তৎক্ষণাৎ জবাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়েছে সীতা যদি জেদ ধরে বসে তাহলে 'এক ঢিলে তুই পাখি' মারা যায়। ওকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে সূর্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।

কলকাতায় তার কর্মসূচী বুঝিয়ে দিয়ে প্রধান তাকে বিদায় দেন।

যে ঘরে বসে মৌলবী কোরান পড়ছিলেন, সেই ঘরের কোণে একটা সরু কাঠের সিঁড়ি। সূর্য আর তারিণী মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে কামরায় ঢুকে সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। ওপরের কামরায় তুখানা পুরনো বেতের চেয়ার পড়েছিল, ওরা তাতে বসল।

তারিণী জিজ্ঞেস করল— 'কলকাতায় কবে যাবেন ভাবছেন?'

সূর্য বলল— 'ভাবাভাবির কী আছে? আজও যেতে পারি। কিন্তু যাবার আগে সীতার ব্যাপারে চিন্তা করে একটা যা হোক ফয়সালা করে যেতে হয়। তারিণী, রাঘবনটা একটা রাক্ষস। সীতা যে সত্যি কী যন্ত্রণা ভোগ করছে, সেটা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। মানুষ যে কত নিচে নামতে পারে, আমার জানা ছিল না।'

তারিণী বললে— 'বুঝলাম। কাল সীতার বাড়ি গিয়েছিলেন। রাঘবনের বিরুদ্ধে সীতা খুব করে লাগিয়েছে।'

'কেবল লাগানি শুনেই এরকম কথা বলবার পাত্র নই আমি। আমিও গোড়ায় সীতার কথায় বিশ্বাস করিনি। কিন্তু নিজের চোখে সব ঘটনা দেখার পর বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সীতা যে তার তুঃখের

কাহিনী বলে— সেটা আসল যন্ত্রণার দশভাগের একভাগও নয়।'

সূর্য এক এক করে গত রাত্রের সব ঘটনা ব্যক্ত করে। শুনে তারিণীর মুখে দুঃখদুশ্চিন্তার মেঘ ঘন হয়ে জমে ওঠে। বলে—

'আপনার চোখে দেখা না হয়ে কেবল শোনা কথা হলে আমিও বিশ্বাস করতে পারতাম না। রাঘবন যে এতদূর হিংস্র আর অমানুষ হতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

'সেই তো। কেই বা ভাবতে পেরেছে বলুন। যাই হোক, আমি উঠি। সীতা হয়তো এতক্ষণ এসে পড়েছে। তাকে কী বলি বলুন তো? সঙ্গে করে নিয়েই যাব নাকি কলকাতায়?' সূর্য তারিণীর পরামর্শ নেয়।

'আপনি যে মুহূর্তে তাকে নিয়ে যাবেন, তখন থেকেই তার জীবন শেষ হয়ে গেল, জানবেন। আপনি সীতাকে কোনমতে বুঝিয়ে সুজিয়ে তার বাড়িতেই রেখে আসুন। আমি তার খোঁজখবর নেব। আমি আজ রাত্রেই রাঘবনের সঙ্গে দেখা করে কথা বলব।' তারিণী বলল।

'আজ রাত্রেই রাঘবনের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে আপনার।' সূর্যর প্রশ্নে শুধু বিস্ময়ই নয়, আরো কিছু ছিল।

'আজ সে যে পার্টিতে যাবে, আমিও ভাবছি সেখানে যাব। রাঘবনের স্বভাব আজ থেকেই বদলে যাবে। তার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'কিন্তু রাঘবনটা একটা পিশাচ। তার সঙ্গে আপনার দেখা করা কি কথা বলা আমার আদৌ পছন্দ নয়। ও পারে না হেন কাজ নেই।'

'পছন্দ আমারও নয় সূর্য। তবু সীতার মুখ চেয়ে এটা আমাকে করতে হবে।'

'আচ্ছা, সীতার জন্যে এত মমতা কেন আপনার? বলুন তো?'

'যদি বলি বিশেষ সংগত হেতু আছে। দয়া করে তা জানতে চাইবেন না।'

'আপত্তি থাকলে বলবেন না। তা ওর ওপর যখন এতই টান আপনার— একটা কাজ করুন-না। এবার বম্বে গেলে ওর বাবার একটু খোঁজ নেবেন তো। তাঁর পুরনো বাসার ঠিকানা আছে আমার কাছে, আপনাকে দেব'খন। সীতার পরিস্থিতিটা তাঁর কানে গেলে, তারপর আমাদেরও দায়িত্ব খানিকটা হালকা হয়।'

'সূর্য। একটা কথা বলছি। অবাক হবেন না। সীতার বাবার ঠিকানা আমি জানি। কিন্তু তিনি এখন সীতাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। তাঁর বর্তমান অবস্থার পরিচয় পেলে সীতাও খুশি হবে না।'

সূর্য চুপ করে রইল। ভাবল, সীতার বাবা হয়তো কোনো মারাত্মক ক্রাইম করেছেন। ক্রিমিনাল মামলার আসামী হয়ে লম্বা মেয়াদের কয়েদ খাটছেন।··· কিন্তু হঠাৎ একসময় ওর মনের চোখে একটা চেহারা ভেসে উঠল। নিচের তলার কামরায় বসা দাড়িওলা মুসলমান মৌলবী ভদ্রলোকের মুখ। জিজ্ঞেস না করে পারল না— 'আচ্ছা তারিণী। নিচে কোরান পড়ছেন যে মৌলবী সায়েব— ভদ্রলোক কে বলতে পারেন?'

'পারি বই-কি। উনি আমার বাবা।'

একত্রিশ

সেই এক কথা ভাবতে ভাবতেই পথ হাঁটছে সূর্য। জুম্মা মসজিদ পেরিয়ে চাঁদনি চকে এল। টাউন হলের সামনে চলে এল…'বাবা! তারিণীর বাবা।…'

সীতা রাস্তার এক ধারেই দাঁড়িয়েছিল। সূর্য ক্ষিপ্রগতিতে তার কাছে গেল। বলল— 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ নাকি?'

'এই মিনিট পনেরো। তবে রাস্তার লোক কেবলই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। উত্ত্যক্ত লাগছিল।'

টাউন হলের পেছন দিকের রাস্তা দিয়ে দুজনে গান্ধী ময়দানের দিকে পা বাড়াল। আগের দিন যেখানে বসে তারিণী আর সূর্য কথা বলেছে সেই গাছতলার দিকেই হাঁটতে থাকে ওরা। কেউ কোন কথা বলছিল না। সীতার প্রতি কর্তব্যচেতনা সূর্যর মনে সবেগে ক্রিয়া করছিল।

গাছতলায় বসে সীতা একবার এদিক-ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল— 'সূর্য, যত শীগ্যির পার এই শহর ছেড়ে চলে যাও। পুলিস তোমায় ধরার চেষ্টা করছে। টেলিফোনে নিশ্চয় পুলিসই তোমার নাম করে কথা বলছিল। আমার কাছ থেকে খবর বের করার চেষ্টা করছিল। তোমায় সাবধান করবার জন্যেই আমি বিশেষ করে এসেছি। টেলিফোনে এসব কথা না বলাই ভাল। কেউ আড়ি পেতে শুনতে পারে। সেই ভয়েই কিছু বলিনি তখন। আজ রাত্তিরেই কোথাও চলে যাও।' এক নিঃশ্বাসে বলে সীতা থামল।

'আমার জন্যে এত চিন্তা কোরো না। পুলিস আমায় গ্রেপ্তার করলেই বা কী? এপথে যখন নেমেছি, ধরা পড়ার জেল খাটার

জন্যে প্রস্তুত হয়েই নেমেছি। তোমার নিজের কথা বলো। কাল রাত্তিরে আমি বেরিয়ে আসার ছল করে তোমাদের বাগানে লুকিয়ে ছিলাম। সব-কিছুই আমার চোখে পড়েছে। সব কথাই আমি নিজের কানে শুনেছি। রাঘবন তোমার গায়ে বারবার হাত তুলেছে তাও দেখেছি। দেখে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠেছিল। ওরকম নৃশংস স্বামীর কাছ থেকে তুমি চলে যেতে চাইলে তোমাকে দোষ দিতে পারি না। এমন-কি আমি নিজেও তোমাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। আজ রাত্তিরেই আমি কলকাতা যাচ্ছি। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। তোমায় অমরনাথের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারপর আমি আমার কাজে যাব। অমরনাথ আর চিত্রা আমার কথায় সব করতে পারে।'

সীতা অন্যমনস্কভাবে সব কথা শুনছিল। এবার বললে, "সূর্য, ওসব কথা থাক্। আমি মত বদলেছি। প্রাণ যায় যাক। আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে যাবার চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাঁর ইচ্ছেয় চলব, তাঁকে খুশি করব— এখন থেকে এই আমার ব্রত। কাল রাত্রের ঘটনার পরও আমার ওরকম সংকল্পের কথা শুনে হয়তো তুমি আশ্চর্য হচ্ছ। হয়তো সত্যি বলে বিশ্বাসও করছ না। কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি। আজ দুপুরে একটা পত্রিকায় কস্তুরবা গান্ধীর জীবনী পড়ে আমার মন বদলে গেছে। কস্তুরবা কত কষ্ট ভোগ করেছেন, জান? সত্তর বছর বয়সেও জেলে গেছেন। সতী সাধ্বী তিনি।'

সূর্যর মাথা থেকে একটা বড় বোঝা নেবে গেল। সীতার সংকল্প তার ভীষণ মনঃপূত হয়েছে। তবুও মগজ ব্যাপারটাকে অত সহজে নিতে পারল না। বললে—'একটা কথা আছে—'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি'...এখন দেখছি কথাটা খাঁটি। কস্তুরবার স্বামী পৃথিবীপূজ্য মহাত্মা গান্ধী। তাঁর সঙ্গে যার তার তুলনা চলে?'

'সূর্য, কস্তুরবা যখন তাঁর স্বামীর ইঙ্গিতে চলতে শুরু করেছেন, তখনো গান্ধীজী মহাত্মা বলে পরিচিত হননি। আমার স্বামীও

আমাকে সবরকম স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। যেখানে খুশি যাই, যার সঙ্গে ইচ্ছে মেলামেশি করি— এতটুকু বাধা দেননি কোনদিন। আমিই অনর্থক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাঁর জীবনে অশান্তি এনেছি। এখন ভেবে দেখছি সব অনিষ্টের মূল আমি নিজেই। আঃ। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যাক। এখন আমি সামলে গেছি। সংকল্প স্থির করেছি। আমার মন আর বদলাবার চেষ্টা করা বৃথা।'

শুনে সূর্য বিচলিত হয়ে পড়ে। বলে— 'আমি তোমার মন বদলাবার চেষ্টা কখনো করিনি সীতা, কখনো করবও না। তোমরা দুজনে দুজনের মনের মত হয়ে চলবে— এই তো কাম্য, এর চেয়ে খুশির খবর আর কী হতে পারে? আমি তোমাদের সুখী দেখতেই চাই। ঠিক আছে। অন্ধকার হয়ে এল। চলো। এখন তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি নিজের কাজে যাই।'

সীতা বললে— 'তোমার সঙ্গে আসার দরকার নেই সূর্য। তুমি শুধু আমায় একটা ট্যাকসি ডেকে দাও। নাহয় আমি নিজেই ডেকে নিচ্ছি।'

'সেটা ঠিক হবে না সীতা। আমায় আমার কর্তব্য করতে দাও। আজকাল দিল্লীতে প্রতি পদে পদে বিপদ ঘটছে। মেয়েদের একা একা চলাফেরা না করাই ভাল। বিশেষ করে রাতবিরেতে তো মোটেই উচিত নয়।'

'তুমি মিথ্যে চিন্তা করছ সূর্য। আমার কিছু হবে না।'

'তুমি জানো না। কাল বিকেলে আমি আর তারিণী এই গাছতলায় বসে কথা বলছিলাম। তারিণী উঠে যাবার পর তিনজন লোক আমার কাছে এল। একথা-সেকথার পর আমায় বলে বসল— মেয়েছেলেটাকে ধরিয়ে দাও লাখ টাকা দেব।'

'কী সাংঘাতিক কথা। কারা তারা?'

'মনে হল কোন দিশি রাজার রাজ্যের লোক। বল, দিল্লীর এই অবস্থায় এই অন্ধকার রাত্তিরে তোমায় একলা ছাড়তে পারি?'

'তুমিও যেমন, সূর্য। কোথায় তারিণী আর কোথায় আমি।

সে হ'ল সুন্দরী। তার জন্যে যারা একলাখ টাকা দিতে চেয়েছে, তারা আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। দেখলেও পালিয়ে যাবে। সবাই তো আর আমার স্বামীর মতন নয়। সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'তা থাকো না। কে তোমায় আটকাচ্ছে। তোমায় তোমার বাড়ি পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য পালন না করলে আমার মন শান্ত হয় না। তোমার বাড়ির ভেতরে আমি যাব না। তোমার বাড়ির বাইরে রাস্তায় তোমায় নাবিয়ে দিয়ে আসব। সেখান থেকে তুমি একলাই চলে যেয়ো। অন্ততঃ এটুকু করতে না পারলে আমার উদ্‌বেগ থেকে যাবে।'—সূর্য বলল।

'ঠিক আছে। তোমার যেমন ইচ্ছে।' সীতা নিমরাজি হয়।

তারা উঠে পড়ে। ময়দান থেকে চাঁদনি চকের রাস্তাটা নির্জন। রাস্তার একপাশে একটা বড় গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। তার নাম্বার প্লেটটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যর মনে আঁকা হয়ে গেল—1111 পরপর চারটে এক। গাড়িটার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সূর্যর মনে কী যেন সন্দেহ হল। কিন্তু সন্দেহ ভঞ্জনের উপযুক্ত সময় নয় এটা। এইভেবে ওরা একটু জোর পায়ে চলল।

চাঁদনি চক পৌঁছে ঘণ্টাঘরের কাছ থেকে ওরা একটা ট্যাকসি ধরল। ট্যাকসি ওদের নিয়ে নয়াদিল্লীর দিকে চলল।

একসময় সূর্যর মনে হল একটা গাড়ি ওদের ট্যাকসির পেছু নিয়েছে। কিন্তু সন্দেহটা ঠিক কিনা নিশ্চিত বুঝতে পারল না। দিল্লীর রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে রাশি রাশি গাড়ি চলেছে। সন্দেহ ভঞ্জনের আশু কোন উপায় দেখল না। ট্যাক্‌সি বেশ দ্রুতই যাচ্ছে। 'যন্তর-মন্তরের' কাছাকাছি আসতে সীতা বলল—'গাড়ি এখানেই থামাও। আমার বাড়ি এখান থেকে খুব কাছে। চলে যেতে পারব।'

গাড়ি থামতে সীতা নামল। নামতে নামতে বলল—'আজ রাত্তিরেই তুমি কলকাতা রওনা হয়ে যাও। দেরী কোরো না। বুঝলে?'

'ঠিক আছে, তাই যাব। তুমি চলে যাও।'

সীতা বললে— 'জানি না আবার কবে দেখা হবে। কিন্তু তোমার কথা আমি ভুলব না সূর্য। কখনো না। এ জন্মে না।'

'আমিও তোমায় ভুলতে পারব না সীতা।'

রাজপথ দিয়ে সীতা চলে যায়। সূর্য গাড়ি থেকে নেবে তার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুধের মত ধবধবে চাঁদনী ঝরে ঝরে পড়ছে। আশপাশের বাড়ির লাগা বাগান থেকে রাতের রজনীগন্ধার সুরভি মৃদু বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আবেষ্টনীর সারা সৌরভ অঙ্গে মেখে রাজপথ বেয়ে সীতা চলে যাচ্ছে। সূর্য দেখছে। ছবির মতন। ছায়াছবির মতন লাগছে।

'কী জানি কী আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। সীতা বলছে তার মন বদলে গেছে। সেকি সত্যি বলছে? নাকি ঐ বলে আমায় ভুলিয়ে দিলে। বাড়ি গিয়ে বিষ খাবে বলে? আজ যদি সীতা মরে, তবে তার মরণের দায়ভাগ কি আমাকেই কিছুটা বইতে হবে না?' সূর্য হঠাৎ গভীর চিন্তায় পড়ে যায়।

যে গাড়িটা ওদের ফলো করছিল, এইসময় সেটা সূর্যর পাশ দিয়ে সোজা সামনে বেরিয়ে গেল। তার নাম্বার প্লেটের 1111 অংশগুলো তীব্র গতিতে সূর্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল।

গাড়িটা প্রায় ঝড়ের বেগে সীতার পাশে এসে ব্রেক কষল। গাড়ি থেকে দুজন লোক ঝটিতে নেবে পড়ে সীতাকে ধরে জোর করে গাড়ির ভেতরে তুলে নিল। তারপর পলক ফেলার আগেই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার একই পথ দিয়ে ফিরে চলল। সমস্ত ব্যাপারটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘটে গেল। এক লহমার জন্যে সূর্যর মাথাটা যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। চকিতে ওর কানে একটা ক্ষীণ ধ্বনি ভেসে আসে— গাড়ির ভেতর থেকে কে যেন ওর নাম ধরে ডাকল। পরক্ষণেই সূর্য প্যাণ্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে চলতি গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। অল্পের জন্যে টায়ারে গুলি লাগল না। চকিতে ট্যাকসিতে উঠে সূর্য নির্দেশ দিল—'ঐ

গাড়ির পেছু নাও। যা চাও পাবে। আপত্তি করলে গুলি করব

'তেল কম আছে, সাহেব।' ট্যাকসি ড্রাইভার জবাব দিল

'পরোয়া নেই। যতক্ষণ তেল থাকে চালিয়ে যাও।' সূর্য বলল। ইতিমধ্যে এক পুলিসঅলা এসে পড়ে সূর্যকে বলে—'তুমি গুলি চালাচ্ছিলে ? দেখি তোমার বন্দুক দাও।'

সূর্য তাকে জোরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর কড়াগলায় 'যাও' বলার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকসি হাওয়া হয়ে যায়।

পুলিসের লোকটা ধুলো ঝেড়ে উঠে তিনবার সিটি বাজায়। খানিক পরেই সেখানে একটা জীপ এসে পড়ে। জীপে চারজন পুলিস। এ লোকটাও জীপে উঠে পড়ে তাদের কী বলে। জীপটা গাড়ি দুটোর পেছনে ধাওয়া করে।

সীতাকে জোর করে তুলে নিয়ে গাড়িটা শাজাহানপুরের রাস্তা ধরে। চাঁদনি চক, জুম্মা মসজিদ হয়ে, লালকেল্লাকে ডান হাতি ফেলে রেলওয়ে লাইন পার হয়ে যমুনার পুলের ওপর ওঠে। প্রথমে সীতা ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর ওর সূর্যর হুঁসিয়ারী মনে পড়ে। সীতার প্রত্যয় ছিল যে সূর্য গাড়ির পেছন নেবে এবং যেভাবে হোক গাড়িটাকে ধরে তবে ছাড়বে। কিন্তু যমুনার পুলের কাছে এসে ওর মন দমে গেল। সংকীর্ণ পুল। একতরফা গাড়ি চলছে। দুদিক দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করা অসম্ভব।

সীতা যা ভয় করছিল তাই হল। তার গাড়ি পুলের ওপর চড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস পেছনের গাড়িগুলোকে থামবার সংকেত করল। গাড়িটা পুল পেরোতেই ওপারের সিগনালের জন্যে অপেক্ষমাণ গাড়ির সারি পুল পেরনো শুরু করল। এই দেখে সীতা আতংকিত হয়ে পড়ল। দিশেহারা হয়ে তীব্র চীৎকার করে চলতি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। পাশে বসা লোকটা এই দেখে সজোরে সীতার মুখের ওপর একটা ঘুঁষি মারল। সীতার চীৎকার আর লাফিয়ে পড়ার প্রয়াস বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ির ভেতরটা একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বত্রিশ

পরদিন বিকেলে রাঘবন যখন দেওয়ান আদিবরাহাচার্যর বাড়ি গেল, তখন তার মুখে শোকাচ্ছন্ন মলিনতা। দিনভরের দুশ্চিন্তা, রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি সারা মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখে ভামা তাকে আপ্যায়ন করল— 'আসুন রাঘবনজী। একি চেহারা হয়েছে! যেন বউ পালিয়ে গেছে!'

ছুঁচ ফোটালে যেমন মুখের চেহারা হয় সেই রকম ক্লিষ্ট মুখে রাঘবন বলে, 'আপনারা যে এতখানি হৃদয়হীন হতে পারেন, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আচ্ছা, চলি।' ব'লে সঙ্গে সঙ্গে ফেরার জন্যে পা বাড়ায়।

ধামা তাড়াতাড়ি উঠে তার পথ আগলায়। বলে— 'ভামার কথা ধরবেন না। ওর ঐরকম মুখ। ওর কথা শুনেই সবাই পালিয়ে যায়। আপনি বসুন। এই দিল্লী শহরে আমাদের মতন হিতৈষী আর সহানুভূতিশীল বন্ধু আপনার আর কেউ নেই রাঘবন— এ তো আপনার জানা কথা। তবে?'

রাঘবন ফিরে যাবার সংকল্প ত্যাগ করে সোফায় বসে পড়ে। বলে—'শুধু দিল্লীতে কেন, কোথাও আমার কোন বন্ধু নেই। চাকরীর সুবাদে যে বন্ধুত্ব, সেটা রেলগাড়ির বন্ধুত্বের চেয়েও সস্তা। যতক্ষণ আমার সুসময়, ততক্ষণ সবাই খুব ঘনিষ্ঠতা দেখাবে আর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পেছনে ঘুরে বেড়াবে। বিপদে পড়লে ফিরেও তাকাবে না। চাকরী গেলে আর ছায়াও মাড়াবে না কেউ। আমার আজ সেই দশাই হয়েছে।'

'কী বললেন? আপনার চাকরী নেই? তাই নাকি? সেকি—

কেন, কীজন্যে ? এ তো মহা অন্যায় কথা, এ তো জুলুম !'—ভামা-ধামা বাক্যবর্ষণ শুরু করে।

'এখনো চলে যায়নি পুরোপুরি। তবে যাবার মতই। তদন্ত পুরো হওয়া পর্যন্ত 'সাসপেণ্ড' অর্ডার হয়েছে। কিন্তু এরপর আমাকে ফিরিয়ে বহাল করলেও ওখানে আর চাকরী করা যায় না। অনেকদিন থেকে আপনার বাবাকে বলে আসছি আর-কোথাও আমার সুপারিশ করে দিতে। এবার সেই সময় এসেছে। এখন যদি আপনার বাবা আমায় না দেখেন তো আমার আর কোন চারা নেই।'

'এতে আর বাবার অসুবিধে কিসের ? কোন ব্যাংক কিংবা বীমা কোম্পানিতে আপনাকে কোনো একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। আচ্ছা বলুন তো কী কারণে আপনাকে সাসপেণ্ড করা হল ? কিসেরই বা তদন্ত ?' ধামা প্রশ্ন করে।

"আজ অফিসে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে"— রাঘবন তার কাহিনী সবিস্তারে শুরু করে, "আমার ডিভিসনাল চীফের ঘরে ডাক পড়ল। তখনই ভেবেছি আজ একটা কিছু হবে। তাই হল। অফিসার বললেন— 'রাঘবন, আমি খুবই দুঃখিত, তোমাকে সাসপেণ্ড করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ তো তোমার জানাই আছে !'... আমি বললাম— আমি তো কিছুই জানি না। আপনি যদি দয়া করে বলে দেন তো খুবই ভাল হয়।...তিনি বললেন—'তবে শুনুন। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে আপনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপনার গৃহে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে আসছেন।' তাতে আমি বললাম— আমার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ কীভাবে আসে ? আমিই তো পুলিসকে বিপ্লবীদের খবর দিয়েছি।...তাতে ওপরঅলা বললেন— 'মিস্টার রাঘবন আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তদন্তের সময় পুলিসের কাছে সাফাইয়ের জন্যে এরকম যুক্তি দেবেন না। ঐ বিপ্লবী যুবকটি সম্পর্কে পুলিস আগেই সন্ধান পেয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ খুঁজছিল। সেই সময় আপনি খবর দিয়েছেন। তাতে কী

লাভ ? এতে বরং একটা জিনিসই স্পষ্ট হয় যে নিজেকে বাঁচাবার এবং নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্যেই বাধ্য হয়ে আপনি এই খবরটা দিয়েছেন।'

"শুনে আমার বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে যায়। অফিসার বলতে থাকেন—'সরকারী চাকুরেদের, বিশেষতঃ দিল্লী সেক্রেটারিয়েটের চাকুরেদের চরিত্র সীজার-পত্নীর মত নিষ্কলুষ এবং সন্দেহাতীত হওয়া আবশ্যক। মনে রাখবেন এটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। তার ওপর অবস্থা এখন খুবই জটিল। সেই কথা বিবেচনা করেই এতদিনকার নিয়ম ভেঙে একজন সামরিক সেনাধিনায়ককে ভাইসরয় করে পাঠানো হয়েছে। সেনাপতি ওয়াভেল ভাইসরয় হয়ে এসেছেন, এ থেকেই আপনার অনুমান করা উচিত যুদ্ধ এখন সঙ্কটজনক অবস্থায় চলেছে।' আমি এবার তাঁর কথার জবাবে বললাম— হ্যাঁ বেশ ভালই বুঝতে পারছি। কেন তাঁকে বড়লাট করে পাঠানো হয়েছে, তাও বুঝছি। ওয়াভেল সাহেব যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে কেল্লা জেতা তাঁর হবে না, কেল্লা ঘুচিয়ে আসবেন।—শুনে অফিসার হেসে ফেলে বললেন, 'কাল তদন্তের সময় আপনার এই অভিমতটা শুনিয়ে দেবেন। এখন আপনি যেতে পারেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম— কই আপনি তো বললেন না যে আমার দোষটা কি, কিসের সন্দেহ আমার ওপর ? তিনি বললেন, 'এনকোয়ারীর সময়ে তাঁরাই সব কথা সবিস্তারে শোনাবেন। আমি একটু আভাসমাত্র দিতে পারি। আপনার ওপর সন্দেহের হেতু হল— যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার হাতে আপনার রিভলভার পাওয়া গেছে।' আমি: রিভলভারটা চুরিও তো যেতে পারে। তিনি: 'হ্যাঁ তা পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা দরকার। আপনার ওপর সন্দেহের আরো একটা কারণ আছে। আপনার স্ত্রী কাল থেকে নিখোঁজ।' আমি আপাদমস্তক কেঁপে উঠলাম। বললাম, আমার স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে আমাদের এখানকার কথার কী সম্বন্ধ ? জবাবে ওপরঅলা

যা বললেন, সেটা ভাবতে গেলে হাসি পাচ্ছে”— বলে রাঘবন নিষ্প্রাণ কাষ্ঠহাসি হাসতে থাকে।

‘এত হাসি পাবার মতন কী এমন কথা বললেন আপনার বড়-কর্তা ?’—ভামা জিজ্ঞেস করে।

‘সে এক আজগুবী কথা। বললেন, সীতাও বিপ্লবী। সীতা আর সূর্য একযোগে ষড়যন্ত্র করে আইন-বিরুদ্ধ বেশ কিছু কাজ করেছে। তারা তুজনে মিলে গোপন বেতার মারফত ভারত-সৈন্যের গতিবিধির খোঁজখবর বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে পাঠাত। সে কাজে আমারও হাত ছিল। একদিকে আমি পুলিসে খবর দিয়েছি, আর অন্যদিকে ওদের সাবধান করে দিয়ে পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সূর্য ধরা পড়েছে। কিন্তু সীতা লুকিয়ে পড়েছে!— কী রকম কাহিনী শুনছেন ? আমোদ পাবার মতন না ?’

‘সত্যি রাঘবন, আপনার স্ত্রীর কোনই খবর পাওয়া গেল না ?’

‘না, কিছুই না। আর কী প্রহসন দেখুন। আমি গতকালই আপনাদের বলে গেলাম না যে অতীতে যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, এখন থেকে তুজনের সব মনান্তর ঘুচিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনবই। এই সংকল্প নিয়ে ঘরে ফিরে দেখলাম ঘর শূন্য— সীতার খোঁজ নেই। একে কী বলবেন ? বিধির বিড়ম্বনা নয় ?’—

রাঘবনের কথা শুনে ধামা বলে— ‘আচ্ছা রাঘবন, সূর্যকে তো আটক করেছে। তার কাছ থেকে সীতার কোন খবর পাওয়া যায় না ? দেখুন-না চেষ্টা করে। পুলিস ইনস্‌পেক্টর তো আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই না।’

‘হাঁ, বন্ধু তো বটেই। আগে একবার আমায় বড় সাহায্য করে-ছিলেন। এখনো আমি ওঁর ভরসাতেই আছি। আমি বলেছিলাম মকদ্দমা এখানে চললে আমার বদনাম হবে, ওটা নাগপুরে ট্রান্সফার করে দিন, উনি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমার সম্পর্কে ব্যক্তিগত তদন্ত চললে উনি আমার পক্ষে কথা বলবেন বলে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু সীতার ব্যাপারে এখনো কিছু সন্ধান পাননি। সূর্যর মাথায় জোরাল চোট লেগেছে। তার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফেরেনি। অজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকেছে—

'সীতা, আর বাঁচা গেল না, ধরা পড়ে গেলুম!' ও যে-ট্যাকসিতে ছিল তাকে আমার সামনেই জেরা করা হয়েছে। সেও এক বিচিত্র কাহিনী। চাঁদনিচকে শাহজাহানাবাদের রাস্তায় এক যুবক আর এক যুবতী তার ট্যাকসিতে চড়ে। যন্তরমন্তরের কাছে এসে যুবতীটি গাড়ি থেকে নেবে হাঁটতে শুরু করে। ইত্যবসরে একটি বড় গাড়ি পেছন থেকে এসে যুবতীকে জোর করে তুলে নিয়ে •ফেরত-পথে পালাতে থাকে। যুবকের নির্দেশমত ট্যাকসি সেই গাড়ির পেছু নেয়। কিন্তু যমুনা পুলের ওপর আগের গাড়ি বেরিয়ে যায়। খানিকপরে পুলিসের জীপ এসে ট্যাকসিকে ধরে ফেলে। ট্যাকসি-অলার কথা শুনে মনে হচ্ছে যুবতী আর কেউ নয়— সীতাই। কিন্তু সীতাকে এরকমভাবে ধরে নিয়ে যাবে কে? কেই-বা ধরবে? ভাবতে পারছি না। মাথা ঘুরে যাচ্ছে।' রাঘবন ক্লান্তস্বরে বলে।

ভামা বললে—'আর অন্য গাড়িটার খোঁজ নেবার চেষ্টা করেনি পুলিস?'

'করেনি আবার? চারদিকে তার করেছে। টেলিফোনে গাড়ির নম্বর জানিয়ে দিয়েছে। সে গাড়ি এখান থেকে একশো মাইল দূরে ধরাও পড়েছে। কিন্তু খবর পাওয়া গেছে তাতে কোন মেয়েছেলে নেই। আজ সকালেই ইন্সপেকটর আমায় ফোন করে সব বললেন।'

ধামা বললে—'তার মানে আপনার সীতা একেবারেই গেছে, আর সে ফিরবে না। মিস্টার রাঘবন, আপনাকে সমবেদনা জানাচ্ছি।'

'আর বলবেন না, আমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। এ পর্যন্ত অফিসটা ছিল। কাজ নিয়ে ভুলে থাকতাম, তা সেটাও কেড়ে নিল। এখন আমার জীবনে আর কী রইল বলুন।'

'ও-কথা বলবেন না। মাদ্রাজ থেকে মেয়েকে আনিয়ে নিন। অমন চাঁদের মতন মেয়ে আপনার। তাকে এনে কাছে রাখুন। তাকে সুখী করে আবার সুখী হয় উঠুন।'

মেয়ের কথা বলতে রাঘবনের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। ধরা গলায় বলে—'মেয়েকে যে নিয়ে আসব, সে যখন বলবে 'আমার মা কোথায়' কী জবাব দেব ? তা ছাড়া এখানে তাকে দেখবে কে ?'

'সেটা কোন অসুবিধের ব্যাপারই নয়। মেয়েকে এখানে আনার আগে কষ্ট করে তার একটা মায়ের বন্দোবস্তও করে ফেলুন। এমন একজনকে আনুন যে একাধারে বাচ্চার মা-ও হবে আবার আপনার শূন্যঘরের ঘরণীও হবে। চাকরীর চিন্তা ছাড়ুন। এ চাকরী গেলে এর চেয়ে বড় চাকরী আমার বাবাই করে দিতে পারবেন।' ধামা বললে।

বাড়ি ফেরার পথে রাঘবনের মাথায় ধামার কথাগুলোই ঘুরপাক খায়। 'মেয়ের জন্যে আর-একটা মা আনুন'— তার মানে ? মানেটা একেবারে বোধগম্য নয় তা বলা যায় না। কিন্তু ঐ ধরনের সমাধানের কথা ভাবতেও তার মন রাজি নয়।

বাড়ি পৌঁছে দেখল চাকরবাকরের মুখেও একটা শোকের ছাপ। রাঘবন তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে যায়। আবার বেরিয়ে আসে। এক এক করে সব ঘরে ঘুরে বেড়ায়। ঘরের কোণে কোণে কী যেন তন্ন তন্ন করে খোঁজে। এক-একটি ছবি, এক-একটি সামান্য জিনিস— সব কিছুই সীতার স্মৃতিতে ভরপুর। রাঘবনের মনে পড়ে— এ বাড়িতে যেদিন ওরা দুজনে নতুন নতুন এল, সবে তখন সংসার পেতেছে— কী আনন্দ, কী শুদ্ধ, কী মধুর প্রেমের বিভোরতায় ভরা সেই দিনগুলো। মান-অভিমান আর মানভঞ্জনের কত বর্ণাঢ্য দিন! তারপর আস্তে আস্তে ছোট ছোট কথা নিয়ে মনোমালিন্য বাড়তে লাগল। সে-সব স্মরণ করতে গেলেও সীতার একবিন্দু দোষ দেখতে পায় না। সবের মূলে ওর একলারই দোষ। কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে মনস্তাপ করে কী ফল ? যে চলে গেছে, সে আর ফিরবে ? নাকি তার জায়গায় আর-একজনকে আনতে তার মন চাইবে ? না, কক্ষনো না!... ভাবতে ভাবতে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে তার প্রতি অপরিসীম ঘৃণা নিয়েই সীতা ঘর ছেড়ে চলে গেছে। তার অত্যাচার অসহ্য হয়ে ওঠায় আর

এবাড়িতে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ কথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সে যাবে কোথায়? মেয়েকে দেখতে মাদ্রাজ চলে গেল? তা যদি হয় তো খবর পেতে দেরী হবে না।

সূর্যর কয়েদ হওয়া আর সীতার নিরুদ্দেশের মধ্যে সত্যিই কোনো যোগাযোগ আছে নাকি? না, তা হতেই পারে না। কখনো কখনো সূর্যকে নিয়ে সীতার আর ওর মধ্যে মন-কষাকষি তীব্র হয়ে উঠলেও, সীতার চরিত্র সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণা ওর আদৌ ছিল না। তবে, সূর্যর ওপর রাঘবনের এত রাগ কিসের? এ রাগের আসল কারণ কী? সূর্যর সম্পর্কে পুলিসকে খবর দেওয়ার মতন নীচ কাজ করতে গেল কেন? বোঝা গেছে! তারিণী আর সূর্যর অত ভাব দেখেই ও হিংসেয় জ্বলে মরেছে! মিছিমিছি সেই জ্বালার ভাগী করতে চেয়েছে বেচারী অসহায়া সীতাকে। তার জীবনে নরক ডেকে এনেছে। এখন এই বিপত্তির পাহাড় তার মাথায় ভেঙে পড়বে না তো কার মাথায় পড়বে?

সেদিন রাত্তিরে পার্টিতে তারিণী তাকে করজোড় অনুনয় করে বলেছিল সীতাকে মাদ্রাজে রেখে, আসার পথে বোম্বাই ঘুরে আসতে। বলেছিল— নিজের জীবনের কিছু রহস্য রাঘবনের কাছে ব্যক্ত করবে। সে কোন্ রহস্য!

ধামা আর ভামা তারিণীর সম্পর্কে একটা সন্দেহ ব্যক্ত করেছে। তারিণী হয়ত সরকারের তরফে গুপ্তচরের কাজ করছে। সেটা অযৌক্তিক। আসলে ওরা দুটো বোন বড় মতলববাজ। অন্যের নিন্দে করাই ওদের পেশা। ওদের সঙ্গ ত্যাগ করাই মঙ্গল। ওর এই দুর্দিনে সাহায্য আর সান্ত্বনা দেবার একজনই আছে— সে তারিণী। তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতেই হবে। সীতার নিখোঁজ হওয়ার কথাও জানাতে হবে। যার বাড়িতে পার্টি সেই অফিসারের বাড়িতেই আরো দিন দুই তার থাকার কথা। ফোন করে দেখবে নাকি? ফোনে যখন শুনল তারিণী ওখানে নেই, রাঘবন বসে পড়ল।

তেত্রিশ

আগ্রার রেল ইস্টিশানে হাঙ্গামার অন্ত নেই। আপ ডাউন দুতরফা গাড়ির কর্কশ আওয়াজ। যাত্রীদের শোরগোল। অকথ্য ভিড়। গাড়ির কামরায়, প্লাটফর্মে তিল ধারণের জায়গা নেই। যত আরোহী, তার আদ্ধেকের ওপর সৈন্যদলের লোক— গোরাও আছে। দিশী সেপাইও আছে। একদা সেনাপতি ওয়াভেল সায়েব বর্তমানে ভারতবর্ষের বড়লাট হয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলে সমস্ত রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীকে কেবল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেই ফিরতে হয়েছে। সেই কলঙ্ক মোচনের জন্যে ওয়াভেল সায়েব একেবারে কোমর বেঁধেছেন এবং ভারত থেকে পিছু হটবেন না বলে পণ করে বসেছেন। তাই সামরিক আয়োজনের কড়াকড়ির সীমা নেই।

আগ্রা বড় জংশন। বহু জায়গার গাড়ির সঙ্গমস্থল। ফলে এই স্টেশনে সবসময় গাড়ির ভিড় লেগেই আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়ের এককোণে সীতা বসে আছে। তার হাতের কাছে একটা ছোট সুটকেস। সুটকেসে একখানা হাত রেখে সীতা আত্মমগ্ন। তার মনের দিশা পাওয়া শক্ত।

আজ থেকে পাঁচবছর আগে এই আগ্রায় এসেছিল সীতা স্বামী আর সূর্যর সঙ্গে। কেল্লার রাজমহল আর তাজমহল দেখে বিভোর হয়েছিল। তখন তার মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা।

কিন্তু সেসব স্বপ্নকে ম্লান করে দিতে পারে এমন একটা ঘটনা ওর জীবনে ঘটে গেছে— সবে মাত্র গতকাল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে সেও এক রাজপুরীতে রাজকন্যার মত কাটিয়ে এসেছে। তার মনে

সেই সময় এক বিচিত্র আনন্দের জোয়ার-ভাঁটা খেলছে। কিন্তু একমুহূর্তের একটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেসব আনন্দের বুদ্‌বুদ্‌ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আবার সে সেই মামুলী মেয়ে সীতা। যারা তাকে তাদের ভ্রান্তিবিলাসের মোহের ফাঁদে ফেলেছিল তারাই আবার তাকে এই আবদ্ধ স্টেশনের কামরায় বসিয়ে দিয়ে, তার হাতে দিল্লীর একখানা টিকিট ধরিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর বাতাসে মিলিয়ে গেছে। না, শুধু টিকিট নয়, সঙ্গে এই বাক্সটাও দিয়ে গেছে। তাদের বিভ্রমের জন্যে তার যে দুর্ভোগ আর বিড়ম্বনার পর্ব গেছে, সম্ভবতঃ সেসবের ক্ষতিপূরণ হিসেবেই বাক্সে কিছু উপঢৌকন রেখে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে—এগুলো রাজমাতার তরফ থেকে ভেট। আহা অসীম দয়া রাজমাতার। কেউ যেন তাঁর উপঢৌকনের জন্যে কাঁদছিল। সীতা বরং বারবার নিষেধ করেছিল কিছু যেন না দেওয়া হয় তাকে। তারা বারণ শোনেনি। সীতা বাক্সটা খুলেও দেখেনি ভেতরে কী আছে।

তাকে ধরে নিয়ে আসার সময় বোধহয় ওরা তাকে কোনো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। পরদিন সকালে জ্ঞান হতে পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছিল। তার খানিক পরে কয়েকজন লোকের কথা-বার্তা ওর কানে গেল। কারা যেন কথা বলতে বলতে তার কাছে আসছিল।

"ঘুমের বড়ির প্রভাব এখনো কাটেনি।"

'ঐ কি আমার বোন?'—কণ্ঠস্বর কোন যুবকের।

'হ্যাঁ, ভাগ্যের বিড়ম্বনার হারিয়ে গিয়েছিল। নইলে এরও আজ তোমার সঙ্গে এই বাজপুরীতে বড় হবার কথা।' বামাকণ্ঠে কেউ বলল।

শুনে সীতার শরীরে পুলকের শিহরণ ওঠে। সেই আবেশে ওর চোখ আবার জড়িয়ে আসে।

এরপর তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলে সীতা দেখে সে এক বিশাল রাজপুরীর সুরম্য প্রশস্ত হর্ম্যে, মখমলে মোড়া মহার্ঘ পালঙ্কে শুয়ে

রয়েছে। দাসী এসে তাকে নম্রমধুর কণ্ঠে সসম্মানে ডাকছে—'পাশের ঘরে হাতমুখ ধোবার সরঞ্জাম তৈরী আছে।' সীতা একবার ভাবল তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু সাহসে কুলোল না।

অর্ধচেতন অবস্থায় যেসব কথাবার্তা তার কানে গেছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে এল যে তাকে কোন অসদুদ্দেশ্যে এখানে ধরে আনা হয়নি। কিন্তু এটা কোন রাজ্যের রাজপ্রাসাদ, যেখানকার ঐশ্বর্যে আমারও কিছু অধিকার রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সত্যি কি তবে আমি এরাজ্যের রাজকুমারী? ভাগ্যের প্রতিকূলতায় রাজপরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এতদিন জীবন কেটেছে? ঐ রাজকুমার আমার সহোদর ভাই? আর ঐ মহিলাটি? উনি কে?

—এসব কি বাস্তবিক ঘটছে? আহা! যদি সত্যি হয়। পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই ঘটে যায়। হয়তো আমার জীবনেও তাই ঘটল! সত্যিই তো। নইলে এদের কী গরজ পড়েছে যে আমার জন্যে এতগুলো লোক ছুটাছুটি করছে!...

আচ্ছা এই সমস্ত ঘটনা যেদিন তাঁর কানে যাবে তখন তাঁর মানসিক অবস্থা কীরকম হবে? রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার সৌভাগ্যে কি তিনি গর্বিত হবেন! এতদিন যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন, তার জন্যে অনুশোচনা করবেন? তা না করুন, অন্ততঃ পক্ষে উপেক্ষা-অবজ্ঞা ছেড়ে আদর-সোহাগ শুরু করবেন?

সীতা এমনিতেই কল্পনাপ্রবণ, তার ওপর ঘুমের বড়ির মাদকতা দুয়ে মিলিয়ে তাকে আকাশকুসুম রচনায় বাধ্য করে।...রাজমাতা রাজকুমার আর তাঁদের একান্ত সচিব আবার ঘরে ঢোকেন। সীতা অপলক চোখে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে বিস্ময় আর উদ্বেগের সমাবেশ।

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে রাজমাতা বলেন— 'আমরা তোমার পর নই মা। আমি তোমার ছোট মা। এ তোমার ছোট ভাই। ভাগ্য-বিড়ম্বনার ফলে তোমাকে এতদিন আমাদের থেকে আলাদা থাকতে হয়েছিল।'

একী মায়ার খেলা! সীতা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ও যা ভেবেছিল এখন দেখছে তাই সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গরীব ঘরের মেয়ে সীতা আসলে রাজত্বহিতা!

'কথা বলছ না কেন মা? তোমাকে এভাবে ধরে আনাটা তোমার নিশ্চয় খুবই খারাপ লেগেছে। তাই কি তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ? আমি তোমায় কতবার ডেকে পাঠালাম। কিন্তু তুমি কিছুতেই আসতে রাজি হলে না। তাই তোমায় জোর করে ধরে আনতে হল। তুমিই বিবেচনা করে দেখ। সামনেই তোমার ভাইয়ের অভিষেক। তার আগে তোমার প্রতি যে অন্যায় হয়েছে সে তার প্রতিবিধান করতে চায়।'—রানীমা বুঝিয়ে বলেন।

এবার রাজকুমার মুখ খোলে—'দিদি, আমার মা যা বললেন তা সম্পূর্ণ সত্যি। আমার কথাতেই আপনাকে এভাবে জোর করে আনা হয়েছে। রাস্তায় আপনার যা কষ্ট হয়েছে, তার জন্যে আপনি ছোট ভাইকে ক্ষমা করুন। আমি জানি আপনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জীবনপণ করে নেমেছেন। সেই পবিত্র কাজে আপনাকে বাধা দেবার উদ্দেশ্য আমার নেই। সত্যি বলতে কি, এই তিলক, এই অভিষেক— রাজা সাজার এইসব ব্যাপার আমার আদৌ পছন্দ নয়। আমিও কায়মনে বিদেশীদের তাড়িয়ে ভারতের মাটিকে মুক্ত করার কাজে নামতে চাই। বড় ভাল হয় যদি আপনি আমায় পথ দেখান— আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে এই কাজে আমার সহায়তা করেন। আমার প্রার্থনা কি আপনি পূরণ করবেন?'

সীতা এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনা। কে যেন তার দুচোখে ঠুলি বেঁধে নির্জন বনে ছেড়ে দিয়েছে। এ কী কানামাছি খেলা। এরা কী বলতে চায়? কোনমতে জবাব দেয়— 'আমি নিজেই একজন অসহায় মেয়েমানুষ। আপনাকে কোন্ সহায়তা আমি কীভাবে করব, জানি না। তাছাড়া, আমার স্বামীর অনুমতি নেওয়া দরকার। তাঁকে কিছুই না জানিয়ে আমাকে এভাবে নিয়ে আসা আপনাদের স্পষ্টতঃ অন্যায় হয়েছে।'

এ কথা শুনে ঘরের লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে না।

তৃতীয় ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে রাজমাতা বলেন— 'কী জ্ঞানদাস। তুমি যে বলেছিলে ভালরকম লেখাপড়া জানা মেয়ে। কই, এ তো একেবারে ভাঙাচুরো ভাষায় কথা বলছে।'

জ্ঞানদাস সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে একখানা ফোটো বের করে নিরীক্ষণ করে। তারপর অপ্রতিভ হয়ে বলে— 'ছিছিছি। এ তো বড়ই ভুল হয়ে গেছে দেখছি। চেহারাটা অনেকটা একই রকম। কিন্তু ইনি তো নন। ছিছিঃ কী ভুলই হয়ে গেছে। এখন উপায় ?'

এবার সীতার দিকে ফিরে রানীমা প্রশ্ন করেন—'সত্যি কথা বল তো মা। তোমার নাম কি তারিণী নয় ?'

ব্যস। ঐ একটি প্রশ্নে সীতার সব সংশয়ের নিরসন হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তার সাধের স্বপ্নপুরী ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আকাশকুসুম বাতাসে মিশে যায়। ও! তবে এই বুদ্ধির বৃহস্পতিরা তাকে তারিণী ভেবে ধরে নিয়ে এসেছেন। আর ও নিজেও এমন নির্বোধ যে এদের গড়া এই ছলনার মরীচিকায় ভুলে বালির বাঁধে তাসের প্রাসাদ তৈরী করতে শুরু করেছিল। এক নিমেষে সব আশায় ছাই পড়ে যাওয়ায় হতাশায় রাগে ঈর্ষায় সীতার মাথায় আগুন ধরে যায়। তার মুখ যেন অগ্নিস্রাবী জ্বালামুখী হয়ে দাঁড়ায়— 'না আমি তারিণীও নই। আর এই ফন্দিবাজ রাজবংশে আমার জন্মও নয়। যেসব মেয়ে মোহিনী সেজে ঠাটঠমক দিয়ে মুর্খ পুরুষদের ভুলিয়ে বেড়ায় সে জাতের মেয়ে আমি নই। আমি গরীব পরিবারের মেয়ে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূ। আহাম্মকী করে আমায় অহেতুক এই দুর্গতি ভোগ করালে। এখন আমার ভবিষ্যতে আরো কত দুর্ভোগ আছে, কে জানে ?" বলতে বলতে সীতা হাহাকার করে কেঁদে ফেলে।

'এই মেয়ে! এত চেঁচামেচি কান্নাকাটি করবে না। না জেনে আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি। তোমাকে ভালভাবে পৌঁছে

দিয়ে আসা হবে। তার দায়িত্ব আমাদের। ভুলের জন্য মাপ চাইছি।'—রানী বললেন।

'তোমাদের আর কী। মুখে এলো বলে দিলে। তোমরা মহাপাপী। নিষ্ঠুর, স্বার্থপর। তোমরা নির্বংশ হবে। তোমাদের চিহ্ন থাকবে না দুনিয়ায়।'—সীতা শাপশাপান্ত করতে থাকে।

রানীমা, হবু রাজা আর সেক্রেটারি সবাই একসঙ্গে ঘর ছেড়ে সরে পড়েন। যেতে যেতে ওঁরা সেক্রেটারির মুণ্ডুপাত করতে থাকেন। সেও তাঁদের পেছনে পেছনে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মাপ্প চাইতে চাইতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

উঃ, সেই হতচ্ছাড়ী পাপীয়সী তারিণীটা কি সীতার জন্মশত্রু! সীতা যেখানে যাবে সেখানেই কি সে বাদ সাধবে? তার জীবনটা বিষে বিষে ছারখার করেও নিষ্কৃতি দেবে না।—'দাঁড়া রাক্ষুসী, এবার একবার দেখা হোক তোর সঙ্গে। তোকে বিষ খাইয়ে না যদি মারি...' অপমানে হতাশায় নৈরাশ্যে সীতা পাগলের মত আপনমনে প্রলাপ বকে।

তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আগ্রা ইস্টিশানের ওয়েটিংরুমে বসে থাকতে দেখা গেল। হাতে দিল্লীর টিকিট। সঙ্গে সুটকেস।··· সীতার এখনো বিশ্বাস হয় না তার জীবনে এতগুলো ঘটনা সত্যিই ঘটে গেছে।

কিন্তু এখন সে কী করবে? তার কী ভবিষ্যৎ? দিল্লীর টিকিট তো আছে। দিল্লীই ফিরে যাবে? গিয়ে কী করবে? স্বামীকে মুখ দেখাবে কী বলে? 'দুদিন ধরে কোথায় ছিলে?'—জিজ্ঞেস করলে কী বলবে? অকারণেই যে আগুন হয়ে থাকে, সে যদি এরকম অজুহাত পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সব সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে দেয়, তাহলে? যদি তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে থাকে যে সীতা সূর্যর সঙ্গে কোন চক্রান্তে লিপ্ত সে ক্ষেত্রে সে সীতাকে ফিরিয়ে নেবে কেন? সীতার করুণ কাহিনী শুনলেও কি রাঘবন বিশ্বাস করতে চাইবে? ভাববে বানিয়ে বলছে। সীতার নিজের ওপর দিয়েই সব ঝড় বয়ে

গেছে, অথচ তারই ভাল করে বিশ্বাস হচ্ছে না— সত্যি না স্বপ্ন! অন্যে কী করে বিশ্বাস করবে। তার চেয়ে একবার যেমন স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভেবেছিল, তেমনি চলে গেলে কেমন হয়? কিন্তু কোথায় যাবে? মাদ্রাজে বাসন্তী আছে। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়িকে মুখ দেখাবে কী করে? হঠাৎ একা চলে আসার কী কারণ দেখাবে? সব চেয়ে ভাল সূর্যর কথামত কলকাতায় চলে যাওয়া। চিত্রা ললিতার সখী। তার বাড়ি থেকে মাদ্রাজে চিঠি লিখে সেখানকার প্রতিক্রিয়া জানার পর সেখানে যাওয়া যেতে পারে। নইলে কলকাতাতেই কোন চাকরী জুটিয়ে নেবে। কত মেয়েই তো আজ-কাল স্বাধীনভাবে থাকে, কাজকর্ম করে। তাই করবে। পরে মেয়েকে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ। সীতা কলকাতাতেই যাবে।

চৌত্রিশ

বিশ্বসুন্দরী কলকাতা মহানগরী। যৌবন-লাবণ্যে সমৃদ্ধ। ভুবন-মোহিনী কলকাতা রূপে সব নগরীর সেরা। অতুলনীয়া। তার বুকে স্বচ্ছ নীল উত্তরীয়ের মত দোদুল্য কাকচক্ষু জলে ভরপুর এক হ্রদ। হ্রদের পাড়ে সবুজ ঘাসের বনাত বিছানো। যেন নীল দোপাট্টার গায়ে সবুজ কলকার পাড়। হ্রদের মাঝখানে মরকত-মণির রঙের সবুজ এক দ্বীপ— যেন পটে আঁকা। সাদা সাদা পাখির ঝাঁক আর নৌবিহারের ছিপ নৌকো— জলকেলি করছে। মাঝখানের দ্বীপ থেকে পাখিদের কলকাকলি সমবেত কণ্ঠের গানের মতন বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুরম্য সন্ধ্যায় সবুজ ঘাসের জাজিমে বসে কিছু লোক অর্ধনিমীলিত চোখে দিবাস্বপ্ন দেখছে কিংবা মনে মনে কাব্যকূজন রচনায় মগ্ন রয়েছে। কেউ কেউ জোট বেঁধে বসে গরমাগরম তর্কবিতর্ক করছে। আবার কেউ কেউ জোড় বেঁধে কূজন করছে।

এমনি একটি জোড়বাঁধা কপোত-দম্পতি প্রকৃতির আনন্দসুধা পানে মত্ত— তারা দেবপট্টণমের দামোদর পিল্লাইয়ের পুত্র আর পুত্রবধূ— অমরনাথ আর চিত্রা।

চিত্রা বলছে— 'কলকাতার লেক সৌন্দর্যে তিরুচেন্দুর সাগরতটের চেয়েও বড়।'

'তোমার বাংলাদেশের মোহ আজো কাটে নি। আমার এখন আর লেক তেমন রোচে না! বরং দুঃখ লাগে। মনে হয়, বাংলা মা তাঁর ছেলেদের দুঃখে কেঁদে কেঁদে লেকের জল ভরিয়ে তুলছেন।'

'তুমিই একদিন উল্টো কথা বলতে। বলতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে বাংলা মায়ের চোখে যে আনন্দাশ্রু উপচে পড়েছিল তাই জমেজমেই লেক হয়েছে। কী হল তোমার?'

'কী হল জান? সেসব অনুভূতি এই দুর্ভিক্ষের তাপে শুকিয়ে গেছে। তিনমাস ধরে বড়রাস্তার দুধারে উপোস করে মরা মানুষের লাশ দেখে দেখে ওসব কাব্যটাব্য উঠে গেছে। ওসব পাগলামিতে আর মন ভরে না। গান্ধী ঠিকই বলেছেন, যে দেশের লোক না খেয়ে মরে, তাদের কাব্যকলা আর গানটান চুলোয় দিয়ে চরখা চালানো উচিত।'

'আচ্ছা দেশপ্রেম আর ভগবৎপ্রেমের জন্যে তো বাংলাদেশ বিখ্যাত। তবে ভগবান এদের এত কঠোর পরীক্ষা নিচ্ছেন কেন।' চিত্রা কাতরকণ্ঠে বলে।

অমরনাথ জবাবে বললে— 'দেখ বাঙালীদের অশেষ গুণ। কিন্তু একটা মহা দোষ আছে এদের। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা এদের মজ্জায় মজ্জায়। এঁদের ধারণা বাংলাদেশের লোকই একমাত্র দিব্য জগতের মানুষ। বাকি সবাই নিচু স্তরের। আমার মনে হয় ভগবান তাদের এই অহংকারের শাস্তি দিচ্ছেন।'

শুনে চিত্রা আন্তরিক ব্যথিত হল। বললে— 'এরকম নিষ্ঠুরের মত কথা বোলো না। যে দেশে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দর জন্ম, ভগবান তাদের কখনো এত কঠোর দণ্ড দিতে পারেন? তিনি করুণানিধান! সুরেন্দ্রনাথ-দেশবন্ধু-সুভাষ বোসের মত মহান নেতার জন্মভূমি যদি তাদের অঞ্চলের জন্যে একটু অতিরিক্ত গর্ব করেই তাতে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

'তাহলে তুমিই বল আর কী কারণ থাকতে পারে তাদের এত কষ্টের!'

'আমার মতে মানুষের স্বার্থপরতাই এর একমাত্র কারণ। অর্থ-লালসায় পিশাচ হয়ে পড়ে মানুষ সমস্ত অন্নশস্য কিনে গোপনে মজুত করে আর চোরাবাজারী করতে থাকলে আকাল হবে না তো কী?'

'তা এইসব হিংস্র পশুদের জন্মের জন্যেও তো ভগবানই দায়ী! বেদপুরাণে সব শাস্ত্রে বলে যে সর্বজীবেই ঈশ্বরের অবস্থান। তাই মানুষের সুকৃতি দুষ্কৃতির ভার তাঁর মাথায় তো পড়বেই।'

'তুমি আজকাল কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশে মিশে নাস্তিক হয়ে পড়েছ। না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'—চিত্রা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে।

'তা যাই বল। কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশে অন্ততঃ একটা লাভ আমার প্রত্যক্ষ হল। একজন মুখরা নারীর মুখটা বন্ধ করতে পেরেছি তো।'—অমর ঠাট্টা করে।

চিত্রা কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবতে থাকে। তারপর বলে—'সুভাষবাবু দেশে থাকলে এতদিনে দেশে একটা বিপ্লব এনে দিতেন। সুভাষবাবু মালয়ে যে-ফৌজ গড়ে তুলছেন তাতে ভারতীয়রা দলে দলে ভর্তি হোক বা না হোক, তবে যারা ভর্তি হচ্ছে তারা মনেপ্রাণে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়েই যোগ দিচ্ছে। আহা! নেতার মত নেতা বলতে সুভাষবাবুকেই বোঝায়।'

'নাঃ। সুভাষবাবুর মোহ তোমার ঘোচেনি দেখছি। সুভাষবাবু যুদ্ধে জিতলে কী হবে, জান? ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের জায়গায় বাঙালীদের শাসন চলবে।'—অমরনাথ মোক্ষম রায় দেয়। শুনে চিত্রা বলে—

'হয় তো হোক গে। বিদিশী ইংরেজদের গোলামি করার চাইতে নিজেদের দেশের লোক বাঙালীদের তাঁবে থাকা হাজার গুণে ভাল।'

'হ্যাঁ, হাজার গুণে না লাখো গুণে ভাল! ভাল বৈকি। আমি তোমাকে শুধু বাস্তবিক অবস্থাটা বোঝাতে চাইছিলুম। বঙ্কিমচন্দ্র যে আনন্দমঠ লিখেছেন, তাতে কাদের বড় করে দেখিয়েছেন, বল না? বঙ্গজননীর সন্তানদের কিনা? 'বন্দেমাতরম্' গানে সাত কোটি লোকের উল্লেখ কেন? পরে ভেবেচিন্তে ওটাকে তিরিশ কোটি করা হয়েছে। যত বল, বাঙালীদের ঐ দুর্গুণটা চরিত্রগত।'

'তা তো বলবেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাঙালী ছিলেন। তিনি

সারা পৃথিবীকেই এক বলে মনে করতেন, গোটা মানবজাতিকে এক অখণ্ড বলে ধরতেন। তোমার এরকম বাঙালীদের নিন্দে করা স্বভাবটা আমার একটুও পছন্দ নয়। আমরা এখানে এসেছি কাজ করে দুটো পয়সা রোজগার করতে। এখানের মাটিতে বাস করব। এখানকার অন্নজল খাব, আবার এদেরই নিন্দে করব। এটা মোটেই শোভন নয়। যে-ডালে বসছি, সেই ডালই কাটছি। বাঃ! ঢের হয়েছে। এখন ওঠো। হাওড়া যেতে হবে বলছিলে না?'—বলতে বলতে চিত্রা উঠে পড়ে।

অমরনাথও উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে—'এখানে আর বেশিদিন থাকার সাধ নেই আমার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তামিলনাদেই ফিরে যেতে চাই।'

অন্তহীন বাদানুবাদে মত্ত প্রেমসুখী দম্পতি নিজেদের গাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বালীগঞ্জের সুন্দর বাংলো বাড়িতে ওরা বাস করে। প্রথম প্রথম ওরা নিয়মিত হাওয়া খেতে লেকে বেড়াতে আসত। মন্বন্তরের শরণার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকায় এখন আর ওরা বেড়াতে যাবার সময় পায় না। আজকাল ওরা একটা সেবাসংঘে যোগ দিয়েছে— দুঃস্থদের সেবায় সময় কাটায়। প্রতিষ্ঠানটা গড়েছিল ব্রহ্মদেশের শরণার্থী মহিলা আর শিশুদের সাহায্যার্থে। সে কাজ শেষ হতে না হতে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল। অনশনক্লিষ্ট অর্ধমৃত—নারী আর শিশুদের বাঁচাবার দায়িত্ব নিল প্রতিষ্ঠানটি।

কিছুদিন হল দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ত্রাণকার্য হ্রাস পেয়েছে। তাই তিনমাস পরে চিত্রা আর অমরনাথ হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। লেক থেকে ফিরে হাওড়ার দিকে যাবার প্রোগ্রাম ওদের। হাওড়া স্টেশনের কাছেই বড়বড় ব্যবসাদার কোম্পানীর আড়ত।

গাড়ি চালাতে চালাতে অমরনাথ বলে— 'দুর্ভিক্ষে বলে এত লাখ মরেছে, ততলাখ মরেছে, তা এত মরেও ভিড় তো দেখছি একটু কমেনি।'

—তা থাকে থাক্ ভিড়। দেখো কাউকে গাড়ি চাপা দিয়ে জন-

সংখ্যা কম করে দেশসেবা করতে যেও না যেন।—চিত্রা মন্তব্য করে।

অমরনাথ জবাব দেয়—'এই রাস্তায় যে চাপা পড়বে, সে হয় চালের মজুতদার, নয় কালোবাজারী। তাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারলে দেশসেবার পরম পুণ্য হবে আমার।'

সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়। এ.আর.পি.-র ঠুলিপরানো বিজলী বাতির আলোয় রাস্তা ঝলমল করতে পায় না, ছলছল করে।

চিত্রা বলে—'জাপানের যুদ্ধের ঠেলায় কলকাতার শোভা মুছে গেল। আগে এসব অঞ্চলে আলোর মালায় রাতকে দিন মনে হত।'

চিত্রার মুখে কথা তখনো শেষ হয়নি হঠাৎ দশদিক উচ্চারিত করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনের তীব্র কান্নার রব উঠল। অমরনাথ আর চিত্রা বুঝতে পারল জাপানী বিমান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়েছে। এ. আর. পি. তার কর্তব্য করছে— কিছু বিলম্বে। নাগরিকদের সতর্ক করার জন্যে সাইরেন বাজানো দরকার বোমা পড়ার আগে। বাজছে বোমা পড়ার পরে। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। ওরা দুজনে থরথর করে কাঁপতে থাকে। হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট শোনা যায়। চিত্রা স্বামীর কাঁধটা জোড়ে আঁকড়ে ধরে। অমরনাথ গাড়িটা রাস্তার একধারে দাঁড় করায়। রাস্তার ভিড় অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ইতস্ততঃ ছুটে পালায়। পলক ফেলতে না ফেলতে রাস্তা জনশূন্য হয়ে পড়ে। শুধু খালি গাড়িগুলো এখানে ওখানে পড়ে থাকে।

মেশিনগানের আওয়াজ থেমে যাবার মিনিট পাঁচেক পর ওদের মনে হল—'যাক। আজ এই পর্যন্তই। এবার তাহলে আমরা যেতে পারি।'—এই কথা ভেবেছে। এমন সময় সমস্ত দিগন্ত উদ্ভাসিত করে আলোয় আলো হয়ে উঠল। যেন কয়েক কোটি সূর্য মাটিতে নেমে এসেছে। পরমুহূর্তেই আলোটা ক্ষীণ হয়ে গেল— তারপর ব্রহ্মাণ্ড-বিদারী এক অবিশ্বাস্য বিদারণের শব্দ। কানের পরদা বোধহয় ফেটে গেল! শব্দের আঘাতে গাড়িটা বিষম ঝাঁকুনি খেল। কাচের শার্সি ফেটে চুরমার হয়ে গেল। চতুর্দিকে লোকের

চীৎকার আর্তনাদ— বিপুল কোলাহলে কানে তালা লেগে গেল।

এতেও ভয়ংকরের সমাপ্তি হল না। খানিক পরেই ধোঁয়ার মেঘ কুণ্ডলী বেঁধে আকাশে উঠতে লাগল। ধোঁয়ার পুঞ্জের মাঝে মাঝে লাল লাল আগুনের হলকায় আকাশ ছেয়ে গেল।

চিত্রা অমরনাথকে আঁকড়ে ধরেছিল। এবার কম্পিত কণ্ঠে বলে '—কী ভয়ানক আগুন। একী!'

অমরনাথ বলল—'মনে হচ্ছে টি. এন. টি.-র বারুদের কারখানায় আগুন লেগে গেছে। তাই অত সাংঘাতিক আওয়াজ।'

'গাড়ি ফেরাও। বাড়ি চলো। হাওড়ার কাজ আজ থাক্।' —চিত্রা বলে।

'দাঁড়াও, হাতের কাঁপুনিটা কমুক। হাওড়া যেতে তো পারবই না।'—অমর বলে।

ওদিকে আকাশের গায়ে লেলিহান আগুন এদিকে দূরাগত ভীষণ শব্দ। আগুনের দিকে চোখ পড়তে মানুষ আর্ত চীৎকার করে পাগলের মত ছোটাছুটি করতে থাকে।

ঢন্ ঢন্ ঢন্ ঘন্টি বাজিয়ে দমকল পক্ষীরাজের মতন উড়ে আসতে থাকে। অমরনাথের কার রাস্তা পেরিয়ে গলির ভেতর ঢুকল। খানিক দূরেই বহু লোকের ভিড় দেখা গেল। কাছে গিয়ে বুঝল এক মারোয়াড়ীর দোকানে লুটপাট হচ্ছে। ভিড়ের ভেতর জনকয়েক লালপাগড়ির মুখও দেখা গেল। তারা নির্লিপ্ত দর্শক সেজে রয়েছে। অমরনাথের গাড়ি ভিড়ের কাছবরাবর এল। অবস্থা বুঝে একটু দ্বিধা করে অমরনাথ। এগোবে না পিছোবে? কিন্তু ঘোরাবার রাস্তাও নেই। তাছাড়া গুণ্ডাদের ভয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে পালাবেই বা কেন? রাস্তার ধার দিয়ে ভিতরে পাশ কাটিয়ে গাড়ি চালায়। জনকয়েক গাড়ির ছাতে তাল ঠুকল। কেউ কেউ কাঁচের ওপর বাড়ি মারল। দু'চারজন পেছন থেকে গাড়িটা টেনে ধরে রাখারও চেষ্টা করল। কয়েকজন 'হো হো' করে হল্লা করল। সকলের গলা ছাপিয়ে একটা গলা পাওয়া গেল—'মার শালাকে!'

সভয়ে গাড়ি চালায় অমরনাথ। তার বহুজন্মের পুণ্যফলে বাড়াবাড়ি কিছু ঘটল না। ভিড়টা কোনমতে পেরিয়ে গিয়ে গাড়ি বেগ নিল।

'দেখে নাও চিত্রা। ওদিকে বোমা পড়ছে, আগুন লাগছে, লোকে মরছে। এদিকে গুণ্ডাদের মোচ্ছব লেগেছে। আমরা স্বাধীনতা চাইছি। স্বরাজ পেলেই কি সুরাজ আসবে?'—অমরনাথ চিত্রাকে উপলক্ষ্য করে আত্মজিজ্ঞাসা করে।

খানিকদূরেই একটা বাসকে রাস্তার ধারে উলটে পড়ে জ্বলতে দেখা গেল।

'বাসে আগুন লাগল কী করে?'—চিত্রা জিজ্ঞাসা করল।

'আপনি আপনিই কি আর লেগেছে। গুণ্ডা-বদমায়েসের দল লাগিয়েছে।'

'কেন?'

'কেন আবার? গুণ্ডামির আবার কারণ থাকে নাকি? লুঠপাট ডাকাতি আগুন-লাগানো এসব কাজে যাদের আনন্দ হয় তারাই এসব করে থাকে। এটা তাদের নিষ্কাম কর্ম বোধহয়।'

গাড়ি আরো খানিক এগোলে দেখা গেল রাস্তার পাশে একজন পড়ে রয়েছে। কাছে যেতে বোঝা গেল একজন মহিলা। আর একটা ছেলে তার শরীরের ওপর ঝুঁকে কী যেন করছে।

'দাঁড়াও··· দাঁড়াও··· বাঁধো···' চিত্রা চেঁচিয়ে উঠল।

গাড়ি থেমে গেল। গাড়ি বাঁধতে দেখেই ছেলেটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। চিত্রা বললে—'ছেলেটা কি করছিল বলো তো?'

'মহিলার হাতের চুড়িগুলো খুলে নিচ্ছিল। আমাদের দেখে পালাল।'

দুজনে নেবে মহিলার কাছে গেল। চিত্রা বলল—'আরে। এ তো মাদ্রাজী মেয়ে মনে হচ্ছে। বেশি বয়েসও নয়। আহা, বেচারী রে!'

অমরনাথ বলে—'মাদ্রাজী বলে তো আর যমরাজ রেহাই দেয় না। যার যেমন নিয়তি। ওর এভাবে মরণ লেখা ছিল। চলো যাই।'

চিত্রা মেয়েটার নাকের নিচে হাত দিয়ে দেখল— অতি মৃত্থ শ্বাস বইছে।

'মরেনি। বেঁচে আছে। শীগ্যির তোলো।'—চিত্রা ককিয়ে উঠে মেয়েটার মাথার তলায় হাত রাখে। তারপর স্বামীকে ধমকে ওঠে—'কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে দেখছ কি? পা হুটো ধরতে পারছ না?'

'তা ধমকালে পায়ে তো ধরতেই হবে। কপালে অনেক খোয়ার লেখা না থাকলে আর রাস্তার লোকের পায়ে ধরতে হয়। নাও ধরেছি—' গজগজ করতে করতে অমরনাথ মেয়েটার পা হুটো ধরে। তারপর হুজনে মিলে তাকে গাড়িতে তুলে শুইয়ে দেয়।

'চালাও এবার। জলদি করো। একটা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।' চিত্রা হুকুম দেয়।

স্টিয়ারিংএ হাত রেখে অমরনাথ বললে—'কোন্ দিকে যাব?'

'বাড়ি চলো। আবার কোথায় যাবে?'

'তাহলে বাপু আমি গাড়ি ছাড়ছি না। এই আধমরা লাশ নিয়ে বাড়িতে আমি কিছুতেই তুলব না। তারপর বাড়ি গিয়ে মরলে বিপত্তির অন্ত থাকবে না।' অমরনাথ বেঁকে বসে।

'তোমার মতন নির্দয় পাষাণপ্রাণ মানুষ আমার জীবনে হুটো দেখিনি। তাহলে কোন অনাথ আশ্রমে নিয়ে চলো। যেখানেই যাও, তাড়াতাড়ি চলো।' চিত্রা নাগাড়ে গালাগাল বকাবকি করতে থাকে।

অমরনাথ নির্বিকার মনে একসিলরেটরে পায়ের চাপ দেয়। গাড়ি ছুটে চলে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় ধীরে ধীরে মেয়েটির জ্ঞান ফিরতে থাকে। অনাথ আশ্রমে পৌঁছে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার জ্ঞান পুরোপুরি ফিরে এল। বিপদ কেটে গেছে জানার পর অমর-চিত্রা বাড়ি গেল।

পঁয়ত্রিশ

খুব ভোর থেকে বেশ ভারী কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে কলকাতার রাস্তাঘাট বেশ তকতক করছে। রাস্তার দুপাশে গাছের পাতা থেকে মুক্তোর মত বড়বড় জলের ফোঁটা টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে। পাখিরা ডানা ঝাপটে গা থেকে জল ঝরাচ্ছে। ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিত্রা এইসব দেখছে, মুগ্ধ হচ্ছে। ঘরে অমরনাথ অফিস যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে, জামাকাপড় পরছে।

'বিষ্টির পর লেক দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো-না গো, লেকে বেড়াতে যাব।' চিত্রা স্বামীকে বলে।

'তোমার আর লেকে বেড়িয়ে আশ মেটে না। তার চেয়ে চলো-না বরং আজ একটা ভাল সিনেমা দেখতে যাওয়া যাক। 'আনা কারেনিনা' ছবিটা এসেছে শুনেছি।··· লেকে-টেকে আর যাব না বাপু। তারপর ফেরার পথে রাস্তায় পড়ে থাকা মেয়ে কুড়িয়ে বেড়াতে হবে···'

তোমরা বেটাছেলেরা বিচিত্র জীব। নাটক-নভেলে অনাথিনীর ওপর অসহায়ার ওপর খুব দরদ উথলে ওঠে। কিন্তু বাস্তব জীবনে একটা অসহায় মেয়েকে দেখলে তার ওপর দরদ দূরে থাক্, মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। বেশ! বেচারী বিপন্ন মেয়েটাকে একটু রাস্তা থেকে তুলে এনেছ, তার জন্যে কত খোঁটা দিচ্ছ। বুঝি না বাবা।'
—চিত্রা অনুযোগ করে।

'বোঝ না তো কিছু। সাবধান হতে হয়। মেয়েটার নামধাম কিছুই জানা নেই। কোন ভাল মেয়েমানুষ হলে সে নাম ঠিকানা

চেপে যাবে কেন? এখনো নিজের কোন পরিচয় দেয়নি।' অমরনাথ বলে।

তার অনেক কারণ থাকতে পারে। ওতে কিছু আসে যায় না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে মেয়েটার ভিতরে কোন গভীর দুঃখ আছে। অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ মিসেস চৌধুরী তা খুব প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন রোজ পঞ্চাশটা ছেলেমেয়েকে চান করানো জামাকাপড় পরানো সব করছে। মুখে একটু বেজার ভাব নেই। ও যদি থেকে যায় তো আমাদের অনেক কাজ হালকা হয়।'

'তা এত ভালমানুষ মেয়ে নিজের পরিচয় জানাতে চায় না কেন?' —অমরনাথের সেই এক কথা।

'কি করে জানব? হয়তো বেচারীর স্বামীটা তোমারই মতন গোঁয়ারগোবিন্দ, মেরেধরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে কথা সংকোচে বলতে পারছে না। স্বামীর গুণের কথা আর কোন্ মুখে বলে?'

'বুঝেছি। তোমার বড় আস্পর্ধা হয়েছে। স্বামীকে যা-তা বল সবসময়। একদিন তোমাকেও মেরেধরে তাড়িয়ে দিতে হবে দেখছি।' অমরনাথ বলে।

'ঐ আনন্দেই থাকো। আমাকে ওরকম ভালমানুষ মেয়ে পাওনি যে সব জুলুম মুখ বুজে সইব। আমি দুনিয়াসুদ্ধু লোককে ঢাকঢোল পিটিয়ে বলব, ঐ যে অমুক মহাপ্রভু উনিই আমার স্বামীপুঙ্গব, ওঁর এই কীর্তি!'—চিত্রা শাসায়।

চাকর এসে ডাক রেখে যায়। অমরনাথ উলটে পালটে দেখে বলে—'শ্রীমতী চিত্রাদেবীর চিঠি—শ্রীমতী ললিতাদেবীর লেখা বলে মনে হচ্ছে।' চিত্রার চিঠি তার হাতে দিয়ে অমর নিজের চিঠিপত্র পড়ায় মন দেয়। চিত্রা তার চিঠি নিয়ে ওপরের ঘরে চলে যায়। আবার পাঁচমিনিট না যেতেই চিঠি হাতে ছুটে আসে—'শুনেছ?'

'সাংঘাতিক কাণ্ড। ললিতার ভাই সূর্য পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালাতে পারেনি। পুলিস

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে সূর্য রিভলবার চালায়। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। সংঘর্ষে তার গুরুতর চোট লেগেছে, অবস্থা আশঙ্কাজনক। ললিতা ব্যাকুল হয়ে চিঠি লিখছে। ওদিকে আর-এক বিপদ, ওদের পিসতুত বোন সীতাও এর মধ্যে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আজো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সূর্য যেদিন ধরা পড়েছে, সেই একই দিনে সীতাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সীতার স্বামী ললিতার বাবাকে জানিয়েছে। যদি সীতা দেবপট্টম কি রাজমপেট্টায়ে যায়, তাহলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।'—এক নিঃশ্বেসে সব খবর বলে চিত্রা দম নেয়।

অমরনাথ সব শুনে চুপ করে বসে বসে কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে পেপার র্যাক থেকে পুরনো খবরের কাগজের ডাঁই হাতড়ে হাতড়ে একটা বাসি কাগজ বের করে নিয়ে আসে। বলে—

'চিত্রা। এই খবরটা শোনো।··· "দিন চারেক আগে সূর্যনারায়ণ আয়ার নামক এক বিপ্লবীর গ্রেপ্তার হইবার খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। ধৃত হইবার সময় পুলিসের সহিত তাহার খণ্ডযুদ্ধ বাধে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গিয়াছে, গতকাল রাত্রে বন্দী হাসপাতাল হইতে পলায়ন করিয়াছে। কড়া পুলিস প্রহরা সত্ত্বেও আহত বন্দী কিরূপে উধাও হইতে পারে—ইহা এক রহস্য। গোয়েন্দা বিভাগ জোর তদন্ত করিতেছেন।···

"খবরে আরও প্রকাশ, সূর্যনারায়ণের গ্রেপ্তারের দিন হইতে ফেরার বিপ্লবপন্থী যুবতীটি আজো ধরা পড়ে নাই। শোনা যাইতেছে, অতিশয় চতুর এই যুবতী নাকি ছদ্ম পরিচয়ে দিল্লী শহরেই আত্মগোপন করিয়া আছে এবং উচ্চপদস্থ বহু রাজকর্মচারীর সহিত উহার নাকি মেলামেশা রহিয়াছে।—গোয়েন্দা বিভাগ ইহাকেও অনুসন্ধান করিতেছে।"

খবর পড়া শেষ করে অমরনাথ বলে—'তোমার কি মনে হয়?'

'কী আশ্চর্য দেখ। খবরটা প্রথমে পড়ে আমার সূর্যর কথা মনেই হয়নি। আমি ভেবেছি অন্য কেউ। বাহাদুর ছেলে। এতদিন

পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়ানো কি সহজ কথা ? চারিদিকে সান্ত্রী পাহারা, তার মধ্যে ঘায়েল অবস্থায় হাসপাতাল থেকে পালানো— মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। বুঝলে ? কী হল, তোমার যে মুখে কথাটি নেই। সূর্যর কত বড় সাহস বল ! অবাক হবার মতন নয় ?'

'তোমার সূর্যর বড়াই রাখো দিকি ! আমি অন্য কথা ভাবছি। আমি ভাবছি সীতার কি হল ? সে কোথায় নিরুদ্দেশ হল, কেনই বা হল'?'

—ওই। আজ আর আপিসে যেও না। ছুটি নাও। চলো তুজনেই অনাথ আশ্রমে ঘুরে আসি। কই, ওঠো, দেরী কোরো না। —চিত্রার আদেশ হল।

'অনাথ আশ্রমে যাবার জন্যে আপিস ছুটি নেব ?'—অমরনাথ অবাক।

'আহা, তুমি কিছুই বোঝনি দেখছি। আরে সেদিন যাকে আমরা রাস্তা থেকে তুলে নিলুম না, আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়তো সেই মেয়েটাই—'

'সেই মেয়েটাই সীতা। এই তোমার বিশ্বাস ! বলিহারি বুদ্ধি ! কোথায় দিল্লী আর কোথায় কলকাতা ! এখানে সে আসতে যাবে কেন ? তার স্বামী তো অনুমান করছে দেবপট্টণম কিংবা রাজমপেট্টাই গিয়ে থাকতে পারে। সেটা বরং সম্ভব। কিন্তু এখানে—।'

অমরনাথকে বাধা দিয়ে সীতা বলে—

'হ্যাঁ বলিহারী বুদ্ধি আমার নয় তোমার ! সীতা বিপ্লবী দলের মেয়ে। সে দেবপট্টণমে কি রাজমপেট্টায়ে যাবে পুলিসের হাতে ধরা পড়তে ? সেদিক দিয়ে ভেবে দেখ ফেরারী আসামীর গা ঢাকা দিয়ে থাকার পক্ষে কলকাতার মত সুবিধের জায়গা আর দ্বিতীয় নেই। —আচ্ছা, সীতাকে তো তুমি আগেও দেখেছ ? তার মুখ দেখলে চিনতে পারবে না ?'

'সেই কবে দেখেছি, বিয়ের সময়। সে আজ দশ বছর হয়ে গেল। এখন কি আর মনে আছে নাকি ?'

'আজ একবার ভাল করে দেখো তো মেয়েটা সীতাই নাকি ?'

'আমি গিয়ে কি করব ? সীতা হলেই বা আমার কী এল গেল ! তুমিই যাও। দেখ। আমি অফিসের পথে তোমায় নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি'—অমরনাথ বলল।

সেদিন অমরনাথ কর্মস্থল থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে এল। বাড়ীর ফটকে গাড়ী দাঁড়াতেই চিত্রা এসে দাঁড়াল। তার মুখ উজ্জ্বল।

অমরনাথ— কী ব্যাপার বেশ খুশি খুশি লাগছে যেন ?

চিত্রা— আন্দাজ কর তো।

'হাসিখুশির কারণ আর কি হবে ? সেই মেয়েটার ব্যাপারে কোন খোঁজখবর পেয়েছ নিশ্চয়ই !'

'হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম, তাই। তুমি তো উড়িয়ে দিচ্ছিলে।' দুজনে ঘরের ভেতর এল। ভেতরের ঘরে সোফায় বসে একটি মেয়ে চিঠি পড়ছে। তাকে দেখে অমরনাথ চমকে ওঠে। মেয়েটাও তাকে দেখে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে এবং ক্ষিপ্র পায়ে ওপরের ঘরে চলে যায়। সে চলে যাবার পর অমরনাথ চিত্রাকে জিজ্ঞেস করল— 'এই কি সীতা নাকি ? শুধু খোঁজখবর নিয়েই হয়নি, একেবারে হাতে ধরে বাড়িতে নিয়ে এসেছ ?'

চিত্রা বললে—'হ্যাঁ, আমি কোন কাজ হাতে নিয়ে পুরো না করে ছাড়ি না।'

'হ্যাঁ সেই ভয়েই আমি সবসময় প্রার্থনা করি তুমি যেন কোন কাজে হাত না দাও। অনর্থক বাইরের ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়াই তোমার কাজ।'

'আচ্ছা, সেটা আমি বুঝব। দয়া করে শ্রীমুখটা বন্ধ রাখো।'

'যথা আজ্ঞা দেবী। অভাজনকে মার্জনা করুন। শুধু একটা কথা যদি অনুগ্রহ করে বলেন যে ওই স্বর্গের অপ্সরীটিকে কী অভিপ্রায়ে বাড়িতে নিয়ে এলেন, তাহলে শুনে কৃতার্থ হই।'

‘অভিপ্রায় আবার কি ? আমাদের দেশের একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে। তোমার পরমপ্রিয় বন্ধু সূর্যেরই তো পিসতুত বোন। সমস্ত কথা জানবার পরও তাকে অনাথ আশ্রমে ফেলে রেখে আসা যায় ?’

‘তাতে দোষটা কী ? আর ওই যে সীতা— তার প্রমাণই বা কী ?’

‘সীতাই, আর কেউ নয়। আমার অনুমানে ভুল হয় না। তা ছাড়া ও নিজেই স্বীকার করেছে। প্রথমে কিছুই বলতে চায়নি। আশ্রমের বাচ্চাদের নাওয়ানো-খাওয়ানোয় ব্যস্ত ছিল। আমি তখন মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে নানান কথা নিয়ে গল্প জমিয়ে দিলুম। আর কথায় কথায় সূর্যর কথা তুলে বেশ গলা চড়িয়ে কথা বলতে লাগলুম। এই চালাকিতে কাজ হল। খানিক পরেই দেখি ও আমার কাছে এসে বসল। আর জিজ্ঞেস করল—‘সূর্যর কথা কী বলছিলেন ?’ আমি সব কথা বলতে খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে শুনে গেল। কথা শেষ করেই আমি চেপে ধরলুম— সূর্যর কথায় আপনার এত আগ্রহ কেন ? প্রশ্নের জবাব নেই, একদম চুপ। কী জবাব দেবে ? তখন আমিই বললুম— ‘আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন ? তুমি তো সীতা। কথা শুনে ওর চোখে জল এসে গেল। আমি সব বুঝতে পারলুম। ওকে বাড়িতে আসার কথা বলতে প্রথমে কিছুতেই রাজি হয়নি। বলে— ‘এখানে ছেলেপুলেদের সেবায় সময়টা ভাল কাটে।’ কাজটা ওর খুবই ভাল লাগে। শুনে আমি বললুম— আমি তো হপ্তায় দুবার করে আসিই এখানে, পালা করে কাজ করি, তুমিও আমার সঙ্গে আসবে। প্রায় জোর করে ওকে নিয়ে এসেছি।—কী, কেমন বুদ্ধি ?’

চিত্রার বিস্তারিত কাহিনীতে অমরনাথের হাই ওঠে। বলে, বাপরে। তোমার বুদ্ধির তারিফ করব আমি ? সে ক্ষমতা আছে আমার ! দেখ ভারত সরকার তোমায় সি. আই. ডি. বিভাগে কাজ করার জন্যে ডাক না দেয়। তোমার মতন নিপুণ গোয়েন্দার অভাবেই তো ইউ. জি -দের ধরতে পারছে না।’

'ইউ. জি. আবার কী ?'

'ইউ. জি. জান না ? ইউ. জি. মানে আণ্ডার গ্রাউণ্ড। অর্থাৎ যারা লুকিয়ে থাকে, পালিয়ে বেড়ায়। পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে যারা সশস্ত্র বিপ্লবের কাজ করে, তাদেরই নতুন নাম এটা। আসবার সময়ই দেখে এলুম মোড়ের মাথায় পুলিস আর গোয়েন্দা দপ্তরের কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। ইউ. জি.-র খোঁজেই রয়েছে শুনলুম।'

বাইরে কয়েকজনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বুট পরা পায়ের শব্দ। ওরা দুজনেই বেড়িয়ে এল দেখতে। সামনেই পুলিস আর সি. আই. ডি.-র একটা পুরো ফৌজ দেখে চিত্রার মাথা ঘুরে গেল। দলের প্রধান ব্যক্তি অমরনাথের দিকে এগিয়ে এসে বলল— 'আমরা এক অতিরিক্ত ধূর্ত ইউ. জি. মহিলার খোঁজে এসেছি। একটাই মেয়ে— সীতা আর তারিণী দুটো ছদ্মনাম নিয়ে দিল্লী পুলিসকে নাজেহাল করে মারছে। এই তো দেখুন-না। আমরা অনাথ আশ্রমে যাচ্ছি কোনমতে বোধহয় খবর পেয়ে গেছে। তাই আপনার স্ত্রীকে কথাবার্তায় ভুলিয়ে আধঘণ্টা আগেই তাঁর সঙ্গে সরে এসেছে। আমরা সব খবর পেয়ে গেছি। আপনার বাড়ি ফেরার অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

শুনে অমরনাথ বলে—'ইন্সপেক্টর। কোথাও ভুল হয়নি তো ? এই মহিলার সঙ্গে বৈপ্লবিক কাজকর্মের কোন সম্বন্ধ নেই।'

ইন্সপেক্টর বলে—'আপনি কী করে জানলেন অমরনাথবাবু ? আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ না নিয়ে কি আমরা এগোই। ফোটো দেখবেন ?'

আর কিছু বলা যায় না। চিত্রা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সীতাকে খবর দেয়। সীতা প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপার বোঝার পর ওর মাথা থেকে একটা গুরুভার নেবে যায়। এই তো ভগবান আছেন। ওর একটা আশ্রয় জুটে গেল। জেলখানায় আরামে থাকা যাবে। আজকাল শিক্ষিতা-প্রতিষ্ঠিতা উঁচু ঘরের মহিলারা কত জেলে যাচ্ছেন। তাদের সঙ্গ পাবে। কষ্ট কিসের ! সীতা

বেঁচে গেল। শুধু একটাই দুঃখ— বাসন্তীকে দেখতে পাবে না। সেও ভালই হল। মেয়েকে দেখেই বা কী করত? বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে কী বলবে? তার চেয়ে ঠাকুমার কাছে আছে থাক্। আদর-যত্ন ভালবাসা কিছুরই অভাব নেই সেখানে। ব্যস— জীবনে আর কী চাই তার? মেয়েটা সুখে স্বচ্ছন্দে বড় হয়ে উঠছে এই তো তার সবচেয়ে আনন্দের খবর।

দ্বিধাশূন্য প্রসন্ন মুখে নেমে এসে সীতা পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করল।

ইন্সপেক্টরকে অমরনাথ বলে দিল— 'সীতা সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। একটু খেয়াল রাখবেন।'

নিবিড় আশ্লেষে সীতাকে জড়িয়ে ধরে সজলচোখে চিত্রা বললে— 'সীতা, ভেবো না, আমরা 'হেবিয়াস কর্পাসের' দরখাস্ত দেব। তোমাকে ছাড়িয়ে আনব।'

'ভগবানের দোহাই, চিত্রা— এসব কিছু করতে যেও না ভাই। তিনিই দয়া করে আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। আমার জন্যে ভেব না। চলি!'— সীতা পুলিসের গাড়িতে উঠে বসল।

ছত্রিশ

রাজমপেট্টাইয়ের অগ্রহারম অর্থাৎ ব্রাহ্মণপল্লীতে ইদানীং বেশ পরিবর্তন চোখে পড়ে। আগের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক বাড়িই পোড়ো হয়ে গেছে। কিট্টাবায়ারের বাড়ির দোরে আগেকার মতন সেই সামিয়ানা টাঙানো নেই। সেই চাকচিক্যেরও অভাব। তবে সীমাচ্চু আয়ারের বাড়িটা আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছে। সীমাচ্চু সুযোগমাফিক দেবপট্টণমে গিয়ে কাপড়ের দোকান খুলে সময় ফিরিয়ে ফেলেছে। লক্ষ্মীর কৃপায় উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

কিট্টাবায়ারের সময়টা নানান বিপত্তির মধ্যে দিয়েই কেটেছে। গত ক'বছর ধরে ক্ষেতমজুর আর জোতদারদের মধ্যে জমিজায়গা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ পেকে উঠেছিল। গতবছর আদালতের রায় জোতদারদের পক্ষেই গেছে। মোকদ্দমায় জমিদারপক্ষের হয়ে তদবির করার ভার পড়েছিল কিট্টবায়ারের ওপর। তিনিই জমিদারদের মুখপাত্র হয়েছিলেন। ফলে চাষী-মজুরদের আক্রোশের শিকারও তাঁকেই বেশি করে হতে হয়।

দিন দশেক আগে কিট্টাবায়ার দেবপট্টণমে গিয়েছিলেন। জেল থেকে জামাই সদ্য খালাস পেয়ে বেরিয়েছে। তাকেই দেখতে যাওয়া। ফেরার পথে সন্ধের গাড়িতে আসছিলেন। রাত দশটা নাগাদ রাজমপেট্টাই গাঁয়ের মাইল চারেক দূরে মাঠের মধ্যে সাত-আটজন লোক মুখ ঢেকে তাঁর গোরুর গাড়ির ওপর হামলা করে। গাড়োয়ানকে আর কিট্টাবকে মারপিট করে। মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘায়েল অবস্থায় কিট্টাবায়ার বাড়ি ফিরেই প্রবল জ্বরে পড়ে যান। খবর পেয়েই দেবপট্টণম থেকে পট্টভিরামণ ললিতা আর

ছেলেপুলেদের নিয়ে রাজমপেট্টাই চলে এল। দিন তুই থেকে পট্টভি ফিরে গেল। ললিতার মা বাবা মেয়েকে আর নাতিনাতনীদের ধরে রাখলেন।

সেদিন সরস্বতী বসে মেয়ের চুল বেঁধে দিতে দিতে তুঃখের কথা বলছিলেন। বিনুনি বাঁধাটা সবে শেষ হয়েছে এমন সময় দরজায় ডাকপেয়াদার সাড়া পাওয়া গেল। এক হেঁচকায় চুল ছাড়িয়ে ললিতা অমনি উঠে দাঁড়ালো।

ওর মা হেসে ফেললেন। বললেন—'বয়সই বেড়েছে। স্বভাব একটুও বদলায়নি। ডাকের আওয়াজ পেঁয়ে সেই ছেলেবেলার মতন এখনও ছুটে যাবি, হ্যাঁরে অ মেয়ে?' ললিতা তখন সদর দরজায়। মার কথা তার কানেও ঢোকে না। আগেও যেমন ঢুকত না।

চিঠিটা ললিতারই। খামের ওপর তার বরের হাতের লেখা। ললিতা খাম খোলে। খামের ভিতর তুখানা চিঠি। একটা ওর স্বামীর। আর অন্যটা—? আরে এ যে সীতার লেখা দেখছি! দেখি দেখি কি লিখেছে? আচ্ছা আগে স্বামীরটাই পড়ে ফেলা যাক। তারপর—

কল্যাণীয়াসু,

ললিতা, ভাবি তোমায় চিঠিতে 'প্রিয়তমা, প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে' বলে সম্বোধন করব। কিন্তু কেবলই ভুল হয়ে যায়। সেই সনাতন পন্থায় পাঠ লিখে ফেলি।

আমি নির্বিঘ্নে পৌঁচেছি। পথে কেউ ছিনতাই বা রাহাজানি করবার চেষ্টা করেনি। কেউ হামলা করলেও কিছু লাভবান হত না। মানিপার্সে টিকিটের দামের ওপর কুল্লে আনা দেড়েক পয়সা বেশি ছিল। ঠকত! আশাকরি তোমার বাবার স্বাস্থ্য এখন ভালর দিকে। তাঁর ওপর যে বিপত্তি গেল তার জন্য মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করি। সেইসঙ্গে এটাও মনে না করে পারি না যে, সূর্যর কথামত চললে হয়তো বা এ হাঙ্গামা এড়ানো যেত। ধনহানি এবং মানহানি থেকে বাঁচতে পারতেন। মনোকষ্টও এমন অসহনীয়

হ'ত না। যা করেন সবই ভগবান। আমরা তো তাঁর হাতের পুতুল।

তারপর, কবে নাগাদ ফিরবে? আমার মতে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেই ভাল হয়। তার কারণ— সঙ্গের চিঠিটা পড়লেই বুঝবে।

তোমার সহেলী সীতা শাসানি দিয়েছেন যে এখানে আসছেন। তিনি আসার সময়ে তুমি না থাকলে আমি কী করে কী করব? কাজেই আমার চিঠি পেয়ে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বুঝিয়ে চলে এসো। সীমাচ্চ আয়ার তোমাদের পৌঁছে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন।

তোমারই পট্টভি।

সীতা আসছে। সাড়া চিঠি জুড়ে একটাই সংবাদ। ললিতা ভরপুর মনে সীতার চিঠিতে মন দেয়। ললিতার বাবা ডেকে জিজ্ঞেস করেন—'কার চিঠি রে? কে লিখেছে?'

'তোমার জামাইয়ের চিঠির মধ্যেই সীতার চিঠিও এসেছে। সীতা কলকাতা থেকে লিখেছে। চিত্রার বাড়িতে বসে। শীগ্যির মাদ্রাজে আসছে। দেবপট্টণমেও আসবে।'

'তাই নাকি? সীতা চিঠি লিখেছে? অনেকদিন ওদের কোন খোঁজখবর পাইনি। কেমন আছে ওরা? কতদিন দেখিনে। বড় দেখতে ইচ্ছা করে। দেখা হলে ওকে অনেক কথাও বলবার ছিল। যদি দেবপট্টণমে আসে তো একবার এখানেও বেড়িয়ে যেতে বলিস।' —কিট্টাব বলেন।

'নিশ্চয়ই বলব। বাবা, আমায় তো এবার দেবপট্টণমে যেতে হয়। তোমার জামাই লিখেছে সীতা আসবে লিখেছে, তুমি তাড়াতাড়ি করে চলে এসো। কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমার মতে তোমার যাওয়াই উচিত, ললিতা। জামাই আজ দুবছর পর জেল থেকে বেরোল। তাকে একলা ফেলে কতদিন তুমি এখানে থাকবে? তা ছাড়া সীতাও আসছে লিখেছে।

কাজেই তোমার এখন যাওয়াই উচিত বলে বিবেচনা করি। আমারও আর এ গাঁয়ে থাকতে মন চায় না। মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় দেবপট্টণমে গিয়েই থাকি। আর কোথাও গেলে হয়তো একটু শান্তি পাব।'

বাপ আর মেয়ের কথার মধ্যে বাড়ির দরজায় একটা গোরুর গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কে এল ?— ললিতা উঠে দেখতে গেল। গাড়ি থেকে আরোহীরা তখন নামছে। তাদের দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল ললিতা। আনন্দে অধীর হয়ে উঠল।

সাঁইত্রিশ

গাড়ি থেকে নামল সীতা, সূর্য আর শুণ্ডু। সূর্য বা শুণ্ডুকে নিয়ে ললিতার তত মাথাব্যথা নেই। ওদের সঙ্গে দু-চারটে মামুলী কথা বলেই সীতার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

'এই মাত্তর বাবার সঙ্গে তোর কথাই হচ্ছিল। এই তো তোর চিঠি পেলুম। তোর চিঠি আমার উনি খামে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে জরুরী তলব করেছেন তোর আসার আগেই আমার ফেরা দরকার। সেই কথা হচ্ছে এমন সময়ে তুই এসে পড়লি।'—ললিতার আনন্দ আর থই পায় না।

ভেতরবাড়িতে এসে দুই বোন দুই সখি সেই আগের দিনের মতন গলা জড়াজড়ি করে বসল। ললিতার দুই ছেলে পরম আশ্চর্যে সীতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সীতা বলে—'এই না তোর ছেলেরা? পটু আর বালু?'

'হ্যাঁ এরাই, তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ললিতা বলে—'এই দেখ সেই সীতা মাসী, বলেছিলুম না, এই দেখ কত সুন্দর!'

ললিতা সীতাকে বলে—'তুই ঠিক তেমনি সুন্দর রয়েছিস। কে বলবে জেল থেকে বেরিয়েছিস! তোর স্বামীটা যে কী না? তোকে ছেড়ে থাকে কি করে? হ্যাঁরে আবার বিলেতে গেল কেন রে? বিলেতের প্রেমে পড়েছে নাকি?— হ্যাঁরে বাসন্তীকে সঙ্গে আনিসনি কেন?'

সীতার মুখটা আগেই শুকিয়ে ছিল। মেয়ের কথা উঠতে মুখটা আরো শুকিয়ে গেল।

বললে—'বাসন্তী স্কুলে যাচ্ছে তো। আবার কামাই হবে, তাই ভেবেই আনিনি।—মামাবাবু কই রে ললিতা?'

'বাবা এক্ষুনি তোর কথা বলছিলেন। বলছিলেন তোকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তুই এসেছিস, এখনো শোনেনি বোধহয়। ভীষণ খুশি হবে। ওঃ বাবার ওপর দিয়ে যা ঝড় গেল! শুনিস নি কিছু?'

'কাল দেবপট্টণমে শুনলুম। তোর বরই বলছিল সূর্যর কাছে। শোনার পরই আমি চলে এলুম। তোর বর তো একদিন থেকে আসতে বলেছিলেন।'

'আমার বর বড় লাজুক, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তোর সঙ্গে কথা বলেছে তো? তোর কথা আলাদা। তোকে খুব সম্মান করে। তুই দেশের কাজে জেলে গিয়েছিস, শোনা ইস্তক কথায় কথায় তোর কথা জিজ্ঞেস করে। যাক্ তুই তাহলে এলি! শোন সীতা, তোর বর বিলেত থেকে ফেরার পর তোরা দেবপট্টণমে আমার বাড়িতে এসে থাকবি। থাকবি তো?'

'আচ্ছা, সে হবে'খন। এখন তো নয়। এক্ষুনি সে কথা কেন? চল, আগে মামার সঙ্গে দেখা করি!'—সীতা বলল।

কিট্টাবায়ারের খাটের কাছে বসে সূর্য আর শুণ্ডু তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল। ললিতা আর সীতা ঘরে ঢুকতে ওরা উঠে গেল। সীতা মামাকে প্রণাম করে কাছে গিয়ে বসল। কিট্টাব উঠে বসে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন—'সুখী হও মা।'

মামার দুর্বল দেহ, সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ, তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠে আশীর্বাদ—সব মিলিয়ে হঠাৎ সীতার পুরনো স্মৃতি উথলে উঠে বুকের ভেতর মুচড়ে, চোখ জলে ভরে গেল। চোখ মুছে মামাকে বললে—'সারা জীবন একটা পোকামাকড়েরও ক্ষতি করনি! তোমার গায়ে হাত তুলতে তাদের হাত অবশ হল না? তারা কি মানুষ!'

'এ আমার বিধিলিপি মা। অন্যকে দোষ দিয়ে কি লাভ!—শোন্ একটা ঘটনা বলি। যখন ওরা লাঠিপেটা করছে— একটা মার এসে পড়ল মাথার ওপর। এক মুহূর্তে মনে হল এই শেষ! আর বাঁচব

না। হঠাৎ মনে হল তোর মা এসে দাঁড়াল। রাজম্মা যেন ডাকছে —'দাদা এসো। সঙ্গে সঙ্গে তোর কথা মনে পরল। 'ছিছি, সীতার সঙ্গে দেখা হল না। এখন যদি রাজু তার কথা জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছে'—কী বলব ?'—

'এতেই বোঝা যায় মামা, যে আমার ওপর তোমার টান আছে। আর মা তো ছিল তোমার আদরের বোন। তুমি আর বেশী কথা বোলো না মামা। ডাক্তার বারণ করেছেন শুনলাম।'

কিট্টাব সস্নেহ হাসলেন—'হ্যাঁ এক নিঃশ্বেসে এত কথা বলা আমার বারণ। তোকে দেখার জন্যে, দুটো কথা বলার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। তা এখন তো এসেই গেছিস। রয়ে বসে কথা বলা যাবে। এই তো গাড়ি থেকে নামলি। যা, মুখেহাতে জল টল দে।'

সেদিন বেশ রাত্রি করে সীতা আর ললিতা বাড়ি ফিরল। কিট্টাব আয়ার সীতাকে বললেন—'তোর সঙ্গে দুটো কথা বলব বলে কতক্ষণ থেকে বসে রয়েছি। এত রাত পর্যন্ত দীঘির পাড়ে বসেছিলি তোরা ! আজকাল কি আর সেই দিন আছে ?'

সীতা অপ্রস্তুত হল। বললে— 'মামা, ভাবলুম রাত্তির বেলা তুমি বিশ্রাম করবে। আমি তো কদিন আছি। কথা হবে।'

মামা বললেন— 'তুমি তো কদিন থাকবে মা। কিন্তু আমি আর ক'দিন থাকতে পারব। তা কি জানি ?'

সীতা কেঁদে ফেলে। বলে—'মামা, মা নেই, বাপ আছে কিনা জানি না, এখন তুমিও অভাগীকে ছেড়ে যাবার কথা বলছ ? তুমিও রাগ করছ—'

'সীতা। চুপ কর। শান্ত হ। আমার কথা শোন। রাগ তোর ওপর করব কেন মা, রাগ আমার নিজের ওপর। বিছানায় পড়ে পড়ে নানা কথা মনে আসে। ভাবি এতদিন যা করেছি ভুল করেছি। গাঁয়ের লোকের কুপরামর্শ শুনে চাষীমজুরদের সঙ্গে বিরোধ করেছি। যারা বাপঠাকুর্দার আমল থেকে আমার পরিবারের জন্যে বুকের রক্ত জল করেছে, আজ তারা আমায় ঘেন্না করে, গায়ে

হাত তোলে। একেবারে প্রাণে মেরে ফেলেনি, তাও পূর্বপুরুষদের পুণ্যফল। দয়া করে শেষ করে দেয়নি, দিলেই বা কে তাদের ঠেকাত। তাদের ভাল হোক।'

'কী বললে? ভাল হবে? কক্ষণো না। যারা তোমার গায়ে হাত তোলে তাদের ভাল হতেই পারে না। আমি হলে তাদের কখনো ক্ষমা করতাম না।'

'পাগলী! তুই-আমি তাদের ক্ষমা করবার কে রে? আর তাদের দোষী করারই বা আমাদের কী অধিকার? তীরের দোষ নেই। যে চালায় তারই দোষ। আসলে ভগবানই মারক রূপে এসে আমায় শিক্ষা দিয়ে গেলেন সীতা! আর আমার এ গাঁয়ে থাকার ইচ্ছে নেই। ভালই হল তুই এলি, সূর্য এল। সূর্যর হাতে সংসার তুলে দিয়ে, এবার আমি বেড়িয়ে পড়তে চাই। কাশী গিয়ে গঙ্গাস্নান করব। প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গম দর্শন করব। তারপর ওখান থেকে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বদরীনাথ ইত্যাদি তীর্থ হয়ে একেবারে কৈলাস পর্যন্ত যাবার বাসনা। কিছুদিন আগে 'কৈলাস-যাত্রা'র একটা বই পড়লাম। সেই থেকে কৈলাস আমায় টানছে।'

'মামা, তুমি যদি তীর্থ করতে যাও তো আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমায় সব জায়গায় নিয়ে ঘুরব।' সীতা সোৎসাহে বলে।

'আচ্ছা যদি তীর্থে যাবার সৌভাগ্য হয়, তবে তোর সঙ্গে যেতে পারলে তো আনন্দের কথা। তোকে এত কথা বলাও তো সেই-জন্যেই। কিন্তু তার আগে তোর নিজের জীবন-তীর্থের পথটা একটু স্থির করে নে।' কিট্টাবায়ার বলেন।

সীতা মৌনমুখে মাথা নত করে বসে থাকে।

মামা বলেন—'আমার কথার তাৎপর্য তুমি বুঝতেই পেরেছ। তাই চুপ করে আছ। তোমাদের স্বামীস্ত্রীতে বনে না— এ কথা কানে যাবার পর থেকে একটা অব্যক্ত ব্যথায় আমি কষ্ট পাচ্ছি। এই গ্রামে বসেই তোমার বিয়ে হয়েছে। ললিতার সম্বন্ধ করতে এসে পাত্র তোমায় দেখে পছন্দ করে বসল— তোমার মামী শুনে রেগে

অস্থির। পাড়াপড়শিরও বেজায় অমত। এক আমিই বড় আহ্লাদ করে তোমাদের তুই বোনের একসঙ্গে এক প্যাণ্ডেলে বিয়ে দিয়েছিলুম। দেবদেবীর ওপর আমার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না যে তোমার ওপর তাঁরা প্রসন্ন হয়েছেন। তার কি এই পরিণাম! জীবনের শেষ দিন অবধি তোমার মা জ্বলে পুড়ে মরেছে। তোমারও কি শেষে এই দশা হবে? কেন? মনের মতন ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। কেন তার সঙ্গে তোমার জীবন সুখের হচ্ছে না? বলো আমায়…'

'যদি অদৃষ্টে তাই লেখা থাকে, তাহলে আমি আর কী করতে পারি মামাবাবু! আপনিও এ-বিয়ে দিয়ে সুখী হয়েছিলেন, আমিও কম সুখী হইনি। কিন্তু তাঁর যে এত গুণ, তা তখন কে জানত?'

'তুমি শুধু তার গুণের কথাই বলছ। কখনো নিজের কথা ভেবে দেখেছ? পরের দোষ বের করা সহজ, খুঁজতে হয় না। কিন্তু নিজের দোষঘাট চিনতে পারা খুব কঠিন। সীতা, তুমি বুদ্ধিমতী, লেখাপড়া জান। সূর্যর মুখে তোমার দেশসেবার প্রশংসা শুনে খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু আমার একটা কথা বেশ মন দিয়ে শোনো। এদেশের মহান বৈশিষ্ট্য কী, জান? পৃথিবীর বহু দেশই কিছুকালের জন্যে উন্নতির চরমে উঠেছে, তারপর একেবারে অবনতির, অধঃপতনের অতলে তলিয়ে গেছে। ভারত কিন্তু হাজার হাজার বছর পরেও অম্লান রয়েছে। তার মহান বৈশিষ্ট্য এখনো অক্ষুণ্ণ। গান্ধীর মতন পুণ্যাত্মা মানুষ এদেশে আজো জন্মায়। তার কারণ কি জান? এদেশের নারীরত্নদের জন্যেই। স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশের নারীরা পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী। গার্হস্থ্য ধর্মে তারা লক্ষ্মীস্বরূপা। পুরুষ যতই ক্রূর হোক, মূর্খ হোক, নির্গুণ হোক, তারা তাকে ত্যাগ করত না। সেই মহীয়সীদের পুণ্যফলেই এদেশের গৌরব অম্লান রয়েছে। গান্ধীজী কস্তুরবা সম্পর্কে কী লিখেছেন, পড়েছ তো? কতবার অকারণে তিনি স্ত্রীর ওপর রাগ করেছেন, কটুকথা বলেছেন। সে-সব মুহূর্তে কস্তুরবা এমন সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন যে পরে

স্বামীকে অনুতপ্ত হতে হয়েছে। অত দূরে যাব কেন? তোমার মামীর কথাই ধর-না। সর্বদা আমার সঙ্গে যেমন ঝগড়া করে, তেমনি এ কথাও সত্যি আমার মতের বিরুদ্ধে এক পা কোনদিন চলেনি। কতদিন আমি অকারণে রাগ করেছি। কিন্তু তার জন্যে ছেড়ে চলে যাবার কথা কখনো ভাবেনি।'

'মামাবাবু। কস্তূরবা দেবী। আর মামী ভাগ্যবতী তাই এরকম দেবতুল্য স্বামী পেয়েছিল। কিন্তু আমি সবদিক দিয়েই ভাগ্যহীনা। যখন আমি কলকাতার আলিপুর জেলে, সেইসময় উনি একবছর কলকাতায় ছিলেন। একটা দিন আমায় দেখতে আসেননি। তবুও আমি ঠিক করেছিলাম যে জেল থেকে বেরিয়ে তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। কিন্তু তার সুযোগ পাইনি। আমি জেল থেকে ছাড়া পাবার একমাস আগেই তিনি বিলেতে চলে গেলেন। কলকাতায় তাঁর জীবনযাত্রার বৃত্তান্ত শোনার পর আমার আর গার্হস্থ্যজীবনে রুচি নেই। তাঁর সঙ্গে জীবন কাটানো আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।'

'কথায় আছে, চোখের দেখা কানের শোনাও মিথ্যে হতে পারে। শুধু পরের কথায়, যা তুমি নিজের চোখে দেখনি, তার ভালমন্দ বিচার করে রায় দিতে পার না। তা ছাড়া তোমার উপর রাঘবনের রাগ একেবারে অকারণ তা তো বলা যায় না। তোমার বাড়িতে তুমি সূর্যকে আশ্রয় দিয়েছ, তোমাদের বুদ্ধির ভুলে তার সরকারী চাকরী তাও যেমন-তেমন চাকরী নয়— ঘোচাতে হল। এতে পুরুষমানুষের রাগ হবার কথা।'—কিট্টাবায়ার বলেন।

'সে চাকরী যাওয়ায় তো ওঁর কোনো ক্ষতি হয়নি, মামা। তার চেয়ে বেশি টাকা মাইনেয় উনি ব্যাঙ্কের চাকরী পেয়েছেন'—সীতা বলে।

'সে যাই হোক। রাঘবন বিলেত থেকে ফিরলে আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করব। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। তোমাদের ভেতরকার সব মতান্তর দূর করে আবার দুজনকে সুখের

সংসারে বসিয়ে যেতে পারলে তবেই আমি শান্তি পাব। তোমার মার আত্মাও তাতে শান্তি পাবে। আমি যেমন করে পারি তাকে রাস্তায় নিয়ে আসব। তুই দেখ না। তোর সব দুঃখু শীগ্যির ঘুচে যাবে। যাবেই। আমি বলছি।' কিট্টাবায়ার বলেন।

'মামা তুমি কি ভেবেছ আমার দুঃখ কোনদিন ঘুচবে? আমার তো মনে হয় না। কারণ-অকারণেই মনে ভয় হয়। বুক ধড়ফড় করে। ভেতরে মুচড়ে ওঠে। রাত্তিরে শান্তিতে ঘুমোতে পারি না। ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি, মামা'— বলতে বলতে সীতা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। চোখ বেয়ে অবিরল জল গড়ায়।

এতক্ষণ কিট্টাব আয়ার কখনো শুয়ে শুয়ে কখনো আধশোয়া হয়ে কথা বলছিলেন। এবার উঠে বসে ভাগ্নীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন— 'ওসব মনের ভুল মা। আগে যেসব কষ্ট গেছে সেই কথা মনে পড়েই মন বিচলিত হয়ে ওঠে। এবার যখনই ওরকম ভয় হবে, তখনই 'রাম-রাম' বলবে। ভয় পালিয়ে যাবে। এবার তো আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমি দেখব তোমার যাতে কোন কষ্ট না হয়।'

ললিতা ঘরে ঢোকে। বাপের শেষ দিকের কথা শুনে বলে— 'বাবা, বেশ তো। তুমি না খানিক আগেই আমায় বললে— আমার সঙ্গে দেবপট্টণমে যাবে? আধঘণ্টার মধ্যেই ভুলে গেলে। এখন সীতার সঙ্গে যেতে চাইছ? নাঃ সত্যিই বোম্বাইয়ের এই মেয়েটা বশীকরণ জানে দেখছি।'

সেদিন রাত্তিরে কিট্টাবায়ারের গভীর ঘুম হল অনেকদিন পরে। জীবনের অনিত্যতা নিয়ে সিদ্ধ মহাপুরুষ তিরুমূলর এক অপূর্ব পদ-রচনা করেছিলেন :

অড্‌ডপন্নি বৈত্তার অডিশিলাই উণ্ডার
মডক্কাডিয়া বোডু মন্দণম পুকুন্দার্‌ !
ইডপ্পক্কয়ে তুরাই নান্দদে এণ্ডার্‌
কিডক্কপ্পডুত্তার কিডণ্ডালিন্দারে।

অর্থাৎ, এক গৃহস্থ রাত্রে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় পেট ভরে খেয়ে স্ত্রীসমভি-ব্যাহারে শয়নাগারে গেলেন। বললেন, বুকের বাঁদিকে ঈষৎ বেদনা অনুভব করছি। মনে হয় ঘুমোলে সেরে যাবে। এই ভেবে শয়ন করলেন। তিনি আর কোনদিন বুকের ব্যথা নিয়ে আক্ষেপ করেন নি। কারণ তিনি ঘুম ভেঙে আর ওঠেন নি।

…সীতার সঙ্গে মন উজাড় করে কথা বলার পর কিট্টাবায়ারও সেদিন নিশ্চিন্ত প্রশান্তি নিয়ে অনেকদিন পরে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর জাগতে ভুলে গেলেন।

পরদিন সকালে সূর্যদের বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। সবাইকার সব কান্না ছাপিয়ে কিট্টাবায়ারের ভাগ্নীর কান্নাই সবচেয়ে করুণ শোনাচ্ছিল।

আটত্রিশ

রণক্ষেত্রে বিপক্ষের শরবর্ষণ উপেক্ষা করে যেমন বীর সৈনিক তার লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে এগিয়ে যায়, ঠিক তেমনি করেই রেলগাড়িটা এগিয়ে চলছিল সামনে ঝড়তুফানের ঝাপটাকে তুচ্ছ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় বসে আছে সীতা, ললিতা তার স্বামী আর সন্তানেরা। তাদের দৃষ্টি বাইরে, প্রকৃতির প্রমত্ত লীলার আকর্ষণে লুপ্ত। আকাশ ঘনকালো মেঘে আচ্ছন্ন। জল পড়ছে বিরামবিহীন। মধ্যাহ্নকে গোধূলির মতন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। অদূরে একটা গ্রাম। চারধারে ক্ষেতে ঘেরা মাঠে একটা চিতা জ্বলছে। পাছে বৃষ্টিতে চিতা নিবে যায় তাই কয়েকজন তাড়াতাড়ি চিতার ওপর নারকেল পাতার চালা তুলে দিচ্ছে। ললিতার ছেলে বলছে— 'দেখ মা, আগুনের ওপর চালা বাঁধছে, কেন বাঁধছে মা?'

সকলে সেদিকে চোখ ফেরায়। চিতার আগুন দেখে সীতা ফুঁপিয়ে ওঠে— 'এমনি করে মামার চিতাও সেদিন…'। ললিতার চোখ সজল হয়ে ওঠে। বলে— 'বাবার চলে যাওয়ায় যা দুঃখু পেয়েছি, তার শতগুণ দুঃখ পাচ্ছি তোর শোক দেখে।'

'তাঁর জন্য দুঃখ করা অনর্থক। তিনি মোক্ষলাভ করেছেন।'— পট্টভি বলে।

সীতা বললে— 'তা ঠিক। সূর্যর মতন ছেলের যিনি জন্মদাতা, তিনি পুণ্যাত্মা। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গতি হবেই।'

'নিঃসন্দেহে। দশদিনের মধ্যে সূর্য চাষী-মজুরদের মন কেড়ে নিয়েছে।' পট্টভি সায় দেয়।

জল, কেবল জল। যেদিকে তাকাও, খালি জলই চোখে পড়ে।

'একি। এদিকে তো দেখছি প্রবল প্লাবন হয়ে গেছে। রাজম-পেট্টাইয়ে কী বিষ্টি হয়েছে। এ বর্ষার তুলনায় তো কিছুই নয়।'—পট্টভি কথার মধ্যে হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলায়।

সীতা বললে— 'ক জানে? আমাদের ট্রেনে চাপার পর হয়তো ওখানেও এইরকমই বর্ষা হয়েছে।'

'নাও। সবাই বলছিল বর্ষা হচ্ছে না, বর্ষা হচ্ছে না। এখন নাও বর্ষা!'—ললিতা বলল।

'কিছুদিন বৃষ্টি না হলে, সকলেই জলের অভাব বোধ করে। পুরাকালে মুনিঋষিরা যেমন সূর্য বন্দনা করতেন, তেমনি বরুণোপাসনাও করতেন। তামিল মহাকাব্য—'শিলপ্পধিকারসে' সূর্য-চন্দ্রের স্তাবকতার পরই বর্ষার স্তুতি করা হয়েছে।' পট্টভিরামণ এই সুযোগে কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করে নেয়।

'বর্ষার এত স্তুতি না করাই ভাল ছিল তাহলে। স্তুতির মোহে বর্ষা যদি এমন প্রলয়ঙ্করী হয়ে ওঠে তাহলে দীনদুঃখীরা কোথায় যাবে?—ঐ দেখ!'—ললিতা আঙুল তুলে দেখায়।

রেল লাইনের অদূরে একটা গ্রাম। বর্ষার জল স্রোতের মতন সেই গ্রামের পথে পথে হুহু করে বয়ে যাচ্ছে। ঝড়ের প্রকোপে বেশ কতকগুলো কুঁড়েঘর উলটে পড়েছে।

রাত আটটায় রেলগাড়ি দেবপট্টণম ইস্টিশানে পৌঁছল। লাইনের দুপাশে জল জমা হয়ে আছে। গাড়ির আলোর সারি সেই জলে ছবির মত ভাসছে। দেবপট্টণমের রাস্তার বাতিগুলোও ঠিক একই রকমভাবে জলে জলময় পারিপার্শ্বিকের ওপর প্রতিবিম্ব হয়ে ঝকমক করছে।

প্ল্যাটফরমে গাড়ি দাঁড়াল। পট্টভিরা কামরার দরজা খুলে নামল। ঠাণ্ডা হিম হাওয়া সর্বশরীরে ছুঁচ ফোটাতে লাগল।

স্টেশনের আর-এক প্রান্তে তখন প্রচণ্ড শোরগোল শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্ল্যাটফরম লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। জনস্রোত উপছে পড়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে রাস্তার বেশ খানিকটাও ভরিয়ে

ফেলল। শতশত স্ত্রীপুরুষ-শিশুবৃদ্ধের ভিড়। সবাই আপাদমস্তক স্নান করেছে। প্রত্যেকেরই গায়ের কাপড় ভিজে জবজব করছে।

সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করেই পট্টভিদের বেরোতে হল। পট্টভি কুলিকে জিজ্ঞেস করল— 'আজ এত ভিড় কিসের হে? এরা সব কোন্ গাড়ি ধরবে?'

'গাড়ি ধরবে না বাবু। আজ বিকেলে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল না? তাইতে এদের ঘরদোর ভেসে গেছে। জলের ভেতর দাঁড়াবার জায়গা নেই। তাই ইস্টিশানে ভিড় জমিয়েছে। নচ্ছারগুলো।'

অতিকষ্টে জনস্রোত পেরিয়ে, গাড়ি ভাড়া করে পট্টভিরা বাড়ি পৌঁছায়। ললিতা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খাবার বন্দোবস্ত করতে রান্নাঘরে ঢুকল। পট্টভি গিয়ে নিজের অফিসঘরে বসে খবরের কাগজে মন দিল। বাচ্চারা শুকনো জামাকাপড় পরে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

শুধু সীতা বারান্দার এককোণে মাটির মূর্তির মত বসে রইল। শোকাহত। ভিজে কাপড়টা বদলাবার কথাও মনে নেই তার।

ললিতা রান্নাবান্না সেরে পাতা করে সবাইকে ডাকাডাকি করতে করতে ভেতরের বারান্দায় এসে সীতাকে ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করে বলে— 'একী রে, সীতা? কাঠের পুতুলের মতন বসে আছিস। ভিজে কাপড়টাও ছাড়িসনি?'

এই সময় পট্টভি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

সীতা বলে— 'আমার ঐ গরীব লোকগুলোর কথা মনে পড়ছে। ছোটছোট বাচ্চাগুলো অবধি সবাই ভিজে কাপড়ে সারারাত কাটাবে তো? ওদের কথা ভাবলে আর নিজে শুকনো কাপড় পরবার ইচ্ছে থাকে না। এই যে দোতলা বাড়ির ছাতের নিচে আরামে বসে আছি— এও যেন শূল বিঁধছে।'

'কষ্ট তো হয়ই, একশোবার। কিন্তু আমাদের উপায় কী বলুন? দশ-বিশ জন নয়, হাজার হাজার লোক। কিছু করতে চাইলেও

আমাদের কোনও উপায় নেই। দেখি সকাল হোক, কিছু করা যায় কিনা—' পট্টভি বলে।

—ললিতা বলে—'চল খেতে খেতে কথা বলা যাক। ছেলেগুলোও খুব ভিজেছে। সর্দিজ্বরটর না হয়ে পড়ে আবার। চিন্তায় মরছি।'

সীতা বললে— 'স্টেশনে ঐ বাচ্চাগুলোর কথা একবার ভাব্। সারারাত ভিজে কাপড়ে এই ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে রাত কাটাবে। দেখবার কেউ নেই।'

পট্টভি বললে— 'আমিও সেই কথাই ভাবছি। সকাল হোক। বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখি কী করা যায়। চলুন, খেয়ে নেওয়া যাক।'

আশ্বাস পেয়ে সীতা খেতে বসে। খাওয়াদাওয়ার পরে তিনজন বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে। তারপর শুতে চলে যায়। ললিতা আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। সীতার মন থেকে গরীবদুঃখীদের চিন্তা কিছুতেই যেতে চাইল না। ফলে রাতভর তার ঘুমই এল না।

সীতার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সেইমত সকাল হতেই পট্টভি বেরিয়ে পড়ল। খোঁজখবর নিয়ে জানল কতজনের ঘরদোর পড়ে গেছে। দুর্গতদের ত্রাণের ব্যাপারে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করল। দুপুরে বাড়ি ফিরে সীতাকে সব বিবরণ শোনাল।

সীতা বলল— 'কলকাতায় দুঃস্থদের সেবা করার কাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমায় আপনাদের সঙ্গে নিন। মেয়েদের আর বাচ্চাদের সেবার কাজে আমিও আপনাদের সাহায্য করব।'

পট্টভি তার প্রস্তাবে আনন্দে সায় দিল। বললে— 'আমাদের শহরেও কয়েকজন মহিলা সেবাব্রতী রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গেই আপনাকে কাজে লাগিয়ে দেব।'

—গোড়ায় গোড়ায় গৃহহারাদের স্কুলবাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হল। তাদের রেঁধে খাওয়ানোর দায়িত্বও নিতে হল। রুগীদের ওষুধপথ্যি, সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করতে হল। বাচ্চাদের মধ্যে যাতে রোগ

না ছড়ায় তার প্রতিষেধকের আয়োজন করাও হল। বর্ষা বন্ধ হলে মাটি শুকোলে, তাদের নতুন করে ঘর তোলার জন্যে সাহায্যের ব্যবস্থাও হল।

ত্রাণ-সেবা-পুনর্বাসনের কাজে এই তিনটি মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। এই তিন মাসের মধ্যে পট্টভি আর সীতার দম ফেলবার অবকাশ ছিল না। শহরের বেশ কিছু লোক ওদের কাজে খুবই সাহায্য করেছেন। সীতার অক্লান্ত পরিশ্রম, মৃদুভাষীতা, মধুর আচরণ এইসব কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। সারা দেবপট্টণমে সীতার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। সবাই মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা করতে লাগল।

জেল থেকে বেরোবার পর থেকে পট্টভি যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। তার উৎসাহের ভাঁটা পড়ে আসছিল। দেশের স্বাধীনতা এল না। সারা দেশেই স্বাধীনতা-চেতনার জোয়ার স্তিমিত। আবার আদালতে গিয়ে পেশায় লাগতেও মন চাইছিল না। হাতে কোন কাজ নেই। এইসব কারণে তার উৎসাহ জল হয়ে গিয়েছিল।—বন্যার্তদের কাজ পেয়ে, প্রবল কাজের চাপে তার মরা গাঙে বান এল। পট্টভির যেন পুনর্জন্ম হল। সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে পট্টভি আর সীতা— সারাদিনের কাজের কথা পরম উৎসাহে বলাবলি করত। বাড়ির আবহাওয়া এরকম জমজমাট হয়ে ওঠায় ললিতার আনন্দের অবধি ছিল না। সে সীতাকে ডেকে বলত— 'তুই এ বাড়িতে খুশির জোয়ার এনে দিয়েছিস। এ বাড়িতে এমন গুলজার আগে কখনো হয়নি। এঁকেও এত হাসিখুশি কখনো দেখিনি। তোর কাজকর্ম ওর খুব ভাল লেগেছে। তা তো লাগবেই। তোকে ভাল লাগবে না, এমন কে আছে? সীতা তুই এখানেই থেকে যা না রে বরাবর!'

'ভগবানেরও বোধহয় ইচ্ছেটা তাই। আমার যাবার জায়গাই বা আর কই?'—সীতা জবাব দেয়।

ললিতা বলে— 'এবার বাসন্তীকে নিয়ে আয়। মেয়েটাকে

মাদ্রাজে ফেলে রাখা আমার পছন্দ নয়। দুটো ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ে থাকলে বাড়িটাও বেশ মানাবে।'

সীতা বললে— 'ভাবছি, এবার গরমের ছুটি পড়লেই এখানে নিয়ে আসব।'

বন্যাপীড়িতদের শেষ পর্যন্ত সুবিধেই হল। আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই দু প্রস্থ করে নতুন কাপড় পেল। বাস করার নতুন চালা হল। বস্তির মাঝখানে গণেশের মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। প্রতি শনিবার মন্দিরে ভজন কীর্তন চলল। এককথায় দুঃস্থদের ভাগ্য ফিরে গেল বলা যায়।

কিন্তু অবস্থা খারাপ হল সেবকদের। হাতের কাজ ফুরোতেই পট্টভিরামণ আবার মুষড়ে পড়ল। সীতা, তার স্বামী আর মাদ্রাজে থাকা তার মেয়ের চিন্তায় উন্মনা হয়ে রইল। গুলজার আর জম-জমাট হাওয়া বাড়ি থেকে বিদায় নিল। সকলেই যেন মনমরা হয়ে পড়ল। তাদের মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

উনচল্লিশ

সেদিন বিকেলে পট্টভির খোঁজে এল তার জনকয়েক বন্ধুবান্ধব। তারা বললে 'মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশেনে তোমায় দাঁড়াতে হবে।' তারা এ লোভও দেখাল যে জিতলে তার চেয়ারম্যান হবারও সম্ভাবনা আছে।

প্রথমে পট্টভির এসব যুক্তি মনঃপূত হয়নি। বন্ধুরা জোর দিয়ে বলল যে, 'তুমি জেলখাটা ত্যাগী লোক, কাজেই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস হবে না কারো।' 'পরে ভেবে বলব' বলে পট্টভি সেদিন তাদের বিদেয় করল।

সেদিন রাত্তিরে খেতে বসে পট্টভিরামণ কথাটা তুলল। ললিতার মত চাইল। ললিতা ঘোর আপত্তি জানাল। বললে—'ইলেকশন টিলেকশানে যাবার দরকার নেই।'

শুনে সীতা বললে—'এক কথায় নাকচ করে দিচ্ছিস কেন। যাঁরা বলছেন তাঁরা তো তোর স্বামীর বন্ধু।'

ললিতা বললে— 'তুই এখানকার লোকদের চিনিস না। ওঁর বাবা নির্বাচনে কাজ করেছিলেন। লাভের মধ্যে সামনের বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। আবার নতুন করে ঝঞ্ঝাট কেনা কেন?'

সীতা বললে— 'সে যুগ বদলে গেছে। ওঁর বাবা দেশের জন্যে কুটোও কাটেননি। উনি আড়াই বছর জেল খেটে এসেছেন। উনি দাঁড়ালে কে ওঁর সামনে দাঁড়াতে পারবে?'

পট্টভিরামণ বলে—'আপনি যেমন ভাবছেন, কাজে অতটা সহজ হবে না। শুনছি কালোবাজারের এক পয়সাঅলা মালদার ক্যাণ্ডিডেট দাঁড়াচ্ছেন এই ওয়ার্ডে। জোরাল রেষারেষি হবে।'

'তা হোক না। ভয়ের কি আছে? আপনি বলুন ইলেকশন লড়বেন। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট জোগাড় করব।' সীতা বলে।

পট্টভি বললে—'আপনি যদি আমাকে জেতাবার জন্যে এত উৎসাহ নিয়ে নামেন, তাহলে আমিও তৈরী আছি।'

কথাটা হাসিঠাট্টায় শেষ হলেও শেষপর্যন্ত ইলেকশনে দাঁড়ানোই স্থির হল। সামনের বাড়ির দামোদরম পিল্লের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই পট্টভি নির্বাচনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

পৌরসভা-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে পট্টভি যেদিন সিদ্ধান্ত নিল, সেদিন থেকেই তার বাড়ি গুলজার হয়ে উঠল। দলে দলে লোকের আসা যাওয়া, বৈঠক, রঙতামাশা, মজলিস— চলল। অনেকেই এ বাড়িতে পাকাপাকি বসবাসের বন্দোবস্ত করে ফেলল। এই কফি, এই জলখাবার, পানসুপুরি, তামাক···টাকাপয়সা জলের মতন খরচ হতে লাগল। দেখেশুনে ললিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

এদিকে সীতার আড়ম্বর আর অধিকার বেড়েই চলল। ফলে পাড়াপড়শিরা যারা এতদিন তার সুখ্যাতি করত, তারাও আড়ালে কুকথা শোনাতে লাগল।

সীতার আচরণে ললিতা মর্মাহত হয়ে পড়েছিল। একদিন এই নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীতে বচসা হয়ে গেল। রাগে আগুন হয়ে ললিতা বলে বসল— 'এই নির্বাচন আর সীতা দুইই তোমার জীবনের অভিশাপ। আমার সংসারে শনি হয়ে ঢুকেছে আর তোমায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।'—শুনেই পট্টভি রাগে অন্ধকার হয়ে গিয়ে ললিতাকে ঘার ধরে ঘরের বাইরে বার করে দিল।— এই চরম দৃশ্যের মুহূর্তে সূর্য ওদের বাড়িতে পদার্পণ করল।

সূর্যকে দেখে পট্টভি লজ্জায় মাথা হেঁট করে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে। সূর্যর পিছনে আচারের হাঁড়ি হাতে সরস্বতীকেও দেখা গেল। ললিতা মাকে দেখে ছুটে গেল।

সূর্যকে একান্তে পেয়ে পট্টভি বললে—'ভাই সূর্য। আমি এই

ইলেকশনের বিড়ম্বনায় পা দিয়ে নরক ভোগ করছি। এদিকে কাজের চাপে নিঃশ্বেস ফেলবার ফুরসত নেই। আর মোট দুহপ্তা বাকি। এর মধ্যে ললিতা জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। আর সীতার ওপর হিংসে। সীতার সেজেগুজে থাকা, পাঁচজনের সঙ্গে ওঠাবসা-মেলামেশা এসব তার দু'চক্ষের বিষ। তার ওপর তুমি মাকে নিয়ে এসেছ। এবার তো কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। আমার একটা কথা রাখো ভাই। তুমি সীতাকে এবাড়ি থেকে কোথাও নিয়ে যাও। আমি কোনমতে আমার কাজ সামলে নেব।'

'পট্টভি, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তোমার আর ললিতার ভেতর কোনদিন এরকম অবস্থা সৃষ্টি হবে। তোমার এই নির্বাচনের ফাঁদে পা দেবার কোনো দরকার ছিল না। সে কথা এখন আর অনর্থক তোলা। এতদূর এগিয়ে এখন আর পিছু হাঁটা যায় না। আমি শুনলুম সীতা এ ব্যাপারে তোমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে। এসময় তাকে বাইরে পাঠানো উচিত হবে না। এতদিন যখন ছিল, তখন আর দুহপ্তাহও থাকতে দাও। পরে দেখা যাবে।'—সূর্য বলে।

সীতাকে একান্তে ডেকে সূর্য বললে—'সীতা, আমি এখানে পা দিতে দিতে নাটকের যে দৃশ্য দেখতে পেলাম তা কি তোমারও চোখে পড়েছে?'

সীতা বললে—'সূর্য, আমি সব দেখেছি, সব শুনেছি। আমার কপাল আমি হাজার ভাল করার চেষ্টা করলেও পরিণামে ঠিক খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। আমি আজই এ বাড়ি থেকে চলে যাব বলে ঠিক করেছি।'

'কোথায় যাবার কথা ভাবছ?'

'যাবার জায়গার অভাব কি সূর্য? কুয়ো আছে, নদী আছে পুকুর আছে, সমুদ্র আছে—জায়গা অনেক আছে। তবে তার আগে একবার মেয়েটাকে দুচোখ ভরে দেখে নেব। তারপর রাস্তা একটা খুঁজে নেব।'—সীতা কাঁদতে থাকে।

'শোনো, পাগলামি কোরো না। ওসব কথা একদম মুখে আনবে

না। এখন তোমার প্রথম কর্তব্য হল ইলেকশনে পট্টভিকে জেতানো। এই সময় যদি তুমি চলে যাও তাহলে একেবারে ভরাডুবি হয়ে যাবে। পট্টভির মনে প্রতিপত্তির মোহ লেশমাত্র ছিল না। নেশাটা তুমিই ঢুকিয়েছ। কাজেই ভোটের দিন পর্যন্ত তোমার এখানে থাকা দরকার, কাজ চুকিয়ে যাওয়া দরকার।'—সূর্য রায় দেয়।

'তোমার কথা ঠিক বলে মেনে নিলেও এ বাড়িতে কী করে থাকব বলো ? ললিতা আমায় এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাওয়ায় পট্টভি বললে— 'সীতা এবাড়ি থেকে যাবে না, যেতে হয় তুমিই যাও।' নিজের কানে এ কথা শোনার পর এবাড়িতে আমি কী করে থাকি সূর্য ?'

'ও কিছু না। দুজনেই রাগের মাথায় প্রলাপ বকছে। ওদের ভেতরটা বেশ পরিষ্কার। সে তুমি বল তো, আমি ললিতার মুখ দিয়ে বলিয়ে দিচ্ছি— ভোট শেষ না হওয়া অবধি তোমায় এখানে থাকতে হবে।'

'তা হলেও আমায় এখনি একবার মাদ্রাজ যেতে হবে। বাসন্তীর চিঠি পেয়েছি কাল। লিখেছে চারদিনের ভেতর স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। তোমায় দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। তাড়াতাড়ি এসে আমায় নিয়ে যাও।'

'ঠিক আছে। তুমি ইলেকশনের কাজ সামলাও। আমি গিয়ে বাসন্তীকে নিয়ে আসব।'—সূর্য বলল।

এদিকে ওঘরে বসে সরস্বতী মেয়েকে বলছেন— 'তোর মতন আহাম্মক মেয়ে তো আমি দুটো দেখিনি। ভোটে জামাইকে জেতাবে বলে সীতা শুনছি দিনরাত খেটে মরছে। আর তুই তার নামে নিন্দেমন্দ করছিস ?'

ললিতা বললে—'বুঝতে পারিনি যে ভোটের নেশা তোমার মগজেও ভর করেছে। তুমি তো ঘোরপ্যাঁচ বোঝ না। এই একবারের ভোটযুদ্ধে কত যে শত্তুর বাড়বে— তা তুমি কি জানবে ? শ্বশুর সেবার এই ফাঁদে পড়ে কী নাকাল হলেন, জান না ?'

'আমি সব জানি— সে আলাদা কথা ছিল। তোর শ্বশুর অন্য লোকের জন্যে খেটেছিল, আর অনর্থক ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। আর এবার তো জামাই নিজেই উমেদার। জিতে গেলে তো শুনছি সেই চেয়ারম্যান হবে। তাই না ?'

'চেয়ারম্যান হলে কি হাত-পা গজাবে ? কপালে লেবেল এঁটে ঘুরে বেড়াবে ? মাইনে এক পয়সাও পাবে না, সেটা জান ?'

'জানি, শেখাতে আসিস নি। মাইনে না পেলে কী হয়েছে ? আগের আমলে এ-কাজ শুধু সম্মানের কাজ ছিল। এখন এসব কাজ কতরকম আমদানীর রাস্তা— তা জানিস ? এতদিন যে চেয়ারম্যান ছিল সে তো লাখলাখ টাকা কামিয়েছে। শুনতে পাই, তার ছেলের ভাতে লোকে লাখ টাকার ওপর 'মুখ দেখতে' দিয়েছিল। তোর ছেলের জন্মদিনে কী পেয়েছিস ? পুলিসের লাঠি !'—মা মেয়েকে বলেন। মেয়ের মুখে তালাচাবি পড়ে যায়। এই সময় সীতা ঘরে ঢুকতে সরস্বতী তাকে একগাল হেসে আপ্যায়ন করেন— 'আয় মা আয়। এই না হলে মেয়ে ! আমি সব খবর পেয়েছি। জামাইকে জেতাবার জন্যে তুই জীবনপাত করে খাটছিস— সব আমার কানে গেছে। মুখে বললেই আপনার লোক হয় না। কাজে করে দেখাতে হয়। বেঁচে থাক্ মা।'

সীতা হকচকিয়ে যায়। ও বেশ ভয়ে ভয়েই ঢুকছিল। না-জানি মামী কত যাচ্ছেতাই করবেন। কিন্তু মামীর মুখে উলটে প্রশংসার কথা শুনে তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। বললে— 'মামীমা, এবার তো আপনি এসে পড়েছেন, আপনিই সামলাতে পারবেন। এবার আমার ছুটি ! আমি এবার নিজের বাড়ি যাব।'

বাঃ এটা একটা কথা হল ? এখন কোথায় যাবি ? ভোট শেষ হোক তবে তো যাবি। সকলেই বলছে তোর জন্যেই জামাই লড়তে নেবেছে, তোর জন্যেই জিততে বসেছে। তুই নাকি সভায় খুব ভাল বলিস। তোর জন্যে জামাই চেয়ারম্যান হতে চলেছে। এখন তুই চলে গেলে তাকে সাহায্য করবে কে ?'

'আপনার জামাইয়ের কারুর সাহায্যের দরকার নেই। তিনি নিজেই যথেষ্ট শক্ত সমর্থ। নিজেই সামলে নিতে পারবেন— দেব-পট্টণমে যে শুনেছে উনি নির্বাচনে নেবেছেন, সে-ই খুশি হচ্ছে। সবাই ওঁকে ভোট দিতে চায়। তবে আপনার মেয়ের এসব পছন্দ নয়। সব সময় বিরক্ত, সব সময় গজগজ করছে। বরের সঙ্গে এমন ঝগড়া-কোঁদল বাধিয়ে দেয় যে তার মন খারাপ হয়ে যায়। এতে কাজে বাধা আসে।'

সরস্বতী বলেন—'ললিতার কথা ছেড়ে দে। ও যদি আর একটা কথা কয় আমায় বলবি। দুগালে দুই চড় কষিয়ে ওকে ঘরে পুরে রাখব। আজ চার বছর যাবৎ জামাই বেকার। আমি শুনে এস্তক কুলদেবতার কাছে মানত মেনেছি— হে বাবা দোহাই যেন কাজটা জামাইয়ের হয়। সীমাচ্চু মামা এসেছিল তোর নামে নিন্দে করতে। আমি তার কথায় কান তো দিইইনি, উলটে মুখের ওপর এমন কথা শুনিয়েছি যে পালাতে পথ পায় না। বললুম—'কারুর নিন্দে করা ছাড়া আপনার কি আর কোন কাজ নেই? থাকে তো তাই করুন গে।' হবে না কেন? এখানকার যে চেয়ারম্যান সে যে সীমাচ্চুকে কাপড়ের দোকানের লাইসেন্স দিয়েছে। তাই থেকেই তো সীমাচ্চু পয়সার মুখ দেখল। দোমলা দালান দিয়েছে। তাই তার আঁতে ঘা লেগেছে। সে তো এখন ওপক্ষে খাটছে কিনা। সম্বন্ধ-কুটুম্বিতে সব ঘুচে গেছে। এখন যে পয়সার কাল মা। পয়সাই সব। আত্মীয়-কুটুম্ব পয়সার কাছে কেউ কিছু নয়। এক তোকেই দেখলুম— আপনার লোকের জন্যে বুক ঢেলে করতে। আমার মেয়েটা গাধা রে মা। ওর কথা তুই ধরিসনি, মা আমার। তুই ওদের যে উপকার করলি, সে ওর বোঝার সাধ্যি নেই— থাকলে তোর পায়ের ধুলো চাটত। গায়ের চামড়া দিয়ে তোর পায়ের জুতো বানিয়ে দিত!'

মায়ের স্বার্থপরের মতন কথাবার্তা ললিতার খুবই তেতো লাগল।

কিন্তু সেইসঙ্গে তার সখীর ওপর মার মনের এই পরিবর্তনে মনটা যেন তার বেশ খুশিই হয়ে উঠল।

সীতার আনন্দের আর পার নেই। জীবনে এমন দিনও আসবে মামী তার প্রশংসায় উচ্ছল হয়ে উঠবে— এতটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তার সব ব্যথা, সব যন্ত্রণা এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল। আনন্দে বিভোর হয়ে উঠল সীতা।

চল্লিশ

নীল সাগরের বুক চিরে একটা জাহাজ ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে। যাত্রী-জাহাজ। জাহাজের নাম এস. এম. এলিজাবেথ। ঐ জাহাজে রাঘবনও যাত্রী। অতিকষ্টে জায়গা পেয়েছে। মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, একবছরও হয়নি। যাত্রী-জাহাজগুলোয় বেজায় ভিড়, সহজে জায়গা মেলে না।

যুদ্ধ থামবার কয়েকমাসের মধ্যেই রাঘবন বিলেতে গিয়েছিল। রাঘবন একটা কথা অল্পদিনেই বুঝে ফেলেছিল, যে, কোম্পানির চাকরী যত বড়ই হোক-না-কেন, যত মোটা মাইনেই পাওয়া যাক, সরকারী চাকরীর কাছে কিছুই নয়। তা ছাড়া, সরকারী নথিপত্রে তার নামে মিথ্যে কলঙ্ক দাগা থাকবেই বা কেন। যুদ্ধে যদি ব্রিটেনের হার হত, ভারত স্বাধীন হত, আলাদা কথা। তাতে মনে একটা সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটেনের জিত হল এবং ভারতে তার শাসনও কায়েম রইল। এরকম অবস্থায় সরকারী চাকরীকে অবহেলা করা চলে না।

কিন্তু রাঘবনের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হল না। তার বাঞ্ছা পূরণও হল না। তাই সে ফিরে এসে চাকরীতে যোগ দিচ্ছে।

ভারতগামী জাহাজে স্থানাভাব হওয়ায় তাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। এই অবকাশে সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে থাকে। এই ঘোরাফেরার সময় নিজের চোখে যা দেখল, নিজের কানে যা শুনল, তাতে তার মনে একটা পরিবর্তন এল। ‘ইংরেজরা কী আশ্চর্য জাত। কী সহজ বীরত্ব, কী ধীর স্থির। দেশের স্বাধীনতার জন্যে হাসিমুখে সব দুঃখ সহ্য করছে এরা। আর

আমাদের দেশের লোক এতদিন কী করেছে? বিদেশীদের অধীনে গোলামি করেছে। আজও সেই তাঁবেদারীর চাকরীর জন্যে ও নাকখত দিতেও রাজি। সেজন্যে সাতসুমুদ্দুর পেরিয়ে এসেছে। ছি ছি ছি! কী নির্লজ্জ ওর জীবন। ইংরিজি শিক্ষার ফলে এই বুদ্ধিভ্রংশ!—যাক। যা হবার হয়ে গেছে। বিগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওকে এমন কিছু করতে হবে, যে দেখে লোকের তাক লেগে যায়।'

জাহাজের ডেকে একটা গদীমোড়া আসনে বসে রাঘবন চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। মনের ওপর ভাবনার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ও নিজেকে চিন্তার ইচ্ছের হাতে সঁপে দিয়েছে। চিন্তা ওকে টেনে নিয়ে গেল পনেরো বছর অতীতের উপকূলে। করাচি থেকে বোম্বাই। সেই জাহাজে সমুদ্র-যাত্রা। সে তো সামান্য সাগরযাত্রা নয়, সে যেন ইন্দ্রলোকের নন্দন-বিহার। তখন যে তারিণী সঙ্গে ছিল। হায় রে। তার এত জেদ। সেই জেদ ধরে সেদিন যদি তারিণীকেই বিয়ে করত, তবে আজ তার জীবন সুখময় হতে পারত।

মন তো নয়, শাখামৃগ। এই তারিণী, এই সীতা। তারিণীকে ছেড়ে দেওয়া যদি ভুল হয়ে থাকে, সীতাকে বিয়ে করা আরো বড় ভুল। ললিতাকে দেখতে গিয়েছিল। সীতাই তো মাঝখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল। বড় বড় চোখ মেলে ধরে ওর বুদ্ধিভ্রংশ করতে এল। তবে হ্যাঁ, মতিভ্রম হবার মতন চোখ বটে। এই একটা কথা মানতে হবে। সীতার চোখের মতন চোখ কারুর পেলাম না। তারিণী যে কত সুন্দরী, কিন্তু সীতার চোখ তার চোখকেও হার মানায়। কিন্তু একটা মেয়ের রূপগুণের বিচারে চোখই একমাত্র মাপকাঠি নয় তো! না তা নয়। নয় যে তার জন্যে রাঘবনের জীবনই একটা বড় প্রমাণ। তার ঐ চোখ দেখে ভুলেছিল রাঘবন। সেই চোখের পেছনে মনটাকে চিনতে পারেনি। তরলমতি, ঝগড়াটে, কুচুটে, হিংসেয় বিদ্বেষে, রাগে জ্বলে মরছে···ছিঃ···

ছিছিঃ এ কীরকম বিচার তার! সব দোষ কি সীতার? না, তার নিজেরও অনেক দোষ আছে— রাঘবন ভেবে চলে। গোড়া থেকেই যদি তার সঙ্গে কড়া ব্যবহার করত আলাদা হত। তা তো করেনি। তা করলে সে ভয় করত, কথায় উঠত বসত। তার স্বভাবটা বিগড়ে দিতে সূর্য আহাম্মুকটাও কম দায়ী নয়। সীতা যেন স্বামীর চেয়ে বেশী করে সূর্যর কথাই মানত। বেশ হয়েছে। এখন বদমায়েসটার খপ্পরে পড়ে ফাঁদে পা দিয়েছে তো!

মেয়েদের চরিত্র অদ্ভুত! সূর্যর ভেতর যে মেয়েরা কী দেখে ভগবানই জানেন। সীতার তবু নাহয় মামাত ভাই, তার খানিকটা টান থাকতেই পারে। কিন্তু তারিণীর সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ তার? সে কেন সূর্যর জন্যে জান দিতে যায়। উঃ সূর্যকে পুলিসের ফাঁদ থেকে ছাড়াবার জন্যে তারিণীর কী পরাক্রম। এমন পরাক্রমী মেয়েকে রাঘবন পেয়েও হারাল! সূর্য আর তারিণী সেই যে ফেরার হয়েছে আর খোঁজ পাওয়া গেল না তাদের।

কত কী বিচিত্র তামাসাই ঘটে। কলকাতায় তারিণী ভেবে সীতাকে জেলে ধরে নিয়ে গেল। রাঘবন কলকাতায় যাওয়ার কদিনের মধ্যেই বৃত্তান্ত জানতে পেরেছিল। কিন্তু এব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করা তার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আসলে ভয় পেয়েছিল পাছে জড়িয়ে পড়ে। কোথায় কী গোপন ব্যাপার আছে সব রহস্য তো সে জানে না। সেইজন্যেই··· থাক্, পচুক জেলে, ঢিট হয়ে যাবে, কত ধানে কত চাল হয় বুঝবে। যখন সবাই ছাড়া পাবে তখনই বেরোবে— তখন দেখা যাবে। যাবে না রাঘবন তাকে খালাসের তদ্‌বির করতে।

সে যাই হোক, সীতাকে আর-একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। তার সঙ্গে ঘর করার আর-একবার শেষ চেষ্টা করবে রাঘবন। রাঘবন বড় উদার! বড়ই দয়ার শরীর তার! তবে এর পেছনে কিছু সংগত হেতুও ছিল। এক নম্বর— সীতা যদি আর না ফেরে, তবে ভামা বলে সেই ডাইনীটার হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায়

থাকবে না— তেলের কড়াই থেকে চুলোয় ঝাঁপ দিতে হবে। দ্বিতীয় কারণ— বাসন্তী। বিলেত যাবার আগে রাঘবন বাড়ি গিয়েছিল। মেয়েটা দুটো নিরীহ চোখ মেলে জিজ্ঞেস করেছিল—'বাবা, মাকে সঙ্গে আন নি? তার প্রশ্নে যে নৈরাশ্যের গভীর বেদনা বেজেছিল, সেটা রাঘবন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। একমাত্র মেয়ের জন্যেই সে ঠিক করেছে সীতার সঙ্গে আবার মিটমাট করে নেবে।

রাঘবন দিল্লী ছাড়ার দিন দশেক আগে একদিন রাত দশটা নাগাদ হঠাৎ তার বাড়িতে একজন মেয়েমানুষ এসে হাজির হল। তার মূর্তি দেখলে ভয় করে। তার কথার ধরন আরও ভয়াবহ। এসেই প্রশ্ন করলে— 'আমায় চেন?'

'না তো।'— রাঘবন জবাব দিল।

'আমি তোমার স্ত্রী সীতার মা।'— মহিলা বলল।

রাঘবন হাসল। বললে— 'সীতার এরকম ক'জন মা আছেন?'

'হেসো না। তোমার বাকচাতুরী আর অন্য কোথাও দেখিয়ো। সীতা আমার পেটের মেয়ে নয়, তবু সে আমারই মেয়ে। তোমার বউয়ের গলার হারটা আছে, না বেচে খেয়েছ?'—মহিলা তর্জন করেন।

রাঘবন অবাক হয়, ভয়ও পায়। তবুও ভয়টা বাইরে প্রকাশ না করে উলটে ধমকের গলায় বলে— 'এসব জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য কী? কে তুমি? তোমার নাম কী?'

'চুপ, চেঁচিয়ো না। বলছি শোনো। আমি তোমার শাশুড়ি। আমার নাম রাজিয়া বেগম। ঐ রত্নহারটা সীতাকে আমিই দিয়েছি। সেইজন্যে জিজ্ঞেস করছি। আমি শুনেছি সীতাকে তুমি অনেক কষ্ট দিয়েছ। সব খবর আমার কানে গেছে। তোমার অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে জেলের কষ্টও শ্রেয়। এই ভেবেই সীতা জেলে গেছে।— যাক যেদিন সীতা জেল থেকে বেড়োবে— আমি চাই সেইদিনই তুমি তাকে আনতে যাবে। তাকে বাড়িতে এনে,

মর্যাদার সঙ্গে তাকে নিয়ে সংসার করতে হবে তোমাকে। এর অন্যথা হলে—' একটা চকচকে ছুরি কোমর থেকে বার করে দেখাল—'এর একটি ঘায়ে তোমার দফারফা করে দেব আমি— তোমায় সাবাড় করে দেব। মনে রেখো।'

এরপর রাঘবন সত্যি ভয় পেয়ে যায়। মুখ দিয়ে 'রা' কাড়ার সাধ্য থাকে না তার। হঠাৎ একটা কথা ওর খেয়াল হয়— নতুন দিল্লীতে এক পাগলী···রজনীপুরের পাগলী ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করে—'তুমি··· রজনীপুরের···'

'হ্যাঁ। আমি রজনীপুরের মহারাণী। আমার আদরের মেয়েকে তুমি যত্নে রাখবে। নইলে ছুরির ঘায়ে তোমায় শেষ করব। বুঝেছ?'

—কথা শেষ করে মহিলা আর দাঁড়ায়নি।

এরপর দিনকতক রাঘবনের মনে স্বস্তি ছিল না। কে এই রজনী-পুরের পাগলী? তার সঙ্গে সীতার সম্বন্ধই বা কী? আর-কোন উপায়ে জানাও সম্ভব নয়। একমাত্র সীতাকে প্রশ্ন করেই জানা যেতে পারে।···

সমুদ্রের মন ভুলানো প্রাণ-জুড়োনো হাওয়া। তরঙ্গের গীতিময় উচ্ছ্বাস— সব মিলিয়ে রাঘবনের চোখে ঘুমের ঘোর নেমে আসে। কখন একসময় রাঘবন সোফার ওপর ঘুমে ঢুলে পড়ে।··· ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে রাঘবন। কে একটি নারী ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আগে ভাবল তারিণী কিন্তু দেখতে দেখতে চেহারাটা পালটে গিয়ে সীতার মুখ হয়ে দাঁড়াল। রাঘবন বললে— 'সীতা আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় অনেক দুঃখু দিয়েছি।'

সীতা বললে— 'তুমিও আমায় কষ্ট দিয়েছ, আমিও তোমায় কষ্ট দিয়েছি। পাল্লা দুদিকেই সমান। তাই ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। মেয়ে কোথায়?— বাসন্তী?'

'ওহো। তাই তো। বাসন্তীকে তো আনা হয়নি। এখনই নিয়ে আসছি।'—বলে রাঘবন ছুটতে থাকে। ওর মনে হচ্ছে বাসন্তীকে

কোথায় যেন রেখে এসেছে। কিন্তু কোথায়?— কিছুতেই মনে পড়ছে না। একদিকে মনে করার প্রয়াস, আর-একদিকে খুঁজে আনার জন্যে ছোটাছুটি। সে পাগলের মত দৌড়তে থাকে। নদী-নালা পেরিয়ে, পাহাড় পর্বত টপকে রাঘবন ছুটছে··· ছুটছেই। নদীর বালিতে পা বসে যাচ্ছে। কাঁটায় জামাকাপড় বেধে যাচ্ছে, ছিড়ে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। রাঘবনের ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রথমে 'বাসন্তী' 'বাসন্তী' বলে মেয়ের নাম ধরে পরিত্রাহি চেঁচাতে থাকে। তারপর গলা বসে যায়। আওয়াজ বেরোয় না। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে তীব্র হাহাকার করে ওঠে— 'হায় বাসন্তী!'

ঘুম ভেঙে যায়। রাঘবন ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাসন্তীকে দেখার জন্যে বুকের ভেতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা করে—'মেয়েটাকে ভাল রেখো, ভগবান, তার যেন কোন অনিষ্ট না হয়'। মনে মনে শপথ করে মেয়েকে আর কোন-দিন কাছছাড়া করবে না।

জাহাজ বোম্বাই বন্দরে ভেড়বার পরেই রাঘবনের প্রথম কাজ হল উড়োজাহাজে করে মাদ্রাজে যাওয়া। পদ্মাপুরমে বাড়ির দরজার কাছে এসে দেখল গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেউ বাইরে যাচ্ছে নাকি? ট্যাকসির শব্দ শুনে মা এসে বাইরে দাঁড়ায়। ছেলেকে দেখে মা সস্নেহে স্বাগত জানায়। বলে— 'খবর দিসনি তো?'

রাঘবন সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। বলে— 'কেউ বাইরে যাচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ বাবা, সূর্য এসেছে। বাসন্তীকে নিয়ে যাবে। কে জানে তুই আজ আসবি? ভালই হল তুই এসে পড়লি। মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'—মা বললেন।

'মেয়েকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

'দেবপট্টণমে। ওর মাও তো সেখানেই থাকে।'

'বটে! এই কথা!'—রাঘবন যেন গর্জে ওঠে।

'তুই যখন এসেছিস। আজ নাহয় যাবে না!'—কামাক্ষী বলেন।

'শুধু আজ নয়। কোনদিনই যাবে না।'—রাঘবন সশব্দে ভেতরে ঢোকে।

সূর্যর সঙ্গে যাবে বলে বাসন্তী তৈরী হচ্ছিল। রাঘবনকে দেখে দৌড়ে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাঘবন মেয়েকে একহাতে জড়িয়ে ধরে, অন্যহাতে পাতলুনের পকেট থেকে রিভলবার বের করে সূর্যর দিকে তাক করে। গর্জে ওঠে--

'স্কাউণ্ড্রেল! তোমার মতন বেইমানকে মারলে কোন পাপ হয় না।'

সূর্য এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থাকে। তারপর, সামলে নিয়ে বলে—'বাঃ বাঃ চমৎকার! তা এত রাগ কিসের? সায়েব কি বিলেতে থাকতে বিলিতি ফিল্ম কি একটু বেশী মাত্রায় দেখে ফেলেছেন নাকি? বিনা কারণে— একটি কারতুজ নষ্ট করবেন কেন? রেখে দিন। দরকার পড়লে কাজে লাগবে।'

রাঘবন বলে— 'তোমার বাকচাতুরী রাখো। ওসব ঢের শুনেছি। সীতাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছ। এখন এসেছ বাসন্তীকে কিডন্যাপ করতে! আমি তোমায় পুলিসে না দিয়ে ছাড়ব না।'

রাঘবনের পেছনে পেছনে তার মা হাঁফাতে হাঁফাতে আসছিলেন। বললেন—'এ তোর ভারী অন্যায় ছোটখোকা। এতদিন পরে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই আবোল তাবোল বকছিস। সূর্য সেরকম ছেলেই নয়, যে অন্যায় করবে। আমি নিজে ওকে বলেছি, মেয়েটাকে তার মার কাছে নিয়ে যেতে। কতদিন থেকে মেয়েটা মা-বাপের মুখ দেখেনি, হেদিয়ে যাচ্ছে তাই।'

এই ফাঁকে বাসন্তী বলে ওঠে—'সূর্যমামা আমি বাবার হাতটা শক্ত করে ধরে রাখছি। তুমি পালিয়ে যাও।'

মেয়ের কথা শুনে রাঘবনের সম্বিৎ ফিরে আসে। নিজের আচরণে বোধহয় কিঞ্চিৎ লজ্জিতও হয়ে পড়ে। বলে—'মিস্টার সূর্য। তোমার কপালটা ভাল। গোটা মেয়েজাতটাই তোমার পক্ষে। আচ্ছা এবারের মত তুমি রেহাই পেয়ে গেলে আমার হাতে। যাও, চলে যাও এখান থেকে। গেট আউট!'

'আরে মশাই আমি তো চলেই যাচ্ছিলুম। চলে যাবও। কিন্তু যাবার আগে আপনার একটা ভুল ধারণা দূর না করে তো নড়তে পারছি না। আপনার ধারণা– আপনার বউকে আমিই ভাগিয়ে নিয়ে গেছি– এটি মিথ্যে এবং পাগলামি। এটা আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন, না কথার কথা বলছেন, তা আমার জানা নেই। যাই হোক। আসলে, রজনীপুরের রাজবাড়ির লোকেরাই সীতাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের হাত থেকে সীতাকে ছাড়িয়ে আনবার জন্যেই আমি তাদের পিছু নিয়েছিলাম। সেই সময় পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যাই।'—সূর্য কথা শেষ করে থামে।

কামাক্ষী দেবী বললেন—'রাঘবন, আমি সূর্যের মুখে এসব কথা আগেই শুনেছি। আমার খুবই বিশ্বাস হয় ওর কথা। সীতাও তাই বলেছে।'

বাসন্তী বললে–'মা যে কত কষ্ট করেছে, শুনলে ভয় করে।'

রাঘবন পিস্তলটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে বলে—'তবে তো সব কথা শুনতেই হয়। সূর্য, তুমি এখন যাবে কেন। কোন তাড়া না থাকে তো থেকে যাও।'

'কোন তাড়া নেই। নিশ্চয়ই থাকব। সব শুনিয়ে যাব আপনাকে।'

রজনীপুরের রাজবাড়ির দুর্বৃত্তদের কথা সূর্যের মুখে শোনার পরই রাঘবনের কৌতূহল বেড়ে গেল। সে সূর্যকে আটকাল।

স্নানাহারের পর সূর্যকে নিয়ে দোতলায় নিজের খাসকামরায় গিয়ে আরাম করে বসে বললে–'জানো সূর্য, আমি আসার সময় জাহাজে একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। বাসন্তী যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তার ডাক আমার কানে আসছে। অথচ তাকে কোথাও পাচ্ছি না। জলে-ডাঙায়, বনে-জঙ্গলে— খুঁজতে কোথাও বাকি রাখিনি। কিছুতেই না··· এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল। আমি মনে মনে সংকল্প করলুম আজ থেকে বাসন্তীকে আর কিছুতেই কাছছাড়া করব না। বাড়িতে পা দিয়েই শুনলুম তুমি বাসন্তীকে নিয়ে যাচ্ছ— শুনে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। তুমি কিছু মনে কোরো না

—হ্যাঁ, তারপর বল দিকি. রজনীপুরের রাজবাড়ির কাহিনীটা শুনি।'

'মনগড়া কাহিনী নয় মিস্টার রাঘবন, সত্যি ঘটনা।'

'আচ্ছা তাই সই। রজনীপুরের গুণ্ডারা সীতাকে জোর করে নিয়ে গেল? তুমি যদি প্রমাণ করতে পার যে তোমার কথা সত্যি, তা হলে রজনীপুর এস্টেটের আমি নাম-নিশানা ঘুচিয়ে দেব।'—রাঘবন বলে।

'আমি প্রমাণটমাণ কিছুই করতে পারব না। এসব কাজ যারা করে তারা প্রমাণ রাখে না। ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রমাণ আনব কোথা থেকে। আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হয় তো শুনুন।'

'তা হলে এমন কাহিনী শোনাও, যাতে আমার বিশ্বাস হয়।'

'আপনার রসিকতার মেজাজটা যায়নি এখনো। তা ভালই। আচ্ছা তারিণীর আর সীতার মুখের মিল আছে, এটা লক্ষ্য করেছেন?' —সূর্য প্রশ্ন করে।

রাঘবন মনে মনে চমকে ওঠে। ওর মনে নানান রকম চিন্তার তোলপাড় হতে থাকে। কিন্তু বাইরে একটা কৃত্রিম শান্তভাব বজায় রেখে বলে—'না ভাই। মেয়েদের মুখের মিল খুঁজে বেড়াবার সময় পাইনি বেশি। তুমি যখন বলছ মিল আছে, মেনেই নিলাম। কিন্তু তাতে হলটা কী?'

'কিচ্ছু না। রজনীপুরের আসামীরা তারিণী ভেবেই ভুল করে সীতাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল!'

'অঁা! তা হলে বল তারিণী…' রাঘবনের মুখে বুলি ফোটে না। খানিক নির্বাক হয়ে থাকার পর বলে—'তুমি এতসব কথা জানলে কী করে সূর্য, তারিণীর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। কই সে তো আমায় কোনদিন কিছু বলেনি। আর আমিও কখনো সন্দেহ করিনি।'

'আমায় তারিণী বলেনি। সীতাই আমায় প্রথম বলে।'

'তারিণী ভেবে সীতাকে ধরেছে, তাই বা তুমি জানলে কী করে?'

সীতাকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল তার আগের দিন তারিণীকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সেই যে তিনজন লোক সূর্যকে এক লাখ টাকার লোভ দেখিয়েছিল— সেই ঘটনাটা সূর্য রাঘবনকে বলল। বললে তাদের বেশভূষা দেখেই মনে হচ্ছিল কোনো দিশী রাজার রাজ্যের লোকজন। তাদের আসল উদ্দেশ্য অবশ্য তখন বুঝিনি। ভেবেছিলুম রাজাদের যেমন মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করার অভ্যেস থাকে সেই-সব কারণেই বোধ হয় তারিণীকে ধরবার দুর্মতি হয়েছে। পরে তাদের কড়কে• দিয়েছিলাম। তারিণীর সঙ্গে যেখানে বসেছিলাম, তার পরের দিন সেই গান্ধী ময়দানেই প্রায় একই সময় যখন আমি আমি আর সীতা বসে কথা বলছি—'

রাঘবন বাধা দেয়—'ও তা হলে পরের দিন তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলার জন্যে তোমার সতীসাধ্বী বোন, সকলের চোখ এড়িয়ে গান্ধীময়দানে গিয়েছিল ?— কেন গিয়েছিল ?'

'জামাইবাবু, আপনি যদি রাগ না করেন তো সত্যি কথাটা বলতে পারি।'

'আর আমি যদি রাগ করি, তা হলে মিথ্যে বলবে। কেমন ?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি রাগ করুন আর নাই করুন, সত্যি কথাই বলছি।—আপনি আমায় পুলিসে ধরিয়ে দেবেন বলে সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন, আপনার বাড়ির চারপাশে সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দায় ঘেরাও করে রেখেছিল, মনে আছে ? তাই আমাকে ওবাড়ি যেতে বারণ করার জন্যে আমায় সাবধান করে দিতেই সীতা গান্ধীময়দানে গিয়েছিল।…

সূর্য সংক্ষেপেই বলল। ঘটনার আরো একটা দিক ছিল, সেটার সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত করল না। কিন্তু রাঘবনের মেজাজ গরম হবার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। সে মনে মনে গজরাতে থাকে—'উঃ আস্পদ্দাটা বোঝ একবার! এই বদমায়েসটাকে বাঁচাবার জন্যে কী গরজ ! কেন, এত টান কিসের ?'

এরপর, সীতার তারিণীভ্রমে রজনীপুর রাজ্যে গুম হওয়া থেকে

নিয়ে কলকাতায় গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সূর্য সংক্ষেপে রাঘবনকে শোনাল।

—'রজনীপুরের লোকেরা যে ভুল করেছিল, কলকাতার পুলিসও সেই একই ভুল করল। তারিণীদেবী মনে করে সীতাকেই নিবর্তন আইনে আটক করল।'

সূর্যর মুখে সব বিবরণ শোনার পর রাঘবনও রজনীপুরের পাগলী সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা সূর্যকে জানাল। সব কথার শেষে রাঘবন বলল—'আচ্ছা, মেয়েমানুষটি আসলে কে, তুমি জান? সীতার ওপর তার মমতা কেন? বলতে পার?'

'হুঁ, বলতে পারি।' সূর্য বলল। শুনে রাঘবন কেঁপে উঠল।

'মহিলাটির নাম একসময় ছিল রমামণি বাই। বর্তমানে রাজিয়া বেগম। সীতার ওপর তার মমতার সংগত হেতু আছে। সে এক দীর্ঘ কাহিনী। প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। মহিলা এখন প্রায় উন্মাদের পর্যায়ে। তবে কখনো সখনো সজ্ঞানে থাকেন। এইরকম এক মুহূর্তে তাঁর মুখেই আমার আনুপূর্বিক সব কাহিনী শোনার সুযোগ হয়েছিল—'

এইটুকু ভূমিকা করে সূর্য রাজিয়া বেগমের বিখ্যাত ইতিহাস বর্ণনা করল।

একচল্লিশ

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে রজনীপুরের গদীতে যে মহারাজ আসীন ছিলেন, অন্যান্য রাজ্যের মহারাজদের মতন তিনিও অত্যন্ত বিলাসব্যসনে আসক্ত ছিলেন। কুমন্ত্রণা দেবার জন্যে তাঁর যে-কয়টি দক্ষ অনুচর ছিল— তাঁদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিল মদনকর।

একবার রাজদরবারের মুজরোয় এক গায়িকা এলেন। তাঁর নাম গঙ্গাবাই। মহারাজ তার প্রতি আসক্ত হলেন। গায়িকার সঙ্গে তার বোন রমামণিও এসেছিলেন অভিভাবিকা হিসেবে। অত্যন্ত সাহসিকা মহিলা। অত্যন্ত ব্যবহারকুশলা বলে তাঁর গর্ব ছিল।

তিনদিনের মুজরো শেষে গায়িকার বাসস্থানে গিয়ে মদনকর জানাল যে মহারাজ গায়িকার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হয়েছেন। তার জন্যে তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সুযোগ বুঝে রমামণি প্রস্তাব দিলেন— 'যদি এইকথাই হয়, তবে মহারাজ আমার বোনকে বিয়ে করুন।'

মদনকর বলল—'মহারাজের অভিপ্রায় তাইই।' 'বিবাহ' শব্দটাই রমামণিকে প্রতারিত করল। সাধাসাধি করে বোনকে রাজি করালেন। বিয়ের প্রহসন সম্পন্ন হল। কিছুদিনের মধ্যে জানা গেল যে মহারাজের আরো তিনটি বিয়ে ইতিপূর্বে হয়েছে এবং রানীরা মহলেই বাস করেন।

এ কথা জানতে পেরে রমামণি চমকে উঠলেন। কিন্তু আশায় জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হলেন না। খবর নিয়ে জানলেন রানীদের কোন সন্তান নেই। একদিন রাজার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করলেন রমামণি। খোলা ছুরি দেখিয়ে তাকে শাসিয়ে একরার নামা লিখিয়ে

নিলেন— তার বোনের গর্ভে যদি কোনো ছেলে হয়, সেই হবে গদীর উত্তরাধিকারী!

এ কথা জানতে পেরে মদনকর আবার টেক্কার ওপর তুরুপ করল। রমামণির চক্রান্ত বানচাল করবে বলে উঠে পড়ে লাগল। সে আবার ধাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল গঙ্গাবাই-এর ছেলে হলে তাকে যাতে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলা হয়।

মদনকরের ধাই-এর সঙ্গে অসৎপরামর্শ আবার সেজরানীর কানে যায়। তিনি ছিলেন উদারমনা ধার্মিক প্রকৃতির রমণী। তিনি আড়ালে রমামণিকে ডেকে মদনকরের ঘৃণ্য অভিসন্ধির কথা জানিয়ে তাকে সাবধান করে দেন এবং পরামর্শ দেন যে প্রসবের আগেভাগে ছোটরানীকে নিয়ে তার দিদি যেন বোম্বাই চলে যান। এ-ব্যাপারে সেজরানী তাঁদের ঐকান্তিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন। মহারাজ সেসময় য়ুরোপে ছিলেন। রমামণি মহারানীর পরামর্শ অনুযায়ী গঙ্গাবাইকে নিয়ে মদনকরের সতর্ক পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে বোম্বাইয়ের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

রাজপুতদের পর্দাপ্রথা অনুসারে গঙ্গাবাই ঘোমটায় মুখ ঢেকে চললেন। তাকে নিয়ে ঘোরায় রামামণির বিশেষ অসুবিধা হল না। কিন্তু অসুবিধা হল আর-এক প্রকার। হাতের টাকাপয়সা আর রেলের টিকিট রাস্তায় খোয়া গেল। বোম্বের কাছাকাছি কোন-এক স্টেশনে টিকিট চেকার তাঁদের কাছে টিকিট না পেয়ে তাঁদের নামিয়ে দিল।

ছুটি মেয়েমানুষ। তার মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা। হাতে কানা-কড়ি নেই। থাকবার মধ্যে গঙ্গাবাইয়ের গায়ে কিছু দামী গয়না-গাঁটি। তার একটা বেচলেও অনেক টাকা হয়। কিন্তু একে ছোট ইস্টিশান, তায় রাত্তিরবেলা। বোম্বাইয়ের কাছের এইসব ইস্টিশানে গাড়ি এলে প্রচণ্ড ভিড়। গাড়ি চলে গেলেই নির্জন। রমামণি বোনকে নিয়ে যাত্রীদের প্রতীক্ষাকক্ষে উঠলেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে গঙ্গাবাই ঘোমটার আড়ালে চোখের জল ফেলতে থাকেন।

কান্নার শব্দ শুনে রাতের স্টেশনমাস্টার প্রতীক্ষাকক্ষে অনুসন্ধান করতে এসে দেখলেন দুটি মেয়েমানুষ— একজন অবগুণ্ঠিতা, অন্য-জনের মুখে ঘোমটা নেই। স্টেশনমাস্টার জেরা করতে লাগলেন। স্টেশনমাস্টার— দুরাইস্বামী আয়ার— সীতার পিতা।

রমামণি বাইরে এসে স্টেশনমাস্টারকে সমস্ত কথা সবিস্তারে বলে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। শুধু রাতটা থাকতে দিলেই চলবে না। পরদিন তার বোনকে বোম্বাইয়ের কোন প্রসূতি সদনে ভর্তি করে দেবার বন্দোবস্তও তাঁকে করতে হবে— সজল চোখে অনুনয় করলেন রমামণি।

'সাহায্য করলে তার বিনিময়ে আমায় কী দেবেন?'—স্টেশন-মাস্টার প্রশ্ন করলেন।

সেসময় দুরাইস্বামীর আয় খুবই কম। তাঁর স্ত্রী রাজাম্মাও তখন আসন্নপ্রসবা— প্রথম সন্তান হতে চলেছে। প্রসূতিসদনের মোটা খরচ চালাবে কী করে দুরাইস্বামী সেই ভাবনায় কাঁটা হয়ে আছেন। পয়সার টানাটানিতে পাগল হয়ে যাচ্ছেন। তাই সেই মুহূর্তে কথাটা প্রায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল— 'কী দেবেন?' কারণ, মহিলাদের বেশভূষা দেখে তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে এঁরা বিশেষ বিত্তবান।

তাঁর কথার জবাবে রমামণি বললেন— 'এই সংকটমুহূর্তে যিনি আমাদের সহায় হবেন, তাঁকে অদেয় কী থাকতে পারে? তিনি মুখ ফুটে চাইলে আমি আমার সর্বস্ব তাঁকে উজাড় করে দেব।' শুনে দুরাইস্বামী বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। লজ্জায় সংকোচে জড়সড় হয়ে বললেন —'ছিছি কী বলছেন? আমি কিছুই চাই না। আমার যথাসাধ্য আমি করব।'

পরদিন সকালে দুরাইস্বামী গঙ্গাবাইকে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী যে হাসপাতালে রয়েছেন সেখানেই ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু কথাটা তার স্ত্রীও জানলেন না।

রোজ স্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে যেতেন দুরাইস্বামী। রমামণির

সঙ্গেও দেখা করে আসতে ভুলতেন না। রমামণিও তাঁর মহানুভবতায় কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা ক্রমে আকর্ষণ এবং প্রেমে দানা বাঁধল।

একদিন রাত্রে রাজাম্মাল এবং গঙ্গাবাই একই সময়ে সন্তান প্রসব করলেন।

এদিকে মদনকর কোনমতে খবর পেয়ে গেছে। গন্ধে গন্ধে হাসপাতাল অবধি ধাওয়া করেছে। রমামণি জানতে পেরে গঙ্গাবাইকে কোনো গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলতে চাইল— যাতে মদনকরের হাতে না পড়তে পারে। এব্যাপারেও ত্বরাইস্বামীই তার সহায়সম্বল। ত্বরাইস্বামী তখন রমামণির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বোম্বাই শহরে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না এমন একটা জায়গা দেখে তিনি তাদের নিয়ে এসে রাখলেন। এবং যথারীতি স্ত্রীর অজ্ঞাতে রমামণির সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন।

রাজাম্মার প্রথম সন্তান বেশিদিন বাঁচে নি। ত্বরাইস্বামী তার সন্তানশোক ভোলবার জন্য রমামণির বাড়ি গিয়ে তারিণীকে আদর করে বুক জুড়োতেন।

এর কিছুদিন পরে রজনীপুরের রাজাসাহেব য়ুরোপ থেকে ফিরলে রমামণি তাঁর বোম্বাইয়ের প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ঝগড়া করে বসল। মহারাজ পুরাকালের রাজা দুষ্মন্তের অনুকরণে গঙ্গাবাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অস্বীকার করে বসলেন। রমামণি তখন রাজাকে তাঁর স্বহস্তলিখিত পত্র দেখাল। তখন মহারাজের ইঙ্গিতে তাঁর লোকজন এসে রমামণির হাত থেকে জোর করে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে তাকে নির্দয়ভাবে ধাক্কা মেরে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিল।

অতিরিক্ত নৈরাশ্য আর অবসাদ নিয়ে ফিরে রমামণি— সমস্ত বৃত্তান্ত বোনকে শোনাতে গঙ্গাবাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। গঙ্গাবাই এরপর আর বেশিদিন বাঁচেনি।

তারিণী বাস্তবিকই এক রাজকন্যা!— এই বিস্ময়কর আবিষ্কার রাঘবনের মনে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের আলোড়ন তুলল। তারিণী যে সাধারণ ঘরের মামুলী মেয়ে নয়— এ রকম ওর

প্রায়ই মনে হত। কথাটা ঐতিহাসিক সত্য জেনে ওর আনন্দও হল, গর্বও হল। ও একজন জহুরী, রত্ন চিনে নিয়েছিল। একটা ষোলো-আনা রাজকন্যের প্রেম পেয়েছিল একদিন— এ কথা ভেবেও ওর গর্ব ও আনন্দের অধিকার আছে! কিন্তু সেই দুর্লভ সৌভাগ্য স্থায়ী হতে পায়নি— এটাও তার কম বড় দুঃখ নয়।··· কী আশ্চর্য। তারিণীর জন্মরহস্য ও কোনদিন জানতে পারেনি।

অথচ দুদিন এসেই সূর্য সমস্ত কথা জানতে পারল কী করে? একে একে তারিণী, সূর্য, সীতা— সকলের ওপরেই অপরিসীম ক্রোধে রাঘবন জ্বলে ওঠে। ওরা সবাই মিলে যোগসাজস করে ওর জীবনটাকে বরবাদ করে দিল। ঈর্ষা-বিদ্বেষ-সংক্ষুব্ধ অন্তরকে কোন-মতে সংবৃত করে রাঘবন বিষাক্ত হেসে বললে— 'সূর্য! তোমার কাহিনী— স্কট আর ডুমার উপন্যাসকেও কল্পনাতে হার মানায়।··· খুবই মুখরোচক কাহিনী বলতে হবে।'

'আমাদের দিশীরাজাদের রাজত্বে এমন অনেক কাহিনীই আছে। যা কাল্পনিক কাহিনীকে হার মানাতে পারে। তবে সেসব শুনলে আমার যেমন কষ্ট হয়, তেমনি রাগও হয়। কে জানে কতশত গঙ্গাবাই-রমামণির চোখের জলের ইতিহাস লেখা আছে ঐসব রাজ-মহলের দেয়ালে দেয়ালে! আশ্চর্য। এত অভিশাপ— এত চোখের জল··· এত দীর্ঘনিঃশ্বাস সত্ত্বেও প্রাসাদগুলো টিকে আছে। ধ্বংস হয়ে যায় না!'—সূর্য বলে।

রাঘবন বলে—'এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? কলিকালে অভিশাপ চলে না। সতীসাধ্বীর অশ্রুশক্তি সেই ত্রেতা যুগেই ফুরিয়ে গেছে। এখন অত্যাচারী যুগ। যাক, তারপর বলো। গঙ্গাবাই মরার পর রমামণি কি করল? ভাগ্যবান স্টেশনমাস্টারটি, ওরফে আমার পরম পূজনীয় শ্বশুরমশাই বা কী করলেন?'

'এর পরে আর বেশি কিছু বলবার নেই। পরের কথা হয়তো আপনিই বেশি জানেন। তবুও শুনতে চান তো আমি যতটা জানি বলতে পারি।'

গঙ্গাবাইয়ের মৃত্যুতে রমামণি খুবই ভেঙে পড়েছিল। তার মাথার ঠিক ছিল না কিছুদিন যাবৎ। সামলে ওঠার পর সে সংকল্প করল তার বোনের অকালমৃত্যুর জন্যে যারা দায়ী সেই রজনীপুরের রাজা আর তার কুমন্ত্রী মদনকরের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে। এই প্রতি-হিংসার সংকল্প তাকে অসাধ্যসাধনের শক্তি জোগাল। অবিশ্বাস্য দুঃখকষ্ট ভোগ করতেও রমামণি পিছপাও হল না। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং তারিণীকে মদনকরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে একজন পুরুষের সঙ্গ তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই নারীর সর্বসামর্থ্য প্রয়োগ করেও সে দুরাইস্বামীর প্রেমকে নিজের কক্ষপথে অটল করে রাখল।

এদিকে দুরাইস্বামী পড়লেন মহাফেসাদে। একে ঐ অল্প মাইনে, তায় বোম্বাইয়ের মতন মাগ্‌গিগণ্ডার শহরে— দুটো সংসার চালানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। পয়সার টানাটানি বেড়েই চলেছিল।

তারিণী বড় হবার পর রমামণি একদিন তাকে রজনীপুর থেকে নিয়ে তার মার লাঞ্ছনা ও মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন যে তিনি প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। গঙ্গাবাইয়ের কথা শোনার পর তারিণীর মন জন্মভূমির দুর্দশার প্রতি আকর্ষিত হল। সে স্বাধীনতার যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিতে চাইল। সমাজসেবার প্রবণতা এল তার অন্তরে। লবণ সত্যাগ্রহের আন্দোলনে তখন সারা দেশ আলোড়িত। তারিণী প্রথমে সত্যাগ্রহে, পরে বিহার ভূমিকম্পে দুর্গতদের সেবার কাজে যোগ দেয়।

এই সময় সীতার মা রাজাম্মাও দীর্ঘস্থায়ী অসুখে রোগশয্যায় পড়েছিলেন। তাঁর বাঁচার আশা নেই শুনে রমামণি তাকে দেখতে যান। রাজাম্মা আর তার মেয়েকে দেখার ইচ্ছে তার অনেকদিন ধরেই ছিল। রজনীপুরের রাজপুরীর দৌলতে রমামণির হাতে যেসব গয়নাগাঁটি ছিল, শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে একটা জড়োয়ার হারই বেঁচেছিল। সেই হারটা আর হাজার দুয়েক টাকা নিয়ে রমামণি

রাজাম্মাকে দেখতে যায় তুরাইস্বামীর অনুপস্থিতিতে। সীতার বিয়ের জন্যে ঐ হার আর টাকা দিয়ে আসে।

এরপর থেকে রমামণির জীবনে ঐ একটাই ব্রত থেকে যায়। বোম্বাইয়ে রজনীপুরের রাজাকে ছুরি মেরে নিকেশ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ধরা পরে গিয়ে জেল খাটে। রজনীপুরের রাজা এরপর আর বেশিদিন বাঁচেনি। তাই রমামণি তার দ্বিতীয় শিকার মদনকরের ওপর লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করে। কিন্তু এই প্রয়াসেও রমামণিকে ব্যর্থই হতে হয়েছিল। কারণ, একে তো মদনকরের তল্লাসে রমামণির দীর্ঘসময় কেটে যায়। তারপর তাকে খুঁজে বের করে মারবার জন্যে যখন তাকে খুঁজছিল, সেই সময় মদনকরের আর-এক শত্রু এগিয়ে আসে। প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতায় সেই লোকটাই জয়ী হয়।

বিয়াল্লিশ

গঙ্গাবাই আর রমামণির ট্রাজেডি শোনাবার পর সূর্য রাঘবনকে বললে—'বুঝলেন জামাইবাবু। আপনি যে উত্তরভারতীয়া মহিলার কথা বলছিলেন, যে সীতার নাম করে আপনাকে শাসিয়ে গেছে আমার মতে সে-ই রাজিয়া বেগম। আর কেউ নয়। বুঝতে পারছেন, তার সীতার ওপর এত টান কেন?'

'হুঁ পারছি। আচ্ছা সূর্য, আমার শ্বশুরমশায় এখন কোথায় আছেন কী করছেন, বলতে পার? বিয়ের পরে তাঁকে আর এক-বারও দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। তিনি কোথায়, জান?'

'না। তিনিই বা কোথায় আর রাজিরা বেগমই বা কোথায়—কিছুই জানি না। তারিণী আর আমি তাঁদের খোঁজ করে করে হয়রান হয়ে গেছি। কিছুতেই ঠিকানা পাইনি।'—সূর্য বলে।

রাঘবন প্রশ্ন করে— 'তোমরা কিজন্যে তাদের এত খুঁজে বেড়াচ্ছিলে?'

সূর্যর ঠোঁটে হালকা হাসির রঙ দেখা যায়। বলে— 'মিস্টার রাঘবন, একটা ব্যাপারে তাঁদের অনুমতি আর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে চাইছিলাম। আমি আর তারিণী বিয়ে করব স্থির করেছি।'

রাঘবন খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলে— 'আরে সূর্য আমি তোমায় বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিলাম।'

'এখন কি ধারণাটা ভুল বলে মনে হচ্ছে?'

'আলবৎ। তা না হলে তারিণীকে বিয়ে করার কথা বল?— তাও আবার এতদিনের পরিচয়ের পর? শোনো। একসময় তারিণীকে

বিয়ে করার কথা আমিও ভেবেছিলাম। সে আমার সঙ্গেও প্রেমের ঢঙ করেছিল।'

সূর্য বললে— 'রাঘবন ! তারিণীর সম্পর্কে এমন কথা মুখে আনবেন না। তারিণীর প্রেমকে ঢঙ বলছেন, তাতেই বোঝা যায় আপনি তাকে আদৌ চিনতে পারেননি।'

রাঘবন বলে— 'তার মানে তুমি তাকে আমার চেয়ে বেশি করে চিনেছ ?'

'একশোবার !• তারিণীকে চিনতে পারলে আপনি তার বিরুদ্ধে খেলানোর কিংবা অভিনয় করার অভিযোগ আনতে পারতেন না।'

'বলব না কেন। সে তো একসময় আমাকেও বলেছিল আমার জন্যে জীবন দিতে পারে। আজ আবার তোমায় বিয়ে করতে চাইছে। এ দুটোর মধ্যে একটা কথা সত্যি হতে বাধ্য।'

'না, তা কেন ? মত বদলাবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে। এ কথা সত্যি যে একসময়ে তারিণী আপনাকে ভালবেসে-ছিল। সেটা ঢঙ বা ন্যাকামি নয়— বাস্তবিক প্রেম। কিন্তু পরে যখন তার অভিজ্ঞতা হল যে তার জীবনের লক্ষ্য আর আপনার পথ বিপরীতমুখী, তখন সে আপনার সম্বন্ধে মত বদলাতে বাধ্য হল। এটাকে অন্যায় বলব কেন ?'

'সূর্য। তুমি সুদক্ষ উকীলের মত তারিণীর কেসটা ডিফেণ্ড করেছ। কিন্তু বৃথা। কেননা তারিণীর ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা তোমার তুলনায় ঢের বেশি। সে আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় কেন করেছিল তাও জানি। সামান্য দুহাজার টাকার জন্যে। হবেই তো। দিশী রাজার দরবারের কুর্নিস করা বাইজীর মেয়ে এর বেশি আর কী হবে ?'

সূর্য আগুন হয়ে উঠল। গর্জন করে বললে—'খবরদার রাঘবন, আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। তারিণীকে নিয়ে একটা কথাও আর বলবে না। যদি বল…' রাগে সূর্যর ঠোঁট কাঁপতে থাকে, কথা বেরোয় না।

‘যদি বলি তো কি করবে ? ছুরির এক ঘায়ে আমায় খুন করে ফেলবে, রাজিয়া বেগমের মত !’ রাঘবন ব্যঙ্গ করে।

‘আচ্ছা, যেতে দিন। আপনার সঙ্গে কথা বলাই বৃথা। আমি এবার চলি।’—সূর্য যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

‘আরে আরে বোস, বোস। অমন রাগ করে যেতে নেই। অন্ততঃ তোমার আদরের বোনটির খবরটাও দিয়ে যাও। সে এখন কোথায় আছে, কী করছে, কী বৃত্তান্ত— তার ব্যাপারেও তো আমি মুখ খুললে তুমি বেজার হবে। আমি হলুম তার মুঠোয় পোরা স্বামী, আর তুমি হলে গিয়ে কত বাঞ্ছিত মামাত ভাই।’

সূর্য হেঁটমুখে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখের কোল বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

‘একী সূর্য ! মেয়েদের মতন অশ্রুপাত করছ, আরে ছিঃ ছিঃ। বোনটির নাম করার সঙ্গে সঙ্গে মন গলে গেল, ওমনি চোখে জল ? এ্যাঁ ! তার নামেই এত যাদু, নাকি তোমার সঙ্গে বিশেষ কোন মরমিয়া সম্বন্ধ আছে তার ?’ রাঘবনের কথার নীচে বিদ্রূপ ঝরে পড়তে থাকে।

এবার সূর্য কঠোর হয়ে ওঠে। চোখের জল মুছে সরাসরি রাঘবনের চোখের দিকে বজ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—‘আমার সম্পর্কে এমন-কি তারিণীর সম্পর্কেও আপনার যা খুশি বলতে পারেন। আমি কেয়ার করি না। কিন্তু সীতার বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে জিভ খসে পড়বে। যে সীতার কুৎসা গাইবে, তার নরকেও ঠাঁই হবে না। তাকে পাতালে যেতে হবে পাপ লুকোতে। ছিঃ !’

রাঘবন সহসা কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সূর্য বলে চলে—‘রাঘবন। আপনার সহস্র অপরাধ ভুলে গিয়েও সীতা আপনার কাছে আসতে চায়। কারণ সে আপনাকে দেবতা ভাবে। আপনি একটা চিঠি দিয়ে তাকে আসতে বলুন সে দৌড়ে আসবে। বিশ্বাস করতে পারেন।’

‘তা হয় না সূর্য। এ জন্মে তা হবার নয়। সীতাকে আসতে

লেখার আগে আমি নিজের আঙুলটাই কেটে ফেলব।'—রাঘবন সংকল্প ঘোষণা করে।

'একী বলছেন। শুনুন, আমার কথা রাখুন। এযাবৎ যা হয়েছে তা হয়ে গেছে। পুরনো কথা মন থেকে মুছে ফেলুন। সীতাকে নিয়ে আবার নতুন করে সংসার পাতুন। আপনাদের জীবন সুখের হবে রাঘবন। আপনি আর সীতা মিলেমিশে সংসার করছেন দেখলে আমার আর তারিণীর যত আনন্দ হবে, আর কিছুতেই তত হবে না।'

রাঘবনের ভেতরটা আগে থেকেই জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছিল। সূর্য তারিণীর নাম করতেই ষেন আগুনে ঘি পড়ল। রাঘবন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল— 'তোমার কি ধারণা, যে তোমাকে আর তারিণীকে আনন্দ দেওয়াই আমার একমাত্র তপস্যা? নাকি তোমাদের দুজনকে আনন্দ বিলোবার জন্যেই আমার জন্ম? আস্পদ্দা বড় বেড়ে গেছে না?'—রাঘবন সজোরে সূর্যর গালে চড় মারে।

তৎক্ষণাৎ সূর্যর হাত উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে নিল।

'কী হল? বীরপুরুষ! হাত তোল। হাত নামিয়ে নিলে কেন? সাহসে কুলোল না?'—রাঘবন শ্লেষের সঙ্গে বলল।

'রাঘবন সাহেব— সেটা আপনারই সৌভাগ্য। আগের দিন হলে আপনার চড় মারা হাতটা আমি কব্জি থেকে নামিয়ে আলাদা করে দিতুম। কিন্তু হালে আমরা— আমি আর তারিণী বলপ্রয়োগ-জোরজুলুমের পথ ত্যাগ করেছি। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস পন্থাই এখন আমাদের ব্রত। সেই পথে চলার যোগ্যতার প্রথম পরীক্ষা আপনাকে দিয়েই হল।' সূর্য শান্ত সুরে কথা বলল।

'বটে! এই কথা? তুমি মহাত্মার চেলা হয়েছ। বড়ই আনন্দের বিষয়। সেই আনন্দের নমুনা— এই নাও'— রাঘবন আবার সূর্যর গালে চড় মারে।

সূর্য দাঁতে দাঁত পিষে বলে— 'এবার খুশি হয়েছেন তো? মন ঠাণ্ডা হয়েছে। আচ্ছা যাই।'

'দাঁড়াও, এখনো খুশি হইনি। আমার মন যে জ্বালায় জ্বলছে,

তা এত সহজে ঠাণ্ডা হবার নয়'— বলে রাঘবন সূর্যর গলা টিপে ধরে ঝাঁকুনি দেয়। বলে— 'এই যে কথাগুলো মনে রেখো। আর যদি কখনো শুনেছি তুমি তারিণীর মুখোমুখি হয়েছ, কি সীতার কাছে গেছ— তাহলে জানে মেরে ফেলব।'

সূর্য বললে—'ওরকম অসংগত আবদার রাখতে তো পারব না জামাইবাবু! মিথ্যে কথা দেব কেন। সীতা আমার বোন। তাকে নিয়ে আমার মনে কোন পাপ নেই। আমি কেন তার সঙ্গে দেখা করব না? হাজারবার করব। আর তারিণীর ব্যাপারে আপনাকে কথা দিতে যাব কেন? সেটা আপনার এক্তিয়ারের বাইরে। আপনার হাতে বন্দুক আছে— গুলি চালাতে পারেন, আমায় খুন করতে পারেন। আপনার মা, আপনার বউ, আপনার মেয়ে তাতে আপনার কৃতিত্বে গৌরব বোধ করবে।'

'ও আমায় ভয় দেখাচ্ছ!'—বলে রাঘবন গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে সূর্যকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে সিঁড়িতে ফেলে দেয়। সূর্য গড়াতে গড়াতে মাঝ সিঁড়ি বরাবর এসে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।— এদিকে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনে বাসন্তী আর কামাক্ষী দৌড়ে আসে।

'একী! সূর্যমামা, সিঁড়িতে পড়ে গেছ? কী করে পড়লে?'

বাসন্তী সমবেদনায় কাতর হয়ে ওঠে।

সূর্য বললে— 'হ্যাঁ রে বাসন্তী, পড়ে গেছি। পাটা হঠাৎ বেধে গিয়েছিল।'

'বাসন্তী, তোমার সূর্য মামা হোঁচট খেয়েছে। ভাগ্যে সিঁড়িটা ভাঙেনি। খুব বেঁচে গেছে।'— রাঘবন পিশাচের মত অট্টহাসি হাসতে থাকে।

তেতাল্লিশ

সারা দেবপট্টণম নির্বাচনের ধুমধামে মশগুল। ঠিক ভোটের আগের দিনই পট্টভিরমণের সমর্থনে নির্বাচনপূর্ব অন্তিম সার্বজনিক সভার আয়োজন হয়েছে। সভায় এত প্রচন্ড ভীড় হয়েছে, যেটা এই ধরনের পৌরসভা নির্বাচনের পক্ষে আশাতীত বলা যায়।

মঞ্চে প্রার্থী পট্টভিরমণের সঙ্গে আরো জনকয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। তাদের মধ্যে সীতাও আছে। গত দেড় মাসের নির্বাচনী বক্তৃতার দরুন সীতার নাম সুবক্তাদের তালিকা-ভুক্ত হয়েছে। তার ভাষণে দেশানুরাগ উদ্দীপনা এবং গাঢ় স্বদেশ-প্রেমের আকৃতিতে ভরপুর হয়ে থাকে। জ্বালাময়ী ভাষায় সীতা চোরাবাজার দুর্নীতি এবং শোষণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থাকে। পট্টভির সমর্থনে তার ভাষণগুলো শোনবার মত। বিপক্ষীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে সে যেন মৃত্যুবাণ হাতে নিয়ে দাঁড়ায়! শ্রোতাদের আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে— সীতাদেবীর ভাষণ শোনার জন্যে তারা শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে!

কিন্তু শেষ দিনের সভায় শ্রোতাদের নিরাশ হতে হল। সেদিনও রোজকার মত সীতা বলবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বলতে পারল না— দু-পাঁচটি কথা বলেই তার কণ্ঠ অশ্রুর বাষ্পে রুদ্ধ হয়ে এল। সীতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বসে পড়ল।

ব্যাপারটা হল এই যে একদিকে সভার কাজ চলছে, অন্যদিকে একজন লোক সভার মধ্যে ইস্তাহার বিলি করছিল। হাতফিরি হয়ে একখানা কাগজ মঞ্চের ওপরেও এসে পড়ে। সীতা হাত বাড়িয়ে

কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে। তু-চার লাইন পড়েই তার মন ভেঙে যায়।

ইস্তাহারে সীতারই নিন্দে করা হয়েছে। বলেছে সীতা স্বামীকে ছেড়ে মামাত ভাইয়ের সঙ্গে ভেগে এসেছে। দেশসেবার জন্যে জেল খাটেনি, রেলগাড়িতে চুরি করবার জন্যে তার জেল হয়েছিল। এই রকম একটা নষ্ট মেয়েমানুষের কথায় ভুলে যারা নেচে বেড়ায় তাদের ইস্তাহারে মূর্খ উপাধি দেওয়া হয়েছে।

হাজার হলেও সীতা মেয়েমানুষ। তার মন ভাঙার জন্যে এটা যথেষ্ট। . পরের তুদিন সীতা আর ঘরের বার হল না।

পট্টভিও ঘটনাটায় খুবই ব্যথিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় জেদ চেপে গেল যে নির্বাচনে জিততেই হবে এবং শত্রুদের মুখে ছাই দিতে হবে।

ভোটারদের মনের ওপর ইস্তাহারের বিশেষ কোন বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া হয়নি। লোককে মুখ্যু বললে লোকের মন পাওয়া যায় না। তারা উল্টে ইস্তাহারঅলাদেরই মূর্খ প্রতিপন্ন করতে চাইল। লোকের মনে স্বভাবতঃই এরকম ধারণা হল যে চোরা-বাজারী লোকটা তার স্বার্থের খাতিরে একটা মেয়েমানুষের কেচ্ছা গাইছে। ভোটারদের বিবেচনা লোকের এই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করল। বিপুল সংখ্যক ভোটে পট্টভিরামণ জয়ী হল।

পট্টভিরামণ তার জয়ের আনন্দ নিষ্কণ্টকে উপভোগ করতে পারল না। সাতমণ তুধে একফোঁটা গো-চোনা পড়ার মতন সীতার মাথায় মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা চাপায় তার ষোলো-আনা আনন্দ মাটি হয়ে গেল।

বন্ধুবান্ধবরা দলে দলে পট্টভিকে অভিনন্দিত করে গেল। বাজারে আর ফুলের মালা রইল না— সব এসে ললিতা আর পট্টভির গলায় চড়ল। ললিতার পরিচিতরা বলল— এসব আপনার ভাগ্যেই হয়েছে। তু-এক জনে সীতার কথাও জিজ্ঞাসা করল।

সীতার কথা উঠতে সামনের বাড়ির দামোদরম পিল্লে বললেন—

'সার্বজনিক কাজ করতে গেলে ওরকম বাজে লোকের মিথ্যে অপবাদ শুনতেই হয়। ওকে ভয় করলে চলে না। ওসব কথা ভেবে মনভারী করে বসে থাকতে নেই।'

এডভোকেট আপ্পারাও বললেন— 'পট্টভিজী, সীতাদেবীকে একটু সাহস দিন।'

বাইরের লোকেরা বিদায় নেবার পর বাড়ির সবাই খেতে বসে। ললিতা সীতাকে ধরে নিয়ে এল।

পট্টভি জিজ্ঞেস করে— 'মাথা ব্যথা কেমন?'

সীতা বললে—'আপনার•জয়ের খবর পেয়ে সেরে গেছে.। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'এসব আপনারই উৎসাহ আর সহযোগিতার ফল। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সীতা বললে—'আমি আর কী করেছি। ললিতার ভাগ্যেই হয়েছে।'

ললিতা বললে—'লোকটার লোভ খুব বেশি, বুঝলি? ভোটে জিতেও হয়নি। বলছে 'চেয়ারম্যান হতে পারি তবে তো'।'

'তোমার ভাগ্যে তাও হয়ে যাবে।'

'নিছক ভাগ্য বলে বসে থাকলে চলবে না। আমার বাসনা পূরণ করতে হলে আপনাকে আবার আগের মতন আমার সাহায্যে নাবতে হবে। ওপরতলায় লুকিয়ে বসে থাকলে চলবে না।'

সীতা বললে— 'আমার দ্বারা আর আপনার উপকার হবে না। বরং অপকার হবারই সম্ভাবনা। গত দুদিন ধরে চিন্তা করে দেখলুম —মেয়েদের সার্বজনীন কাজে নাক গলাতে যাওয়া উচিত নয়। সাধারণ লোক বড় বদ।'

পট্টভি বলে—'এটা আপনার মস্ত ভুল। আজ যত লোক আমায় অভিনন্দন জানাতে এসেছিল তারা সবাই একবাক্যে আপনার সুখ্যেত করে গেছে। কেউ একটা মন্দ বলেনি।'

'—আজ বলেনি, কাল বলবে। সেই কাগজটা আপনি দেখেছেন

কিনা জানি না। দেখলে আপনারও আমার মতই রক্ত ফুটে উঠত।'

ললিতা বাধা দিয়ে বললে— 'থাক্, ছেড়ে দাও। আনন্দের সময় ওসব নিন্দেমন্দর কথা তোলার দরকার কী?'

সীতা আহারাদির পর ওপরে চলে গেলে সরস্বতী ললিতাকে ডেকে বললেন—'আর বেশিদিন ও মেয়ের এখানে থাকা ভাল দেখায় না। যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয়, ততই মঙ্গল।'

শুনে ললিতা বললে—'তুমিই না বলেছিলে— ওর সাহায্য না পেলে আমার জামাই ভোটে জিততে পারত না! আর আজ 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি'—বাঃ বেশ তো!'

সরস্বতী বললেন—'উপকারের কথা তো অস্বীকার করছি না। কিন্তু সীতার যদি স্বভাব চরিত্র ভাল হয় তাহলে তার উচিত দু'চার দিনের মধ্যে এবার চলে যাওয়া। নিজের ঘর সংসার তো আছে, নাকি? সোয়ামী আছে, সন্তান আছে। পরের ঘরে চিরকাল থাকলেই চলবে? তুই পারিস ওর মতন পরের সংসারে গিয়ে পাকাপোক্ত হয়ে বাস করতে? যা বলবি, একটু ভেবেচিন্তে বলবি তো।'

এবার ললিতাও ভাবে মা যা বলেছেন তাতে কিছুটা সত্যি আছে।

পট্টভির অভিলাষ অপূর্ণ রইল না। দেবপট্টণম পৌরসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনে তারই জয় হল। অভিলষিত জয়ের সঙ্গে এল প্রচুর ঝড়ঝঞ্ঝা, তড়িৎ বর্ষণ এবং প্লাবন।

নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, পট্টভি ললিতা আর সীতার উৎসাহও তত আকাশছোঁয়া হয়ে উঠল। ভোটের ঠিক দু'দিন আগে ললিতার নামে একটা চিঠি এল। পট্টভি সেসময় ঘরে ছিল না। ললিতা খাম খুলে দেখল চিঠিপত্র কিছুই নেই— ছাপানো কাগজের একটা টুকরো। খবরের কাগজের কাটিং। তাতে এক জায়গায় 'পট্টাভিরামণের কেলেঙ্কারী' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখেই ললিতার সর্বশরীর শিউরে উঠল।

ললিতা তৎক্ষণাৎ কাগজটা নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। আধখানার বেশি পড়া হয়ে উঠল না। তপ্ত অশ্রুপ্রবাহে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। চোখের জল ঝরিয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত হল। ললিতা মনকে প্রবোধ দিল যে এসব কোন বদলোকের মতলববাজী। হিংসের জ্বালায় যা মনে এসেছে লিখেছে তারপর সেটা ছাপিয়েছে। মিছিমিছি ছাইভস্ম পড়ে আমি মন ভারী করছি কেন?

যে কাগজখণ্ড পড়ে ললিতার মনে তুফান উঠেছিল সেটা হল একটা সস্তা কেচ্ছা রটনার কাগজের খবর। বেশ কিছুদিন যাবৎ কাগজখানা দেবপট্টণমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারীর নামে অশ্লীল কুৎসা প্রচার করতে লেগেছিল। ললিতা জানত শহরে এইধরনের কয়েকটা নোংরা খবরের কাগজ আছে। ওসব কাগজ পট্টভির পরিবারে ঢুকতে পেত না। ও এসব নোংরামির ওপর খড়্গহস্ত। কোন সুহৃৎ অতি যত্নে কাগজের কাটিংখানা ললিতাকে পাঠিয়েছিল। খবরে লেখা ছিল সীতা হল আসলে পট্টভির প্রণয়িনী। ললিতা মূর্খ তাই সীতাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছে। এইসব মহান চরিত্রবান লোকেরাই ইদানীং এশহরে পৌরপিতা হতে চলেছেন।

কথাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেললেও ললিতা সীতার সঙ্গে আর আগের মত সহজ আচরণ করতে পারে না। তবুও ভোটের দিন কাছাকাছি এসে পড়ায় ললিতা লোক-দেখানো এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল যেন তার প্রবল উৎসাহ! নির্বাচন শেষ হয়ে যাবার পর, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের কৃতজ্ঞচিত্তে বিদেয় করে পট্টভি একটু হালকা হল। আর তখনই খেয়াল হল যে আজ এই আনন্দের মুহূর্তে— ললিতা বা সীতা দুজনের কারোই দেখা নেই! ব্যাপারটা কী? বন্ধুরাও কিছু কিছু কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তাদের কথা মনে পড়ায় পট্টভির দস্তুরমত খারাপ লাগতে থাকে।—

রাত্তির বেলায় ললিতা মৃদুস্বরে কথা পাড়ে। বলে—'যমদূত' কাগজটা পড়েছ নাকি?

পট্টভি চমকে ওঠে। ও তাই বল! ঐ জঞ্জাল কুড়োনো কাগজ কিছু নিশ্চয় লিখেছে, আর তাই পড়েই ললিতার মেজাজ খারাপ!

'আঁস্তাকুড় ঘাঁটা আমার স্বভাব নয়।'

'তুমি না পড়লেও শহরসুদ্ধু লোক তো পড়ে। তারা আমাদের দেখে হাসে।'

'হাসে! কেন?'

'কারণ ঐ কাগজে তোমার নামে খবর ছাপা হয়েছে। পাড়াপড়শি যেচে এসে সেই খবর আমার কানে তুলে যায়। গোটা শহরের লোক সে খবর জানে। এক তুমিই জান না!'

'কাগজটা তোমার কাছে আছে নাকি?'

'আছে।'

পট্টভি রেগে আগুন হয়ে উঠে। রাগ চেপে বলে—'কোথায়? যাও নিয়ে এস। কী লিখেছে দেখি পড়ে।'

ললিতা আলো জ্বালায়। তারপর বাক্স খুলে কাগজের কাটিং এনে স্বামীর হাতে দেয়।

পট্টভি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক নিঃশ্বাসে সবটা পড়ে ফেলে। পড়তে পড়তে তার রক্ত টগবগিয়ে ওঠে, শিরা ফুলে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—'দেশলাই আছে?'

'কী করবে?'

'আনো না।'

ললিতার হাত থেকে দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে একটা কাঠি জ্বেলে পট্টভি সেই জ্বলন্ত কাঠির মুখে কাগজখানা মেলে ধরে। 'একি, পোড়াচ্ছ কেন, পুড়িও না।'

'কেন বলো তো?'

'আদ্ধেকটা পড়া হয়নি।'

'বটে!'—পট্টভি গোটা কাগজখানা ছাই করে দেয়।

'সবটা পোড়াতে বারণ করলুম না। মানা করলে শোন না কেন? আসলে ভেতরে 'কু' থাকলেই লোকে ওরকম করে। বুঝতে পারছি।'

পট্টভি ললিতার গালে জোড়ে চর মারে। বলে—'আমি তোমায় বারণ করিনি এসব নোংরা কাগজ কিনে পড়তে ?'

ললিতার ভ্রম ছুটে যায়। কাঁদতে কাঁদতে বলে—'আমি কিনিনি। ডাকে এসেছে।'

'ডাকে এসেছে— আমায় জানাওনি কেন ? যত্ন করে বাক্সে তুলে রেখেছিলে কেন ? তার মানে, নোংরা ঘাঁটতে তোমার ভাল লাগে ?' ললিতা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাতি নিভিয়ে পট্টভি শুয়ে পড়ে।

ললিতা অনুনয় করে বলে—'আমি অন্যায় করেছি। আমায় ক্ষমা কর।'

'আচ্ছা। আজ থেকে আমায় লুকিয়ে কোন কাজ করবে না। বুঝলে ? এখন চুপচাপ শুয়ে পড়।' পট্টভি বলে।

ললিতা শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। কান্না আসে।

ললিতা ফোঁপানি জুড়ে দেয়।

চুয়াল্লিশ

নির্বাচনী সভায় ওর নামে ইস্তাহার বিলির ব্যাপারটায় সীতা খুবই মুষড়ে পড়েছিল। সে আঘাতটা সামলে উঠতে না উঠতেই আর এক আঘাত এল। সূর্যর চিঠি। সূর্য লিখেছে— সে মাদ্রাজে যেদিন পা দিল, সেইদিনই সুন্দর রাঘবনও অপ্রত্যাশিত ভাবে বিলেত থেকে ফিরে আসে এবং নাটকীয় ভাবে দেখা হয়ে যায়। পড়েই সীতার মনে একটা নাড়া লাগে, খানিক বিস্ময় খানিক আনন্দের নাড়া। এই কটা লাইন পড়েই তার দুঃখের ভার কমে আসছিল। ভাবছিল দয়িত-সকাশে উড়ে যাবে কিনা। কিন্তু তার পরের লাইনগুলো পড়তে পড়তেই উৎসাহ উঠে গেল, হতাশা আর বেদনার জমাট মেঘ আবার ঘিরে ধরল তার মনকে। সূর্য খেদের কথা সংক্ষেপেই সেরে এইভাবে শেষ করেছে :

"...আশা করেছিলাম তোমাদের মনোমালিন্যটা মিটিয়ে দিয়ে দুজনকে আবার মিলিয়ে দিতে পারব। তা সকলি গরল ভেল!... নানান কারণে এখন আর দেশের দিকে ফিরছি না। এখান থেকেই সরাসরি দিল্লী রওনা হচ্ছি।

...সবশেষে একটা কথা বলি। ভাল না লাগলে ক্ষমা কোরো। পট্টভির এই ভোটের চোরাবালিতে পা দেওয়াটা আমার আদৌ পছন্দ হয়নি। তার চেয়েও অপছন্দ হয়েছে এ ব্যাপারে। তোমার ঝাঁপিয়ে পড়াটা। যথাসম্ভব বাড়ি থেকে কম বেরোবে। তোমার ভালর জন্যেই বলছি। এই দুনিয়াটা বড়ই ঈর্ষাপ্রবণ, বড়ই মতলববাজ। এর বেশি আর বলবার কিছু নেই।...'

রাগ আর দুঃখের অবধি থাকে না সীতার। সারা পৃথিবীর ওপরেই

রাগ হয় তার। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব সমান! সবচেয়ে বেশি রাগ হয় তার পরমপ্রিয় আত্মজার ওপর। মেয়ের কাছে বাপই বড় হল, মা ভেসে গেল। বাপের হাত ধরে বাসন্তী কলকাতায় চলে গেল! বাঃ রে··· সূর্যর কথায় রাগের অন্ত থাকে না সীতার। কী নির্লজ্জ দেখ! তাঁর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য মেটাবে তোর এত কিসের গরজ রে? এতদিন বিচ্ছেদের পরেও তার মনের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি, আমার গরজ পড়েছে তাঁর পায়ে গিয়ে নাকখত দিয়ে পড়তে...বয়ে গেছে আমার!

সত্যিই সূর্যটার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে একেবারে। নির্ব্বাচনের ব্যাপারে আমার ঝাঁপ দিয়ে পড়া তাঁর পছন্দ হয়নি। তা পছন্দ হবে কেন? আমি তো তারিণী নই! সে যদি জনসেবার কাজ করে, তাতে সূর্য গলে পড়বেন। একই কাজ আমি করলেই মন্দ! দুনিয়ার লোকের পছন্দ-অপছন্দ বুঝে চলব বলেই আমার জন্ম হয়েছে! তার অপছন্দে কী আসে যায়! আমি মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিলেও অনেকের পছন্দ হয়। তাদের তো আমাকে ভাল লেগেছে? আমার কথা পছন্দ হয়েছে? ব্যস, তাহলেই হল। আমার আর-কিছু চাই না।...

এই ভাবনা নিয়ে সীতা খুশি হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার আশা-ভঙ্গের বেদনার ভার অনেকটা লাঘব হয়ে আসে।

সূর্যর চিঠি সীতা কাউকে দেখাল না। তবে সে যে বাসন্তীকে নিয়ে আসছে না সেটা জানাতেই হল। সীতা ললিতাকে কেবল এইটুকুই জানাল যে রাঘবন বিলেত থেকে ফিরে এসে বাসন্তীকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। তাই সূর্য বাসন্তীকে নিয়ে আসতে পারেনি। অকথিত বাকি সংবাদটুকু ললিতা অনুমানেই বুঝে ফেলে সীতাকে আরো বেশি নিবিড় করে ভালবাসতে শুরু করল।

পৌরসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন এগিয়ে এল, ওদিকে সীতার জীবনেও একের পর এক আঘাত আসতে রইল। জীবনটা যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠল তার।

দিল্লী পৌঁছে সূর্য আর একটা চিঠি লিখল।—"তারিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে লিখছি। তার মতে তোমার আর তোমার স্বামীর মধ্যে অন্যের হস্তক্ষেপ করাটা অবাঞ্ছিত হবে। তার ফল ভাল হবে না। তারিণী বলছে তুমি নিজেই কলকাতা চলে যাও, স্বামীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলো। একবার তো তুমি নিজেই এ কথা ভেবেছিলে। বলেছিলে— স্বামীর সঙ্গে দেখা করে বলবে যে যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, এস আমরা সব ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করি। হঠাৎ মাঝখান থেকে সাময়িক কিছু বাধা এসে পড়ায় অনেক সময় চলে গেছে। এখন আবার সেটা বিবেচনা করে দেখ-না, ক্ষতি কী? আমারও মনে হচ্ছে তোমার একবার অবিলম্বে কলকাতা চলে যাওয়াই ভাল হবে। নয়াদিল্লীতে সেই দেওয়ান সাহেব ছিলেন না? তাঁর দুই মেয়ে শুনছি কলকাতায় গেছে। শুনে আমি চিন্তান্বিত!"

চিঠি পড়ে আগুনে ঘিয়ের কলসী উপুড় হল। বটে! এতদূর গড়িয়েছে! উনি একবার মুখে 'এস' বলে ডাকবেন না, আর আমাকে দৌড়ে গিয়ে তাঁর পায়ে গড়াগড়ি খেতে হবে? তাঁর খুশি হয়, তিনি সেই ডাইনীদের গলা জড়িয়ে কাঁদুন গিয়ে, আমার কী বয়ে গেছে? আমি আর সেই নয়া দিল্লীর অবোধ বালিকা সীতা নেই। কারুর পায়ে পড়ে অযথা ক্ষমাভিক্ষা করার আমার কোন দায় পড়েনি···

অধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন সীতার নামে আরো দুটো চিঠি এল। একখানা চিত্রার।

"সখি! তোমায় বড় বুদ্ধিমতী ঠাউরেছিলাম। পাগল না হলে কেউ অমন কথা ভাবে। তোমার স্বামী আজকাল আমাদের প্রতি-বেশী— সামনের বাড়িতেই থাকেন। সকাল সন্ধে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক উন্মাদের মতন বাইরে তাকিয়ে থাকেন এক দৃষ্টে। তাঁর দশা দেখে আমার মন কেমন করে। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে আমার স্বামী তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। একদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গিয়ে তোমার মেয়েকেও দেখে এলাম। ফুলকে হার মানায়

এমন মিষ্টি মেয়ে। কী করে ছেড়ে থাক? ধন্য তুমি!···একদিন বাসন্তী আমার বাড়িতে এসেছিল। কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করে বসলাম: 'তোমার মা কবে আসবেন?' সে চট করে বলল—'মা আর আসবেন না।' আমি বললাম—'কেন?' সে জবাব দিল—'মা বাবাকে ভালবাসেন না।' আমি—'তুমি কাকে ভালবাস?' তোমার মেয়ে বলল—'আমি মা-বাবা দুজনকেই ভালবাসি।' 'কিন্তু তুমি তো এখন বাবার কাছেই থাক। মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?' সে বললে—'খুব দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী করব? বাবা যে একলা! তাঁকে ছেড়ে যাব কী করে?'—শুনে বুকটা মুচড়ে উঠল। হ্যাঁরে সীতা, তোর আপন মেয়ে তো?

"ক'দিন থেকে তোমার স্বামীর ওখানে দুটি ফ্যাসান-ঘেঁষা মেয়ের ঘনঘন আমদানী হচ্ছে। বহুক্ষণ ধরে তোমার বরের সঙ্গে গালগল্প করে ওঠেন তাঁরা। আমার ইনি এটা আবার একেবারেই দেখতে পারেন না। একদিন ইনি তোমার ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—মেয়ে দুটি কে? তিনি বললেন—'দিল্লী থেকে পরিচয়।' ইনি কৌতুক করে জিজ্ঞেস করলেন—'নেহাত পরিচিত তো নয়, বেশ ঘনিষ্ঠই তো মনে হয়।' তাতে তোমার স্বামী বললেন—'ওঁরা ঘনিষ্ঠতা আরো নিবিড় করার প্রয়াসী, আমায় বিয়ের জালে জড়াতে চান।' ইনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—'তা বেশ তো! আপনিই বা কতদিন একা একা থাকবেন? এঁদের একজনকে নাহয় বরণ করে নিন না।' শুনে তোমার স্বামী যা জবাব দিলেন সেটা তোমার শুনে রাখা ভাল। বললেন—'যে-মন্দিরে একদিন দেবী প্রতিষ্ঠা করেছি, সেখানে পেত্নীকে নিয়ে এসে বসাই কী বলে বলুন?'··· বুঝলে?

"থাক ওসব কথা। শুনলাম বাসন্তী কদিন ধরে খুব জ্বরে পড়েছে। ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে বলে— মা আসবে না? তোমার শরীরে দয়ামায়া বলে কোন বস্তু যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে আর দেরী কোরো না, তাড়াতাড়ি করে চলে এস।"

এ চিঠি পড়ে সীতার বুকটা খানখান হয়ে গেল। চিত্রা যা লিখেছে

তাকি সত্যি ? নাকি আমায় নিয়ে যাবার ফন্দি করে বানিয়ে লিখেছে ? তিনি আমাকে 'দেবী' বলেছেন ? সত্যি ?— ভগবান। আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে রেখো। আমি যে পাপ করেছি তার যে-দণ্ড আমায় দাও, আমি রাজি আছি। শুধু এইটুকু কৃপা করো, আমার বাচ্চার কোন ক্ষতি না হয়। চিত্রা সত্যিই লিখুক, মিথ্যেই লিখে থাক্— আমি এই দণ্ডে রওনা হয়ে যাব কলকাতা:। আর একমুহূর্ত দেরী করব না। আজ রাত্তিরেই আমি বিদেয় নেব।

ভাবতে ভাবতে সীতা দ্বিতীয় পত্রটা খুলল। "একটা খবরের কাগজের কাটিং। তুদিন আগে ললিতার নামে যেটা এসেছিল তারই আর একটা কপি। ললিতা পড়বে আর সীতা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে ? তা কি হতে পারে ? উদারচেতা পত্রপ্রেরক তাই আর ক্রুটি রাখেন নি। নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন।

কাগজের কাটিং পড়তে পড়তে সীতার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। অপমানে ক্ষোভে পাগলের মত হয়ে যায়। যদি সেই ত্রেতাযুগের সীতা হত, তবে এখনই মা ধরিত্রীর বুকে ঠাঁই নিত। কিন্তু সে পুণ্য তার কোথায় ?

অকথ্য অপমানের দরুন সাময়িক চিত্তবিক্ষেপ সামলে উঠে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সীতা ভাবতে বসে— ললিতার সাম্প্রতিক আচরণের কারণ তবে এই। তবু তো তাকে অনেক ভাল বলতে হয় যে এত কাণ্ডের পরও সীতাকে থাকতে দিয়েছে ! মনে মনে ললিতাকে অতীতের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর সঙ্গে তুলনা করে সীতা। যতই মিথ্যে হোক, ললিতার চোখে সে তো হেয় হয়ে গেছে ! কী করে তাকে মুখ দেখাবে ? পট্টভিকে ! যাক। তার চেয়ে কাউকে কিছু না বলে এখান থেকে সরে যাওয়াই শ্রেয় ! সেই ভাল... রাত হোক... সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক... তারপর।

নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে হয়তো সীতা ভালমন্দ চিন্তা করে দেখত, কিন্তু এরপর, এখন আর সে অবকাশ তার রইল না। এখন সব দ্বন্দ্ব-সংশয়ের দ্রুত অবসান ঘটিয়ে দিল সে।

বাড়িটা এমন কিছু বড় নয়। তাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বচসা বেধেছে, সেটা শুধু অনুমান কেন, নিজের কানে তার আভাসও পেয়েছে সে। দ্বৈত সংলাপের অনেকখানি তার কানে গেছে। নরকযন্ত্রণা আর কাকে বলে?

সীতার চোখ এখন অশ্রুবাষ্পশূন্য। তার অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বর্তমানে অন্তর্হিত হয়েছে। এখন মনে মনে সে তার আসন্ন কর্মপন্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ছক করে নিয়েছে। তার মন এখন শান্ত, যথার্থ শান্ত।

বাক্সে দু-চারখানি কাপড়, নিজের পয়সাকড়ি যা সম্বল ছিল সব গুছিয়ে তুলে নেয়। টেবিলের দেরাজ খুলে তার চিঠিগুলো বার করে এক এক করে ছিঁড়ে টুকরো করে। এবার ও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়। শুধু গৃহস্থদের ঘুমিয়ে পড়ার প্রতীক্ষা।

একে একে আলো নিবে যায়। সারা বাড়িতে নৈঃশব্দ্য বিরাজ করে। প্রথমে একবার সীতা ইতস্তত করে। একেবারে কাউকে কিছু না বলে চলে যাবে? তার চেয়ে... কাগজ কলম নিয়ে ললিতাকে চিঠি লিখতে বসে। দু-এক লাইন লিখেই বোঝে— লেখাটেখা অসম্ভব। ছিঁড়ে ফেলে। থাক্।... হাতে বাক্স আর পার্স নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আলো নেবায় তারপর পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নেবে যায়।

নিচের বারান্দায় মৃদু নীলচে বাল্‌বের আবছা আলোয় দেয়ালে টাঙানো গান্ধীজির ছবির সামনে সীতা হাত জোর করে দাঁড়ায়। শান্তির মহান দূতের ওষ্ঠে স্মিত হাসির আভা। সীতার দেহে শিহরণ জাগে। সীতার মনে হয় যাত্রার প্রাকমুহূর্তে এ এক পরম শুভক্ষণ। মার কথা মনে পড়ে যায় সীতার। তিনি বলতেন— কলিযুগে গান্ধীজি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অবতার। সেই থেকে সীতার মনে এটা একটা পবিত্র সংস্কারের মত ছাপ এঁকে দিয়েছে। করজোরে সীতা মনে মনে ছবির কাছে প্রার্থনা করে— "বাপুজী! আমায় আশীর্বাদ করো! জীবনে যে নতুন পদক্ষেপ নিতে চলেছি, তুমি সেই পথে আমার

সহায় হও। আমার চিত্তকে দৃঢ় করো। হে করুণাঘন দেবদূত! তোমার প্রসাদ নিয়েই এই দীর্ঘ পথ আমি, একা অসহায় নারী যেন অতিক্রম করতে পারি। চলার পথের বাধা যত দুস্তর হয় হোক, বিঘ্ন যত দুর্জয় হোক, যত বিপত্তি আমার সামনে এসে দাঁড়াক আমি সাহসের সঙ্গে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাই— শুধু কখনো যেন এমন কিছু না করি— যা তোমার অপ্রিয়। প্রতিটি পদক্ষেপে আমি আমার অন্তরকে প্রশ্ন করব— এ কাজ মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদন পাবার উপযুক্ত— কিনা? অন্তরের সায় নিয়ে তবে সে-কাজ করব। অন্তরের সায় না পেলে কিছু করব না।"

আরো একবার পরিপূর্ণ অন্তরে নত হয়ে প্রণাম জানায় সীতা। তারপর দৃঢ় চিত্তে উঠে দাঁড়ায়। মাটি থেকে বাক্সটা তুলে নিয়ে, নিঃশব্দে দরজা খোলে— তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ে— পায়ের শব্দ না করে।

পট্টভিরামণের বাড়ি থেকে রেলস্টেশন আধ মাইল পথ। সীতা স্টেশনের রাস্তা ধরে।

পঁয়তাল্লিশ

কলকাতা মেলের একটা কামরায় বসে সীতা দীর্ঘ দুদিনের পথ অতিক্রম করছে। দুদিন তার কাছে দু'যুগের চেয়ে দীর্ঘ মনে হচ্ছে। কামরায় কলকাতার যাত্রী কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। হাওড়ার বাসিন্দা এক সহযাত্রীর সঙ্গে সীতার পরিচয় হল। আলাপ ক্রমে অন্তরঙ্গতার পর্যায়ে পৌঁছল।

গাড়ি নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া পৌঁছতে পারল না। সকাল থেকেই স্টেশনে স্টেশনে দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। তারা কি বলছিল তা সীতার বোধগম্য হচ্ছিল না। গাড়ির আরোহীদের মধ্যেও বেশ একটা উদ্বেগ উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। তবে মহিলা কামরায় তার কোন ঢেউ এসে লাগেনি। হাওড়ার আগের স্টেশনে অন্য একটি কামরা থেকে একজন দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক নেমে এসে মহিলাদের কামরার জানলার কাছে এসে বললেন—'আপনাদের সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ এ গাড়িতে আছেন কি? কিংবা হাওড়ায় নিতে আসবেন? সাবধানে থাকবেন। শোনা যাচ্ছে কলকাতায় দাঙ্গা হচ্ছে।'

এ কথা শোনার পরও সীতার মনে উদ্বেগের রেখাপাত হল না। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে নামার পর সীতা উপলব্ধি করল তার নিশ্চিন্ততা কত অমূলক!

সেদিন 1946 সালের কলঙ্কিত ষোলোই আগস্ট তারিখ! সেদিন নরকের প্রেত-পিশাচদের নারকীয় উৎসবের আহ্লাদ-তিথি। বালবৃদ্ধবণিতা—পাইকারী মারণযজ্ঞে নির্বিচারে বলি হয়ে যাচ্ছিল। খুনের নেশায় অট্টচীৎকার করে নরপশুর উন্মত্ত পাল কলকাতার

রাস্তায় গর্জন করে বেড়াচ্ছিল। সেই চীৎকারকে শব্দখচিত করে মাঝে মাঝে পাকিস্তানের জয়ধ্বনি উঠছিল।

ট্রেনের কামরায় পরিচিতা সহযাত্রিণীর বাড়ির লোক তাঁকে নিতে স্টেশনে এসেছিল। তাঁরা বললেন কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা হচ্ছে। ফলে হাওড়ার পুল পার হয়ে কেউ ওপারে যেতে পারছে না। ভদ্রমহিলার মুখে সীতা একলা আসছে শু'ন তাঁরা তাকে আমন্ত্রণ জানালেন হাওড়ায় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উঠে, তারপর দাঙ্গা থামলে তখন আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর নিয়ে তবেই যেন সীতা যায়। শুনে সীতার মাথা ঘুরে গেল, ব্যাকুল হৃৎপিণ্ড ফেটে যেতে চাইল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'না, না, যত যাই হোক, আজই, এখনই আমাকে যেতে হবে!' 'তাহলে যান, আমরা তো আপনাকে আটকে রাখতে পারি না।'—হাওড়া-যাত্রীরা জবাব দিল। সীতা দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে কোনমতে হাওড়ার পুল পর্যন্ত গেল। পরক্ষণেই স্টেশনমুখী জনসমুদ্রের এক বিপুল কলস্রোত তাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে এসে স্টেশনের বহির্দ্বারেই আছড়ে ফেলে দিল। হাওড়ার যাত্রীরা তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা সীতাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

অবর্ণনীয় যন্ত্রণা মাথায় নিয়ে হাওড়ায় সীতার দিন কাটল। কেবলই ভাবে—'আঃ একটা দিন আগে কেন এলুম না?' এলে তো এই মহাদুর্যোগের দিনে স্বামী আর কন্যার সঙ্গে একত্র ভাগ্যকে ভাগ করে নিতে পারত। ক্ষণে ক্ষণে পাঁজর ভেঙে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে, হুহুকান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে— কে বলবে তার স্বামী কন্যার কি দশা হচ্ছে?

কলকাতা থেকে প্রতিমুহূর্তে নরহত্যার বীভৎস কাহিনীর খবর পাওয়া যাচ্ছে। সীতার ক্ষতস্থানে সেই খবরের অগ্নিশলাকাগুলো বিদ্ধ হচ্ছে। সীতা শুনছে দুধের বাচ্চাদের আছড়ে মারছে, আগুনে ফেলে ঝলসে ঝলসে মারছে...অব্যক্ত যাতনায় সীতার বুকের অস্থি-পঞ্জর চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তার বাচ্চাটার কথা ভেবে সর্বক্ষণ হুহু করছে মন। কী জানি ভগবান, কেমন আছে। ভাল রেখো

ভগবান। তার বিপদ হয়েছে এ কথা ভাবলে মাথাটা যেন ফেটে যাবে মনে হয়। লক্ষ শপথ উচ্চারণ করে সীতা— এবারকার বিপদটা কেটে গেলে আর কখনো সে মেয়েকে ছেড়ে থাকবে না। কিন্তু মেয়ে তার ভাল আছে তো ? যা ভাগ্য তার।

দিনে রাতে একবিন্দু ঘুম নেই সীতার। কখনো যদি চোখ দুটো জড়িয়ে আসে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস দুঃস্বপ্ন এসে ঘুমকে খানখান করে দেয়। চমকে জেগে ওঠে। যাদের বাড়িতে উঠেছে, তারা ওর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তারা ওকে সবসময় সান্ত্বনা দেয়। সবসময় বোঝায়।

হাওড়া স্টেশন থেকে বালিগঞ্জে অমরনাথের বাড়ি পৌঁছতে পুরো আটদিন লেগে যায় সীতার। এই সাতটা দিনের নরকযন্ত্রণার অবসান হয়।

অমরনাথের বাড়িতে প্রায় শ'খানেক দক্ষিণ-ভারতের বাসিন্দা সপরিবারে আশ্রয় নিয়ে ছিল। এরা সবাই দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা থেকে কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে। সীতা জানতে পারল এদের বেশিরভাগ লোককে বিপদের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছে তার স্বামী সুন্দর রাঘবন। শুনে মনে মনে সীতার আহ্লাদের সীমা রইল না। হাওড়া থাকতেই তার কিছু কিছু কানে গিয়েছিল যে বিপন্ন দক্ষিণভারতীয়দের উদ্ধার কাজে সুন্দর রাঘবন প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং অমরনাথ তার বাড়িকে আশ্রয় শিবিরে পরিণত করেছে। অমরনাথের বাড়ি পৌঁছেই সীতা সবপ্রথমে চিত্রাকে খুঁজে বার করে। তাকে দেখে চিত্রা বলে—'এস মহারানী। সময় হল ? বড় দয়ার শরীর তোমার। যাও স্বামীকে সামলাও। ওপরের ঘরে বিছানায় পড়ে আছেন।'

কম্পিত বক্ষে সীতা বলে— 'কী হয়েছে ? বিছানায় কেন ?'

'খুব অসুখ। 105 ডিগ্রির ওপর জ্বর। ভুল বকছেন। ডাক্তার বলছে টাইফয়েড-নিমোনিয়া। অসুখে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। গত সাতদিনে যা ধকল গেছে।'— চিত্রা বলে।

'কোন বিপদের ভয় নেই তো ? বেঁচে উঠবে তো ?'

'সেটা তোমার আর তোমার মেয়ের ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে। তোমাদের সেবাযত্ন আর শুশ্রূষার ওপরই তাঁর বাঁচা না-বাঁচা নির্ভর করছে— ডাক্তার তাই বলছেন। তোমার মেয়ে বাসন্তী যেমন সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমতী। আর কী কাজের মেয়ে। এই সাতটা দিনে কী সাহায্য করেছে আমার কাজে তা জান ? একটুও ভয়ডর নেই। এখানে বাড়ির সবাই ভয়ে মরছে, আর ওই একরত্তি মেয়ে হাসি খুশি কথাবার্তা দিয়ে যেন সকলের প্রাণ মাতিয়ে রেখেছিল। এমন স্বামী আর এমন মেয়েকে ছেড়ে দেবপট্টণমে কোন্ আক্কেলে পড়েছিলে ?— যাক, আর কথায় কাজ নেই। এসেছ, এবার স্বামীর দেখাশুনো কর। কী বলব ? তোমার মেয়ে তো বাপের কাছ ছেড়ে একদণ্ড নড়বে না। কী সেবা করতেই পারে। অতটুকু মেয়ে একটু বিরক্তি নেই, একটু ক্লান্তি নেই শরীরে। তোমার মেয়ে সেবাযত্নে বাচ্চা নয়, বুড়োদেরও হার মানায়। যাও, ওপরে যাও।'—চিত্রা সীতাকে ওপরে পাঠিয়ে অন্য কাজে চলে যায়।

দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় এক-পা এগোয়, দ্বিধা সংকোচে দু-পা পিছোয়— এমনি করে সীতা একসময়ে ছাতের ঘরে পৌঁছোয়। খোলা জায়গায় বেশ-কিছু লোকের ভিড়, এবং কথাবার্তাও চলছিল। তবে ছাতের ঘরটা একপ্রান্তে। সেখানে বিন্দুমাত্র গোলমাল নেই। সেই ঘরে রাঘবন খাটের ওপর শুয়ে। তার চোখ বোজা। অচৈতন্য অবস্থায় ঠোঁট দুটো নড়ছে। শিয়রে বসে বাসন্তী রুগীর মাথায় বরফের থলি রাখছে।

সন্তর্পণে কপাট খুলে সীতা ভেতরে পা রাখতেই বাসন্তী মুখ তুলে চাইল। তার দৃষ্টিতে ভাবের বিচিত্র বর্ণের সমুদ্র উথলে উঠল। সে দৃষ্টিতে অবর্ণনীয় বিস্ময়, উল্লাস, উৎসাহ, উদ্বেগ, অনুরাগ, অভিমান, ক্ষোভ, রাগ, আক্রোশ— বিচিত্র তরঙ্গের সমাহার। বাসন্তী মৌন হয়ে রইল।

সীতার জিভ স'রল না। দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে খাটের কাছে গেল।

রাঘবনের পায়ে হাত রাখল। একদম ঠাণ্ডা। হাত বাড়িয়ে হাতের তেলো ছুঁয়ে দেখল— হিম। এবার গলার তলায় বুকের ওপর হাত রাখল— আগুন। প্রচণ্ড জ্বরের তাপ। এই ফাঁকে বাসন্তী ক্রমান্বয়ে মা-বাপের মুখের ওপর দৃষ্টিপাত করে যাচ্ছিল। বাসন্তীর সঙ্গে দেখা হলে যা যা বলবে বলে সীতা মনে সাজিয়ে রেখেছিল, তার কিছুই বলা হল না। এটা তার সময় নয়।

'বাসন্তী, আইসব্যাগটা এবার আমার হাতে দাও, তোমার হাত ব্যথা করবে।'

'না মা। আমার হাত ব্যঁথা করবে না। আইসব্যাগ ঠিক করে তুমি লাগাতে পারবে না। এমন করে ধরতে হবে যাতে পুরো কপালটায় লাগে।'— দীর্ঘ অদর্শনের পর মায়ের সঙ্গে প্রথম কথা বলল মেয়ে।

'বেশ তো, আমি না পারলে তুমি দেখিয়ে দিও। তুমি তো কাছেই থাকছ।'— সীতা বলে।

এই বলে সীতা বাসন্তীর পাশে বসে তার হাত থেকে আইসব্যাগ নিয়ে রাঘবনের মাথায় দেয়। ধীরে ধীরে বাসন্তীর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বলে— 'মা, আর আমাদের ছেড়ে যাবে না তো?'

সীতার মুখেও হাসি ফোটে। বলে— 'না মা, যাব না। কোনদিনই যেতে চাইনে। দায়ে পড়ে যেতে হয়েছিল। তাই তো তোমরা না ডাকতেই চলে এসেছি।'

'আচ্ছা, আর চলে যেও না।'

'না যাব না।'

'জান মা, কলকাতায় খুব বড় দাঙ্গা হয়ে গেল। লোকে বলছিল কলকাতার সব লোককে মেরে ফেলবে। শুনে আমার খালি একটা কথা মনে হচ্ছিল। কী কথা বল তো।'

—কী জানি? তুমি বলে দাও।

—আমি ভাবছিলুম মরবার আগে যেন তোমায় একবার দেখতে পাই। তোমায় না দেখে মরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। তাই

ঠিক করেছিলুম যদি মরে যাই, তাহলে আত্মা নিয়ে তোমার কাছে চলে যাব আর তোমাকে ভাল করে দেখে আসব।— বাসন্তী বলে।

—ছিঃ ওসব কথা মুখে আনতে নেই মা।— তোমার বাবাকে দেখে ডাক্তার কী বলেছে বাসন্তী? কী রকম জ্বর?

—বলেছে শক্ লেগে জ্বর হয়েছে। খুব শক্ত অসুখ। ভাল করে সেবাশুশ্রূষা করতে হবে!

সবাই তোমার বাবার কাজের প্রশংসা করছে।' কী এত কাজ করেছেন, বলো তো শুনি।

—সে অনেক কাজ মা। বই লেখা যায়। মহাভারতের মতন। একদিনের কথা বলি শোনো। দাঙ্গাবাজেরা একটা বাড়ি ঘিরে ধরে ভয় দেখাচ্ছে— বলছে দরজা খোল, নইলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দোব। বাবা খবর পেয়েই টেলিফোনে সরকারী অফিসারকে ডেকে বলে দিলেন— মুসলমানের বাড়িতে হিন্দুরা হামলা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এসে গেল। বাবা নিজে পুলিসের সঙ্গে গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে এল।

এই সময় রাঘবন বিকারের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠল—'আমাকে ভেবেছ কী? কাছে এসে দেখ একবার। সরাসরি গুলি চালিয়ে দোব। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ— খুন কা বদলা খুন। বুঝেছ? আমায় মহাত্মা গান্ধী পাওনি, হ্যাঁ।' বলতে বলতে উঠে বসতে যায়। সীতা আর বাসন্তী তাকে ধরে আবার শুইয়ে দেয়। রাঘবন তখন রক্তচোখ মেলে সীতার দিকে তাকায়। কিন্তু চিনতে পেরেছে কিনা বোঝা যায় না।

সীতা মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—'প্রভু এই অসুখে যদি ওঁকে চলেই যেতে হয়, তবে অন্ততঃ মরার আগে যেন একবার আমায় চিনতে পারে। যেন এটুকু জেনে যায় যে আমি ফিরে এসেছিলাম, আমি শেষ সময় তার কাছে ছিলাম, তাকে সেবা করেছি···এই একটা বর আমায় দিও ভগবান।'

ভগবান সীতার প্রার্থনা শুনলেন। রাঘবনের জ্বর কমতে লাগল। জ্বরবিকারের ঘোরে চীৎকার করলেও সীতার করস্পর্শে যেন শান্তি পেত। চিত্রা দেখে বলে— 'যাও সীতা, তোমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। ঠিক সময় এসে পড়েছিলে। তোমাদের মা-বেটির সেবায় রাঘবনের প্রাণ ফিরে এসেছে।'—শুনে সীতার চোখ ভিজে উঠল।

অজ্ঞান অবস্থায় রাঘবন সীতাকে চিনতে পারেনি। পরে জ্ঞান ফিরতে সীতাকে দেখে খুবই অবাক হল। তার মুখে আলতো স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে সহজ কথাবার্তা বলতে লাগল। কথায় কথায় সীতার কলকাতায় আসার বৃত্তান্ত জেনে নিল। হাওড়ায় ওর আশ্রয় নেওয়ার কথা শুনে, যাদের বাড়িতে সীতা আশ্রয় পেয়েছিল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর একদিন মেয়ের পুরনো প্রশ্নটাই বাপও একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করল—'তোমার সফর পুরো হয়েছে তো? আর তো কোথাও যাওয়ার দরকার নেই?'

'যাবার দরকার আগেও ছিল না, এখনো নেই।'— সীতা উত্তর দিল।

রাঘবন বলে—'যদি যেতেও হয়, বাসন্তীতে ফেলে যেও না। যেখানেই যাও ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও।'

সীতা বললে— 'বাসন্তীকেও ফেলে যাব না। তার বাবাকেও ফেলে যাব না।'

'আমার চিন্তা কেন?'—রাঘবন জিজ্ঞেস করে।

সীতা এ কথার জবাব দিল না। উদাস চোখ মেলে একবার স্বামীর দিকে তাকাল শুধু।

আর একদিন রাঘবন বললে— 'সীতা, চিত্রা বলছিল এই কলকাতা শহরটা নাকি তোমার খুব ভাল লেগেছে! সত্যি নাকি?'

সীতা উজ্জ্বল মুখে বলে— 'হ্যাঁ, আমার কলকাতায় খুব ভাল লেগেছে। আমি এখানে থাকতে পারলে খুব খুশি হব।'

'আচ্ছা তাহলে তুমি আর বাসন্তী এখানেই থাকো। এখানে তোমাদের সঙ্গীসাথীরও অভাব রইল না। আমার আর এ শহরে মন বসছে না। যে নারকীয় কাণ্ডকারখানা এখানে চোখের উপর দেখেছি, তাতে কলকাতার ওপর থেকে মন উঠে গেছে। এখানে থাকলে আমার মাথার ঠিক থাকে ন.। শরীরটা সেরে উঠলেই ভাবছি চলে যাব।'

'আলাদা থাকার কথা আর মুখে এনো না। তোমার যদি এ শহরে থাকতে মন না চায়, তবে আমিও চাই না থাকতে। তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ। তুমি কোথায় যাবার কথা ভাবছ?'

'ভাবছি পাঞ্জাবে যাব। কিন্তু পাঞ্জাব যদি তোমার পছন্দ না হয়?'

'পছন্দ হবে না কেন? দিল্লী থাকতেই তো আমার পাঞ্জাবে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দেখিনি। লাহোরের শালিমার বাগ। সারা ভারতের সবচেয়ে বড় মসজিদ ওখানেই।'

রাঘবনের মুখটা হঠাৎ ম্লান হয়ে যায়। বলে— 'সীতা, তোমার কাছে একটা মিনতি করছি। আমার সামনে মসজিদের নাম কোরো না। আমার গা কাঁপে।'

পুরনো স্মৃতি সীতার মনকে উতলা করে তোলে। সেই তাজমহল, আকবরের সমাধি দেখতে যাওয়া। তারপরের সব বেদনার দুর্বহ স্মৃতিগুলি! সব একে একে মনে আসে।

'কিছু না ভেবেই বলে ফেলেছিলাম। ঠিক বলেছ। আমারও আর জায়গা দেখার সাধ নেই। তোমাকে আর বাসন্তীকে সবসময় চোখের ওপর দেখতে পাব— এই আমার যথেষ্ট।'

সীতার মুখে এই কথা শুনে রাঘবনের অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অনেক দিন পরে আজ সে এক অমল আনন্দের সন্ধান পেল।

ছেচল্লিশ

ভারত-ইতিহাসের পাতায় 1947 সালের আগস্ট মাস স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। হাজার বছরের ক্রীতদাসত্বের অবসান এই আগস্টের পুণ্যতিথিতে সূচিত হয়েছে। চল্লিশকোটি মানুষ এই মূর্ত স্বাধীনতার অধিকারী হয়েছে। ইণ্ডিয়ান য়ুনিয়নের স্বতন্ত্র পতাকার তলে তারা সমবেত।— ছ'কোটি ভারতবাসী খণ্ডিত ভারতবর্ষের অপরাংশে পাকিস্তানে তাদের স্বাধীন পতাকা প্রোথিত করেছে।

সারাদেশে স্বাধীনতার সমারোহ বিপুল আড়ম্বরে পালিত হল। রাজধানী দিল্লীর ধুমধামের তো কথাই নেই। সেদিন সকালে দিল্লীর নতুন পুরনো দুই অংশেই কোলাহলের অন্ত ছিল না। সেদিন সন্ধেবেলায় সূর্য আর তারিণী দিল্লী নগরীর আলোকময় রূপসজ্জা এবং উৎসব সমারোহ দেখতে চাঁদনিচকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শহরের ঔজ্জ্বল্য তাদের অন্তরেও প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। তাদের মুখে আনন্দের লাবণ্যপ্রকাশ। এই চাঁদনিচকেই পুলিসের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ওদের দুজনকে কতবার বেশ বদলে বেড়াতে হয়েছে। আলোকে এড়িয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে চুরিয়ে। আজ সকল সংশয়ের অবসান। আর লুকোচুরির কোন প্রয়োজন নেই। সূর্যর মাথায় খাদির টুপি, তারিণীর পরনে কমলা রঙের সুন্দর শাড়ি। ওদের মুখে আজ দুজনের কথা— খুশির কথা। ওরা আজ সুখী।

'ভারতের স্বাধীনতা এই জন্মেই দেখতে পেলাম। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী থাকতে পারে এ জীবনে?'— তারিণী বলে।

'আমাদের জীবনে এর চেয়ে বড় আর একটা সৌভাগ্য বাকি আছে এখনো। সেটা আমাদের বিবাহোৎসব।'— সূর্য বলে।

'দেখুন! আকাশের তারাগুলো যেন শহরের দীপাবলীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জ্বলতে চাইছে। তাই না?'— তারিণী বলে।

'বাঃ কী কথার কী জবাব। আমি বলছি, আমাদের যে কথা ছিল ভারত স্বাধীন হবার পর আমরা বিয়ে করব। সেটার বিষয়ে কী বিবেচনা করেছেন, দয়া করে বলবেন কি?'— সূর্য প্রায় অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে।

'এই রাস্তায় একদিন কত লুকোচুরি করে পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে বেড়াতে হয়েছে, মনে আছে? সেদিন আমরা বলেছিলাম মহাত্মা গান্ধী আর মধ্যপন্থী কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা কোনদিন স্বাধীনতা আসবে না। তাঁদের আসনচ্যুত করে সার্বজনিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর সে আন্দোলন চালাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র সোশ্যালিস্ট পার্টির। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই গান্ধীজি আর মধ্যপন্থী নেতারাই দেশের স্বাধীনতা আনলেন।'— তারিণী বলল।

সূর্য বলল— 'সে নিয়ে আর আজ তর্ক করে কী হবে? আধার যাই হোক, ভোজ্যটাই প্রধান। যে পথেই হোক স্বাধীনতা পাওয়া গেছে। আমাদের বিয়ের পথে যে অন্তরায় ছিল, সেটা দূর হয়েছে। এতেই আমি খুশি।

'আপনার কি মনে হচ্ছে সত্যি আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি?'— তারিণী হঠাৎ প্রশ্ন করে।

সূর্য বললে— 'বাঃ আপনার সন্দেহ আছে নাকি? 'গান্ধীজির আত্মশক্তি বিজয়ী হয়েছে' 'ভারত আজাদ হো গয়া!' আর 'পণ্ডিত মাউণ্টব্যাটেন কী জয়।'... শুনছেন না সারাদেশ জয়ধ্বনিতে গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে।'

তারিণী বললে— 'ভারত যদি সত্যি স্বাধীন হত, তাহলে দেশ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল কেন? এ তো স্বাধীন ভারতের স্বেচ্ছাকৃত বিভাজন নয়!'

সূর্য বললে— 'হ্যাঁ, ভারত দুটুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? দুটি বিচ্ছিন্ন খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করুক-না, ক্ষতি কি? ভারত খণ্ডিত হলেও, তার সত্তা বজায় আছে। কেউ তো আর কুড়ুল চালিয়ে আলাদা করেনি। বিহারের ভূমিকম্পের মতন কোন ক্ষতিকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভারত খণ্ডিত হয়নি তো! ভারতভূমি আগেও যেমন ছিল, আজো তেমনি রইল!'

'সেটাতেই আমার সন্দেহ। আমার কেবলই মনে হচ্ছে যেন এক মায়ের দুই অঙ্গ কেটে আলাদা করে দেওয়া হল।'

'আচ্ছা দেশের চিন্তা ছাড়ুন তো এবার। ঢের করা হয়েছে। এবার আমাদের বিয়ের কথা হোক!'

'আমাদের বিয়ে হয় কী করে? ধর্মে আটকাচ্ছে না? আপনি হিন্দু, আমি মুসলমান?'

'এ আবার কী নতুন আপদ রে বাবা! আমাদের আবার আলাদা ধর্ম কী? মানব-ধর্মই আমাদের ধর্ম। এসব কচকচি তো বহুবার হয়ে গেছে। আপনি একসময় মুসলমানী পোশাক পরেছেন বলেই আপনি মুসলমান হয়ে যাবেন?'

'বাঃ কারুর মা-বাবা যদি মুসলমান হয়, তাহলে…'

'আঃ কারুর মা-বাবা মুসলমান হয় তো হোক, তা নিয়ে রজনী-পুরের রাজকন্যের অত দুশ্চিন্তা কেন?'—সূর্য মহা বিরক্ত হয়ে বলে। তারিণী খিলখিল করে হাসতে থাকে।

'মুসলমান সেজে থাকায় যে মাঝে মাঝে কত লাভ দেয়। তা না হলে আর আমায় রজনীপুর রাজবাড়ি থেকে বেড়োতে দিত না। রজনীপুরের রাজা আর রাজমাতা আমাকে রাখবার কম চেষ্টা করেছে? আমি অর্ধেক রাজত্ব চাইলে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে রাজি হয়ে যেত। কিন্তু ওরা সব সহ্য করতে পারে, আমার মুসলমান হওয়া সহ্য করতে পারে না। আমি মুসলমান মেয়ে জেনেই ওরা চলে আসতে দিল। আজ যদি আমি বলি, আমি মুসলমান নই, হিন্দু—

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে আমি রজনীপুরের রাজপ্রাসাদে রানী হয়ে বসতে পারি।'

'কোন দরকার নেই। আপনি দয়া করে এই অভাগার হৃদয়-সাম্রাজ্যের রানী হয়ে থাকুন— সেই-ই যথেষ্ট!— আমাদের বিয়ের পরেই—'

'আচ্ছা সূর্য! লজ্জা বলে কোন বস্তু নেই আপনার শরীরে? হাজার হাজার লোকের সামনে বিয়ের কথা— ভালবাসার কথা বলতে হয়?'—তারিণী রাগ করে।

ওরা কথা বলতে বলতে টাউনহলের পেছনের ফুলবাগানে শ্বেত-পাথরের বেদীতে বসে।

আগের কথার জের টেনে সূর্য আবেশভরে বলে— 'তারিণী! আমার বড় সাধ ছিল, সত্যিসত্যিই হাজার হাজার লোকের মুখে আমাদের বিয়ের কথা ফিরবে। একান্তে বসে এর আগে তো কতবারই আমরা এ কথা বলাবলি করেছি। শুধু স্থির ছিল ভারতের স্বাধীনতার পরই আমাদের বিয়ে হবে।'

তারিণী বলে— 'আপনার একটু ভুল হচ্ছে। স্থির করা হয়েছিল ভারত স্বাধীন হবার পরই আমরা আমাদের বিবাহের ব্যাপারে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেব। এখনো আমার মনস্থির হয়নি। মনে হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতাটা একটু শীগ্যির এসে গেছে।'

সূর্য বলে— 'সে দোষটা আমার নয় গান্ধীজির। তা সে ব্যাপারে আমার তো কিছু করবার নেই। এ ছাড়া আর কিছু বাধা আছে যা আমাদের বিয়ের প্রতিবন্ধক?'

'হ্যাঁ, আরো একটা বাধা আছে। আমি আমার মা-বাবার বিষয়ে পুরোপুরি না জানা পর্যন্ত বিয়ে করতে পারব না।'

'আপনি রজনীপুরের রাজার মেয়ে!'

'আমি নিশ্চিত নই। বড়রানী তাই বলেছেন। কিন্তু রাজিয়া বেগম তো আগে সেটা স্বীকার করেনি। এখন বলছে বটে সেটাই

সত্যি। কিন্তু আমার মন বলছে— আমি কোন দিশী রাজ্যের রাজার মেয়ে হতে পারি না।'

'যাক। এতক্ষণে আমার মনের বোঝা নেবে গেল। আমার অভিজ্ঞতায় বলে আপনার মন সবসময় সত্যি বলে। তাহলে এটাও নির্ঘাত সত্যি হবে। আমার তো মনে হয়।'

'জানেন সূর্য, মাঝে মাঝে আমি বিচিত্র সব খেয়ালে ভুগি। 'আমি' বলে ভুল করে সীতাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে শুনেই আমি রজনী-পুরে ছুটলাম সীতার খবর নিতে। ওরা সবাই বললে— আমার চেহারার সঙ্গে তার নাকি আশ্চর্য সাদৃশ্য। তাই ওদের ভ্রম হয়েছিল। আমার তো এ কথা কখনো মনে হয়নি। এটা কি সত্যি? এরকম চেহারার মিল থাকলে তার নিশ্চয় কোন কারণ আছে। কী কারণ? অনুমান করতে পারেন?'— তারিণী জিজ্ঞেস করে।

সূর্য নতুন করে ভাবতে বসে। সত্যিই তো। কেমন করে এটা সম্ভব হল? তবে কি এই ভ্রান্তির মধ্যেই তারিণীর জীবন-রহস্যের সূত্র লুকোনো আছে? কী রহস্য?... সূর্য ভাবে। ভেবে কিছু পায় না। খানিকক্ষণ দুজনেই মৌন থাকে। তারপর তারিণী বলে— 'সীতা আর রাঘবন আজকাল সুখে ঘরকন্যা করছে। শুনে বেজায় আনন্দ হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। কিন্তু তুমি ওদের খবর জানলে কী করে? এমন বলছ যেন ওদের নিজের চোখে দেখে এসেছ।'

'হ্যাঁ, দেখে এসেছি তো। পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম তো।'

'তাই নাকি? কবে? কিছু বল নি তো? সীতা তাহলে সুখে আছে?'— সূর্য কৌতূহল প্রকাশ করে।

'ও বাবা। সীতার নাম শুনেই যে আহ্লাদে আটখানা। কী ব্যাপার?' তারিণী ভ্রূকুটি করে।

'সে ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আমার চেয়ে ঢের বেশি। আমি এখনো তাকে দেখতে যেতে পারিনি। তুমি তো দেখে এলে!

'সত্যি। সীতার জন্যে আমার এত টান কেন— ভেবে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই।'—তারিণী বলে।

'সত্যি সত্যি সীতার টানেই তুমি এবার পাঞ্জাবে গিয়েছিলে নাকি?'

'তা নয়। পাঞ্জাবে যখন যাচ্ছি তখন তাদের দেখতে যাবার কথা আমার মনেও হয়নি। এবছরের গোড়ায় আমি রিসার্চের কাজটা আবার শুরু করেছি। আমার এক বান্ধবীকে নিয়ে রাওলপিণ্ডির কাছে তক্ষশিলায় গিয়েছিলুম। বিচিত্র বিস্ময়ে ভরা জায়গা। ওখানকার ওপরেই মোটা বই লেখা যায়। ফেরার পথে হোশংগাবাদ হয়ে আসতে হল। ঐ পথে আসছি, তখন আর দেখা না করে আসতে মন চাইল না। বড় আনন্দে আছে ওরা। সীতার মেয়েটার গাল দুটো কাশ্মীরের গোলাপ পাপড়িকেও হার মানায়। বাচ্চাটাকে ভুলতে পারছি না। সীতার শরীরও বেশ ভাল হয়েছে।'

'সুন্দর রাঘবনের স্বাস্থ্যেরও বেশ উন্নতি হয়েছে। গত বছর যে যমের দোর থেকে ফিরে এসেছে— তার চিহ্নও নেই?'

তারিণী অবাক হল। বললে— 'তুমি দেখেছ নাকি? কবে? কোথায়?'

'আজই। এখানেই।'

'এখানে? এই দিল্লীতে! একলাই? না সীতাও সঙ্গে ছিল?'

'একলাই। বললে চাকরীর ব্যাপারে তদ্বির করতে এসেছে। সীতাকে সঙ্গে আনেনি। পুরনো সরকারী চাকরীর লোভ আবার মাথায় চাড়া দিয়েছে। এবার দিল্লীতে স্বাধীন সরকার হবে তো? তদ্বির করে যদি পুরনো চাকরীটা আবার পাওয়া যায়। সেই চেষ্টায় এখানে এক সপ্তাহ কাটাতে এসেছিল।'

'কী সর্বনাশ! দুদিন থেকে আমার খালি সীতার কথা মনে পড়ছে। এখন বুঝছি তার কারণ। সূর্য! রাঘবন কোথায় উঠেছে জান? আমি এখনই দেখা করব তার সঙ্গে।'

'তার সঙ্গে দেখা করবে কী করে? তার চাকরীর কাগজপত্র

আনতে সে তো আজ সকালের গাড়িতেই কলকাতা চলে গেছে। —কী হল তারিণী। এত উতলা হচ্ছ কেন ?'

'আমি জানি না। কিন্তু আমার মন বলছে। সীতা একলা আছে তার নিশ্চয়ই কিছু বিপদ ঘটবে। তাকে বাঁচাতে হবে সূর্য। আমাদের আজই যেতে হবে।'

'এ কী পাগলামি !'

'পাগলামি নয় সূর্য। আমি দাঙ্গার সময় পাঞ্জাবে ছিলাম। সে নারকীয় কাণ্ড আমার মনে আছে। মনে করলে এখনো বুক কাঁপে। যারা রাওলপিণ্ডি ছেড়ে চলে এসেছে তারাই বলেছে— পাঞ্জাবের সর্বত্র দাঙ্গা বাধবে। অনেকেই তাই এদিকে চলে এসেছে।'

সেরকম কিছু হলে কি রাঘবন সীতাদের একলা রেখে আসত ? ও নিশ্চয় জানতে পারত।'—সূর্য বলে।

তারিণী বলে— তুমি আমায় পাগল বলছিলে। আসল পাগল সে। তার এক অদ্ভুত ধারণা যে শিখেদের কোন বিপদ হতে পারে না। সেই কথা ভেবে তিনি শিখেদের পাড়ায় বাসা নিয়েছেন। তার সেটা ভয়ানক ভুল ধারণা।—সূর্য। আমি আর দেরী করতে পারব না। তুমি কি যাবে ? না একলাই যাব !' তারিণী আর দাঁড়ায় না। হাঁটতে থাকে।

সূর্য বললে—'তুমি নরকে গেলেও আমি তোমার সঙ্গে যাব— সে তো জানই। কিন্তু সীতার ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করাটা আর উচিত হবে কিনা, সেটা মনে হয় একবার ভেবে দেখা দরকার। কারণ এর আগে যখনই আমরা সীতার বিষয়ে কিছু করতে গেছি— ফল হয়েছে বিপরীত, তাতে সীতারই কষ্ট বেড়েছে !'

'কী জানি। হয়তো সেইসব ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ এসেছে এবার।'—তারিণী চলার বেগ বাড়িয়ে দেয়। সূর্যও তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

সাতচল্লিশ

এখন প্রায় মধ্যরাত। সীতা হাতে 'ট্রিবিউন' পত্রিকা নিয়ে বসে আছে। খানিক পড়া, খানিক ভাবা, আবার খানিক পড়ে নেওয়া, মাঝে একবার ঘড়ি দেখা--- এই ভাবেই চলছে। সীতার অভ্যেস— রাত্তিরে ঘুম না এলে একখানা বই কিংবা খবরের কাগজ হাতে করে বসা, আর তার ঘুমের এই অভ্যেস যে তাকে পড়তে না দিয়ে ঘায়েল করা। আজ কিন্তু অনেকক্ষণ অব্দি পত্রিকার পাতা উলটেও ঘুমকে ডেকে আনা যাচ্ছে না। নানান কারণে সীতার মন আজ উদ্বিগ্ন।

হোশংগাবাদের এক প্রান্তে সীতার বাসা। বাড়ির চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হাতার মধ্যে ছোট্ট ফুলবাগান। ছাতের ওপর সীতার নিজের ঘর। সীতা ঘরে একাই বসে আছে। পাশের খাটে বাসন্তী ঘুমোচ্ছে। যে-শিখ দারোয়ানটি পাহারায় থাকে, সে রোজ রাত আটটায় বাড়ি চলে যায় খেতে, ফিরে আসতে নটা সাড়ে নটা বাজে। আজ যে কেন ফিরল না কে জানে। কাগজের ছাপা খবরের সঙ্গে তার ফিরে না আসার কোন সম্পর্ক নেই তো? ঘুমন্ত মেয়ের দিকে চোখ পড়ে সীতার। মেয়ের দুটো গাল আপেলের মত টুকটুক করছে। পাঞ্জাবে আসার পর এই এক বছরের ভেতর শরীর স্বাস্থ্য সুন্দর হয়ে উঠেছে বাসন্তীর। বাসন্তী গভীরে ঘুমোচ্ছে। চোখের সুন্দর পল্লব দুটি বোজানো। সীতা চেয়ে চেয়ে দেখে।

এদেশের প্রকৃতির রূপ অনির্বচনীয়। সীতা ভাবে, আমাদের দেশেও বসন্ত ঋতুর স্তুতিবর্ণনা আছে। কিন্তু তার বেশির ভাগই পুঁথির পাতায়। বসন্তের এমন নয়ন ভোলানো বাহার সেখানে কোথায়? এখানে ঠিক ফেব্রুয়ারি মাসের পনেরো তারিখ পড়লেই

বসন্তের অনুপম জন্মতিথির লাবণ্য উৎসব দেখা যাবে। একদিন আগেও ডালগুলো রিক্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ রাতারাতি তাতে রঙিন কিশলয়ের ছোপ ধরবে। রক্তিম আভায় ঘেরা কচি সবুজ পাতারা আসবে। তারপর শুধুই চোখ জুড়োনো সবুজ, ঢালাও সবুজের মেলা— যেদিকে তাকাও।

যেসব জমি রুক্ষ উষর বলে ফেব্রুয়ারি চোদ্দ তারিখেও তুমি চোখ তুলে তাকাওনি, আজ একবার তার দিকে তাকাও দেখি। ছোট ছোট হলুদ রঙের মনকাড়া ফুলে মাঠটা যেন ফুলশয্যা হয়ে রয়েছে। প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল— ঐ কেবল দেখার জিনিস, চোখভরে খালি দেখ! প্রকৃতির এই হঠাৎ হাসির রঙের কি অনুবাদ করা যায়? এমন সুরম্য লোক ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবার কথা কেউ ভাবে? পাঞ্জাব আসার পর থেকে বিগত দশটা মাস সীতার জীবনটা শুধু অবিমিশ্র আনন্দের। গল্প নয়, গুজব নয়; ঈর্ষা নয়, দ্বেষ নয়; মদ নয়, মাৎসর্য নয়; বন্ধু নয়, শত্রু নয়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ স্বরাট আনন্দে ভরাট জীবন। শুধু সে আর তার স্বামী, আর তার মেয়ে আর তার পাখির কাকলির মত কথা! দুনিয়ায় এর বাড়া কোন সম্পদে তার প্রয়োজন নেই, আসক্তি নেই।

কিন্তু ভাগ্যে এই আনন্দঘন জীবনের আস্বাদ আর কতদিন স্থায়ী হবে কে জানে? আবার যদি সেই গোমড়ামুখো দিল্লী শহরে ফিরে যেতে হয়? স্বামীর মাথায় আবার সরকারী চাকরীর ভূত চেপেছে। কেন কে জানে? যাই বল, পুরুষ জাতটার সবই বিচিত্র। ঘরে সুখ আর শান্তির সাম্রাজ্য থাকলেও তাকে পর্যাপ্ত ভাবে না। শোরগোল, ভিড়ভাট্টা, ঠাটঠমক আর ক্ষমতার আড়ম্বর এ না হলে যেন জীবন হয় না—হামেশাই সেই জৌলুসের পেছনে ছুটোছুটি। নইলে পাঞ্জাবে এসে নতুন নতুন তাঁর যেরকম উৎসাহ ছিল, তা কোথায় হারিয়ে গেল? হাসিখুশি আর খেলাধুলো ক্রমেই কমে গেল কেন?

হঠাৎ দিন দশেক আগে এক বিস্ফোরণ।

'সীতা! সামনের পনেরোই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পাচ্ছে। আমার চাকরী চলে গিয়েছিল তো এই অপরাধে যে আমি বাড়িতে বিপ্লবীদের জায়গা দিয়েছিলুম! এবার আমার চাকরীটা ফিরে পাব। সীতা, তোমায় একটা মনের কথা বলি। যতই বল, সরকারী চাকরীর কাছে কোম্পানির চাকরী কিছুই না। তাতে যদি মাইনে হাজার টাকা কমও পাই, তবুও সরকারী চাকরীতে যে-আরাম, যে-মজা তা আর কোন চাকরীতে নেই। বুঝলে?'

—সুন্দর রাঘবন বলেছিল।

'তা তো বটেই।' সীতা বলে, 'পেলে কে ছাড়ে?'

'তা সরকারী চাকরী তো আর খুঁজে পেতে তোমার দোরে আসবে না? আমাকেই যেতে হবে তার খোঁজে। দিল্লী গিয়ে তার জন্যে দরবার করতে হবে। আর এখনই হচ্ছে যাবার উপযুক্ত সময়। এখনই গেলে কাজ হবে। ঘুরে আসতে দিন দশ-পনেরো লাগবে।'—রাঘবন জবাব দেয়।

রাঘবন দিল্লী যাবার দিন দুই পরে ভামা একদিন অপ্রত্যাশিত এসে হাজির। একসময় সীতার তার উপর খুব রাগ ছিল। আজ আর সীতার মনে রাগ-উত্তাপ, ঈর্ষাদ্বেষের ছিটেফোঁটাও নেই। কখনো যদি রাগ হয়ে যায়, তখনই তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে—দেবপট্টণমে মহাত্মা গান্ধীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে যে-প্রতিজ্ঞা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার রাগ পড়ে যায়, অন্তর জুড়ে শান্তি নেমে আসে। আজ তাই ভামাকে আন্তরিত প্রীতি নিয়ে স্বাগত জানাল। ভামাও আর সেদিনের ভামা নেই। তার স্বভাবে আমূল পরিবর্তন এসেছে। দেখে সীতা খুব খুশি হল।

ভামার কথায় রাঘবনের দিল্লী যাবার আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ জানা গেল। রাঘবন যে কোম্পানিতে কাজ করত, তারা পাঞ্জাব থেকে কারবার গুটিয়ে ফেলার আয়োজন করছে। কারণ পাঞ্জাব পাকিস্তানে চলে গেলে তখন ব্যাবসার প্রসারের সুযোগ কমে যাবে।

লাহোরে কোম্পানীর ব্যবসায়িক স্বার্থের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার উদ্দেশ্য ভামার পিতা লাহোরে এসেছেন। ভামাও তাঁর সঙ্গে এসেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে রাঘবন নিজের ব্যাপারে কী ভাবছে, সেইটা জানার জন্যেই ভামা হোশংগাবাদে এসেছে।

ভামা সীতার সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে গেল। পাঞ্জাবের এইরকম গুরুতর পরিস্থিতিতে সীতাদের এভাবে একলা ফেলে যাওয়ায় ভামা রাঘবনের বিরুদ্ধে অনুযোগ করল। সীতাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল। সীতা তাতে রাজি হল না। তখন রাঘবন না ফেরা পর্যন্ত নিজেই সীতার এখানে থেকে যাবে ঠিক করল। কিন্তু আগস্ট মাসের পনেরো তারিখে ভামা চলে গেল। বললে, এরপর বাবা চিন্তা করবেন। আর আমি থাকতে পারব না।

ভামা চলে যাবার পর সীতা তার একাকীত্বটা যেন বেশি করে অনুভব করতে লাগল। ভামার যাবার পর আরো চারটে দিন কেটে গেল। রাঘবনের কোন চিঠিপত্রও আসে না। এখন সীতা ভাবে, তখন জেদ করে রাঘবনের সঙ্গে চলে গেলেই ভাল হত। অন্ততঃ জোর করে ভামাকে আটকে রাখা উচিত ছিল। পত্রিকার খবরগুলো পড়লে অবস্থাটা আরো ভয়াবহ মনে হয়। কবে যে কোথায় কী হবে, কে বলতে পারে? কাগজে বলছে সমগ্র পাঞ্জাবে দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে। তার মানে কী? আলো নিবিয়ে সীতা যখন শুতে গেল ঘড়িতে তখন রাত বারোটা। ঢং ঢং করে বারোটা ঘণ্টা বাজিয়ে ঘড়ি নিস্তব্ধ হল। সেই নিস্তব্ধতা সারা বাড়িতে ছেয়ে রইল। কিন্তু তার আয়ু মিনিট খানেকের। ব্যস। তারপরেই বহুদূরে কোথাও থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। আওয়াজটা বাড়তে রইল। শুধু বাড়ছে না, মনে হচ্ছে দূর থেকে ক্রমেই কাছে আসছে। সমুদ্রের ঢেউভাঙার মত শব্দ। ছিঃ ছিঃ আবার সেই ভ্রম। তবে কি সেই পুরোনো রোগটা আবার দেখা দিল নাকি? গত পাঁচ'ছ মাস থেকেই তার প্রায়ই এরকম হচ্ছে— কানে যেন সাগর-

কল্লোলের শব্দ ভেসে আসে। তাহলে রাঘবন তো ঠিকই বলে, কানে বোধহয় কোন অসুখই হল!

আওয়াজটা বেড়েই চলেছে। কানের ভুলটা দূর করার জন্যে সীতা বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। রাত্তিরে সারা শহর বিজলী আলোয় ভেসে যায়। আজ কিন্তু, আশ্চর্য। কোথাও একটা আলো জ্বলছে না। সব অন্ধকার! হয়তো কারেণ্ট নেই।

কোথাও একটা বিউগলের শব্দ শোনা হল। তার প্রতিধ্বনি করে আরও একটা বিউগল বেজে উঠল। দূরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।—ডুম ডুম করে—কোথাও থেকে নাকাড়া বাজার শব্দ ওঠে।

সীতা আচম্বিতে কেঁপে ওঠে। কেঁপে উঠেই লজ্জা পায়। ছিঃ এ কীরকম অহেতুক ভয় পাওয়া? পুলিস বিগ্‌ল বাজাবে না? কুকুর ডাকবে না। কোথায় শিখদের গুরুদ্বারে নাকাড়া বাজছে তাতে ওর বুক কাঁপার কী হয়েছে!

হঠাৎ একটা অযৌক্তিক আতঙ্কে সীতার মনে ভর করে। ওর মনে হয় যেন দুটো চোখ অলক্ষ্যে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে তাকাচ্ছে। ঘরের ভেতরে না বাইরে! সীতা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়।

'আজ কি আমার মাথাটা কাজ করছে না? বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়ে যাচ্ছে? এসব পাগলামির লক্ষণ নয় তো? আর এ মানুষ যে কবে ফিরবে।' জানলা থেকে সরে আসে সীতা। বিছানায় বসে। শুয়ে শুয়ে মাথার বালিশের পাশে হাতড়ে দেখে। টর্চ আর রিভলভার ঠিক জায়গায় আছে। আজকাল রাঘবনের এই অভ্যেসটা হয়েছে। মাথার শিয়রে টর্চ আর রিভলবার নিয়ে শোওয়া। কখনো বাইরে গেলে সীতাকেও বারবার করে বলে যায় —'টর্চ—পিস্তল নিয়ে শোবে।'

সীতাও সে নির্দেশ যথাযথ পালন করতে ভুলত না। কিন্তু রিভলবার ওর কোন কাজে লাগবে? ওর তো কোন বাইরের শত্রুর নেই!

ও কি! কিসের আওয়াজ? কে যেন ঘরের পাশের গাছটায় চড়ছে—'সর্ সর্' শব্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, কেউ নিশ্চয় গাছে চড়ছে। কে হতে পারে? চোর—ডাকাত? খুনী-গুণ্ডা? না কি শিখ দারোয়ানটা? দারোয়ান গাছে উঠতে যাবে কেন?

যেই উঠুক, লোকটা এবার গাছ বেয়ে ছাতের ওপর লাফিয়ে পড়ল। লাফানোর শব্দ স্পষ্ট শোনা গেছে। এর পর লোকটা কী করবে? বারান্দার দিকের জানালার পাশে ছায়া পড়েছে। মানুষের ছায়া। মিশ কালো একটা ভয়াবহ ছায়ামূর্তি জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। উঃ একলা একটা মেয়ে-মানুষ। বাড়িতে কোন পুরুষ না থাকলে বাস করা যে কী বিপজ্জনক। আজকে কোনমতে বেঁচে গেলে আর কখনো এমন ভুল করবে না। কিন্তু আজ বাঁচবে কেমন করে?

সীতার বুকটা এত জোরে ধক্‌ধক্ করছে যে কানে জলকল্লোলের মত শোনাচ্ছে। ঘড়ি টিকটিক করছে, হৃৎপিণ্ড ধকধক করছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে যায় সীতার, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপছে···কাঁপা কাঁপা হাতে হাতড়ে হাতড়ে সীতা রিভলভারটা তুলে নেয়।

'—সীতা! সীতা! ওঠো। গোলমাল কোরো না। ওঠো!'—ওর নাম ধরে কেউ ডাকছে।

কে! কার গলা? শুনে যেন রোমাঞ্চ হচ্ছে, কেন?

সীতা এবারে রিভলবার রেখে টর্চ হাতে নিয়ে বোতাম টেপে। জানলার বাইরে বারান্দার ওপরে দাঁড়ানো মূর্তির গায়ে জ্বলন্ত টর্চের শিখা পড়ে।

টর্চের আলোয় ছায়ামূর্তির মুখ দেখে ওর ভয়ের বদলে বিস্ময় জাগে।

দাড়িওয়ালা এই মুসলমানটিকে সীতা এর আগেও দু'-একবার দেখেছে।

'সীতা! আলো নেবাও। দরজা খোলো। বেশি সময় নেই, তাড়াতাড়ি করো।'

সীতা টর্চ নেবাতেই অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকারে ভয়টা আবার পেয়ে বসছে। ভয়ের তোয়াক্কা না করে সীতা জানলার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'দরজা খোলো, সীতা। দরজাটা খোলো শীগ্গির।'—অন্ধকার বারান্দা থেকে তাগাদা।

'আপনি কে? দরজা খুলব কেন? বাড়িতে বেটাছেলে কেউ নেই।'

'জানি। জানি বলেই এসেছি। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?'

'বাবা!'

'হ্যাঁ সীতা। আর আধঘণ্টার মধ্যে এ শহরে নরকের দোর খুলে যাবে। রক্তলোলুপ নরপিশাচেরা আজ রাত্তিরে প্রেত-নৃত্য করবে।'

'ওকি—ও কে?' সীতা আর্তনাদ করে ওঠে।

দেয়ালের আড়াল থেকে একটি নারীমূর্তি বেরিয়ে আসে।

'চেঁচিও না। সব পণ্ড হয়ে যাবে। এ তোমার সৎ মা। উনিও তোমাদের বাঁচাতে এসেছেন।'

নারীকণ্ঠ কর্কশ স্বরে বলে—'না, আমি ওকে বাঁচাতে আসিনি। মুখ্যু অকৃতজ্ঞ মেয়েকে বাঁচাতে আমার বয়ে গেছে। আমি আমার আদরের নাতনীকে নিতে এসেছি। তোমার নির্বোধ মেয়েকে তুমিই বাঁচাও। তুমি আর তোমার মেয়ে বসে বসে কাঁদ গে।—কীরে ছুঁড়ি। দোর খুলবি? নাকি দোব এক-ঘা ছুরির ফলা বসিয়ে?'

সীতার আর চিনতে বাকি থাকে না। দোর খুলতে দেরী করে আর লাভ নেই। সে এখন ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে যে আজ কোন একটা বিশেষ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে এবং সেই বিপদ থেকে

আর তার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যই এদের আসা। ত্রস্ত হাতে দরজার খিল খোলে সীতা। দরজা ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢোকে।

'বাবা একি বেশভূষা আপনার। এমন সময় এখানে…'

তার কথা শেষ হবার আগেই রাজিয়া বেগম বলে—'সময় মানে? বাপের যে কী টান, তা তুই কী বুঝবি? মেয়ের চিন্তায় আজ কতদিন যে ঘুমোয় না, তা কী জানবি? আমায় দিল্লী থেকে টেনে নিয়ে এল। এই লক্ষ্মীছাড়া শহরে কদ্দিন থেকে আস্তানা গেড়ে পড়ে রয়েছি।'

সীতার বাবা বলেন—'গোটা একটা মাস অনর্থক নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক এখন আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। গতকাল পর্যন্ত আমার ধারণা হয়নি যে এইরকম অমানুষিক কাণ্ড সত্যি ঘটতে পারে। কিন্তু ঘটেছে। ঘটছে। পাঞ্জাব জুড়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড হচ্ছে— কাগজের খবর। এই শহরে আর আধঘণ্টার মধ্যে বিভীষিকার রাজত্ব শুরু হবে। সম্ভবতঃ হিন্দু আর শিখদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। তোমাদের বাঁচবার একটা রাস্তাই খোলা আছে— আমাদের সঙ্গে এখনই বেরিয়ে পড়া। প্রথমে মেয়েকে এর সঙ্গে দিয়ে দাও। পরে তুমি…'

'বাবা, আমার মেয়েকে তোমরা নিয়ে যাও। আমি নিতে পারব না। ও যদি আমার খোঁজে আসে, তখন…'

মৌলবী বললেন— পাগলী মেয়ে। সে তো একটা মহামূর্খ। তোদের এইরকম সংকটের সময় একলা ফেলে চলে গেছে। আর এখানে কিছুক্ষণের মধ্যে পৈশাচিক তাণ্ডব শুরু হয়ে যাচ্ছে। সে আসবে কী করে?

এই সময় দূর থেকে ভয়াবহ চীৎকার ভেসে আসে। মশাল হাতে কালো কালো প্রেতমূর্তি এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে দেখা গেল। মৌলবী বললেন—'সীতা! আর একটা মিনিটও দেরী করা চলবে না। শীগ্যির বাসন্তীকে জাগাও।'

সীতাকে তখনো চিন্তান্বিত ও সংশয়গ্রস্ত দেখে বললেন—'সীতা,

আমি তোমার জন্মদাতা বাপ। আর এই যে মহিলা, এ বোধহয় তোমাকে আমার চেয়ে বেশি স্নেহ করে। তুমি আমাদের ওপর ভরসা রাখ। চট করে মেয়েকে তুলে এর সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। দেরী করলে বাঁচাতে পারব না।'

রাজিয়া বেগম বলে—'তুমি আর তোমার বাপ যদি এখান থেকে বেরোতে না পার, আর এখানেই মরে থাক, তবুও আমি যে করে হোক মেয়ের বাপকে খুঁজে বার করে তার হাতে মেয়েকে তুলে দোব। চিন্তা কোরো না।'

বাসন্তী খাটে শুয়ে গাঢ় আরামে ঘুমোচ্ছিল। সীতা আতঙ্কে হিম হয়ে আসা হাতে তার গায়ে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগাল। বাসন্তী তড়বড় করে উঠে বসে। তারপর শঙ্কিত চিত্তে সকলের মুখের দিকে তাকায়।

সীতা বলে—'বাসন্তী, শুনছি বাবার শরীর ভাল নেই। আমাদের শীগ্যিরই দিল্লী রওনা হতে হবে।'

'আচ্ছা মা, আমি এখনই তৈরী হয়ে নিচ্ছি।'—বলে বাসন্তী লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে।

'এসো আমার সোনামণি এস'—রাজিয়া বাসন্তীকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

'ও আপনি? আমি চিনি। একদিন আপেল কিনে দিয়েছেন, আমার কপালে চুমু খেয়েছেন, জান মা?'

'তোমার মনে আছে?'

বাসন্তী বলে—'আপনিও দিল্লী যাবেন?'

রাজিয়া বেগম বলেন—'হ্যাঁ, আমিও দিল্লী যাব।'

সীতা মেয়েকে বলল—'বাসন্তী তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে। মার কথাও শোন। তুমি এই দিদিমার সঙ্গে রেলওয়ে স্টেশনে যাও। আমি ঘর দোর বন্ধ করে দাত্বর সঙ্গে পরে যাব। বুঝলে?'

'বুঝেছি। আমি তো বড় হয়েছি মা; তাই সব বুঝতে পারি। তুমি যে মিথ্যা কথা বলছ তাও আমি বুঝতে পেরেছি। মা, ভুলেও

মিথ্যেকথা বলতে নেই।'—বাসন্তী বলে। সবাই হকচকিয়ে যায়। বাসন্তী বলে—'আমার ঘুম আগেই ভেঙে গেছে। আমি সব কথা শুনেছি।'

'আচ্ছা। তাহলে, তুমি দিদার সঙ্গে যাবে তো?' হ্যাঁ, যাব মা। নিশ্চই যাব। তুমিও যাবে। বাবা যেমন আমাদের একলা ফেলে রেখে গিয়ে ভুল করেছেন, তুমিও তেমনি ভুল করবে যদি এখানে থাকতে চাও।'

রাজিয়া আদর করে বলেন—'ঠিক বলেছ। আমার দাদু কি তোমাদের মতন বেকুব। খাঁটি কথা বলেছে।'

'মা না গেলে আমিও যাব না।'

সীতা তখন মেনে নিতে বাধ্য হয়। বলে—'আচ্ছা যখন আর কোন উপায় নেই। ভগবান যে রাস্তা দেখান। ঠিক আছে আমিও যাব।'

হট্টগোলের আওয়াজটা দূর থেকে ক্রমেই কানের কাছে চলে আসে। মৌলবী সাহেব এবার বাসন্তীকে বলেন—'তুমি ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে বাসন্তী। তুমি তো সব বোঝ। আমরা সবাই একসঙ্গে গেলে তাতে বিপদ আছে। তুমি আর তোমার দিদিমা আগে চলে যাও। মিনিট পনেরো পরে আমি তোমার মাকে নিয়ে আসব।' 'আচ্ছা'—বাসন্তী সম্মতি জানাল। রাজিয়া আর বাসন্তী সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

'বাবা। এখন আমরা কী করব? আমরাও কি যাব?'—সীতা জিজ্ঞেস করে।

'না সীতা। আমাদের যেতে দেরী আছে। এখন কিছুক্ষণ আমায় এখানে থাকতে হবে। সারা শহরে কড়া পাহারা কেউ যেন বেঁচে পালাতে না পারে। যাদের হাতে পাহারার ভার তাদের একজন আমি। আমি এখন নিজের জায়গায় পাহারায় চলে যাব। পিশাচের দল যখন এই বাড়িতে হানা দেবে তখন সে-দলের আগেভাগে থাকব আমি। তখন আমার চালচলন দেখে অবাক

হবে না, ঘাবড়ে যাবে না। আমি তোমায় ছুরি মারতে গেলেও ভয় পেও না। তবে পারলে মূর্ছা যাবার ভান কোরো।'

আততায়ী পিশাচদের পৈশাচিক হল্লা আরো কাছে শোনা যাচ্ছে। ঘরে ঘরে আগুন লেগেছে। অগ্নিকুণ্ডলী আকাশ ছেয়ে ফেলছে। ছায়ামূর্তিদের ছোরা, কুড়ুল শাবল হাতে ছুটে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

'সীতা, আমার সব কথা মনে রাখবে। ভগবান রক্ষা করবেন।' মৌলবী সাহেব জোর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।

সীতা প্রতীক্ষায় বসে রইল। প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত ওকে শূলবিদ্ধ করে চলল। শোরগোল, আর্তনাদ, মৃত্যুযন্ত্রণার চীৎকার।

আগুন, ধোঁয়া, অট্টহাসি, হাহাকার— সব ক্রমশ দূর থেকে এগিয়ে আসছে। কাছে···আরো কাছে···

সীতার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে— বোম্বাইয়ে যে শৈশবসুখের দিনগুলো কেটেছে। মা-বাপের সেই কোলে করে আদর। সেই ছুরাইস্বামী আজ এইরকম হয়ে গেছেন ? বিশ্বাস হয় না।

পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে যায়। সীতা ঠিক ভাবতে পারে না যে এগুলো ওরই জীবনে ঘটেছে। খুব ক্ষিপ্রগতিতে তোলা ছায়াছবির শটের মতন মনে হয়। প্রচণ্ড অট্টকলরব ওর বাড়ির দরজায় ভেঙে পড়ে। পরক্ষণেই কুড়ুলের ঘায়ে দোর ভাঙার শব্দ আসে। অনেক লোক ভেতরে ঢুকে এল। তারা দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। সকলের আগে মৌলবী সাহেব। তাঁর হাতে ধারালো ছুরি ঝকমক করছে। এক লাফ দিয়ে তিনি সীতার সামনে এসে পড়েন। তার গলা টিপে ধরলেন। তারপর তাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে তার গায়ে একটা পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পেছনের লোকদের দিকে তাকিয়ে একটা হুঙ্কার ছাড়লেন— 'খবরদার। এদিকে কেউ আসবে না। এ আমার—।'

তাঁর পেছনে রাক্ষসের দল থমকে থেমে গিয়ে একটু চিন্তায় পড়ে গেল। কেউ হাসল। কেউ টিপ্পনি করল—'বুড়োর রস দেখ।' একজন বুড়োকে ছুরি মারতে এল। তাকে আবার যে ঠেকাবে

সে একবার পা দিয়ে সীতাকে একটু রগড়ে নিল। কিন্তু মৌলবী তার জায়গায় অটল অচল।

ইতিমধ্যে কে যেন 'আগুন আগুন' করে চেঁচিয়ে উঠল।— মৌলবীও গলা ফাটিয়ে 'ভাগো ভাগো পালাও' বলে চীৎকার করে উঠলেন। বাইরে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরে ঢুকছিল। ঘরের ভেতর যারা ছিল তারা প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে পালাল।

নরকের ঘোলা আগুন নগরের প্রতিটি দিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ধোঁয়ার মেঘে আকাশ কালোয় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভূতপ্রেত পিশাচের হো হো হা হা অট্টহাঁসির পরিমণ্ডল ভরে উঠেছিল। তারা তাথৈ নৃত্য করতে করতে বৃদ্ধা নারী আর কচি শিশুদের আগুনের কুণ্ডে ঝলসে মারছিল।

এই প্রমত্ত পিশাচদলের একজন শুধু সীতাকে কাঁধে তুলে গলি ঘুঁজি পার হয়ে চলেছিল। সে একবার চলে, একবার থামে। কোথাও চোরাচোখে চারদিক তাকিয়ে নিয়ে ছুট্ দেয়। কোথাও আবার ঢিমে চালে চলে। কোথাও পাঁচিলের কোণ ঘেঁষে, কোথাও গাছের আড়ালে গুঁড়ি মেরে চলে। এইভাবে বহুদূর হেঁটে আসে লোকটা।

আরো খানিক পরে নরকের সীমানা পার হয়ে যায়। এখন আর আগুনের আঁচ গায়ে লাগছে না। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে লাগছে, শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। বহু দূর থেকে বাতাসে ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছে যমপুরীর অট্টরোল। তবে বুঝি ওরা স্বর্গের দ্বারে এল।

সীতার সংজ্ঞা ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। অনেক চেষ্টায় সে বন্ধ চোখের পল্লব খোলে। তার খোলা চোখের ওপর ঝিলমিলিয়ে ওঠে অগণিত রুপোলি তারা। আহা! এই আকাশপথ দিয়েই বুঝি আমরা স্বর্গে যাব। পুষ্পক রথে বসে আমরা নিসর্গ দেখছি!

খানিক পরে গাড়ির দুলুনি আর ঝাঁকুনিতে সীতার হুঁস ফিরে আসে। সে বুঝতে পারে আমরা স্বর্গে নয়, মর্তেই যাত্রা করছি। ওর সারা দেহে প্রচণ্ড ব্যথা।

'উঃ বাবা রে !'

'সীতা ! ঘুম ভেঙেছে মা ?'

'বাবা, আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ভোর হয়ে আসছে।'

'বাসন্তী। আমার মেয়ে··· ।'

'নিরাপদে থাকবে, নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার বিমাতা অত্যন্ত সমর্থ মেয়ে মানুষ। জীবনে এসব অনেক দেখেছে।'

সীতা কিছুক্ষণ মৌন থাকে। তারপর বলে—'বাবা, আপনি ইসলাম নিলেন কেন ?' তার বাবা চুপ করে থাকেন।

'প্রশ্ন করা যদি ভুল হয়ে থাকে তো ক্ষমা করুন। আমি শুধু জানতে চাই আপনার ভগবৎ বিশ্বাস আছে কি না ? ভগবান বলে কেউ থাকলে মানুষকে তিনি এত কষ্ট দেন কেন ?'

'এরকম দুঃসময়ে ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে অন্তিম সমাধান দিতে পারেন জ্ঞানীরা। আমি তোমার প্রথম প্রশ্নটার বরং জবাব দিতে পারি। ভাবছিলাম কী ভাবে শুরু করব। সীতা, আমি তোমায় আমার কাহিনী ছাড়াও একটা আলাদা কাহিনী শোনাব।'—সীতার বাবা বলেন।

আটচল্লিশ

সড়কের দুধারে ছোট ছোট খেজুর গাছের ঝোপ। একদিকে একটা চাতাল। গাড়ি চালাচ্ছিল যে ছোকরা মৌলবী সাহেব তাকে কী যেন বললেন। সে গাড়িটাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে এনে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চালাতে লাগল। খেজুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু পথ ছিল সেই পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ছেলেটা এক সময়ে সেই চাতালের পেছন দিকে নিয়ে গাড়ি বাঁধল।

ওরা বাপবেটীতে গাড়ি থেকে নামল। মৌলবী সাহেব গাড়ি থেকে কম্বল এনে চাতালে বিছিয়ে মেয়েকে বললেন— 'এখানে বোসো। দিনের বেলাটা আমাদের এখানেই কাটাতে হবে।'

তারপর গাড়ি থেকে জলের পাত্র, আর একটা ছোট বাক্স বার করে এনে বসতে বসতে বললেন— 'সীতা! এই থলিতে জল আর এই কৌটোয় জল আছে। জানি না কতদিন এর ওপর আমাদের জীবন ধারণ করতে হবে।'

সীতা বললে— 'বাবা। এক বছর আগে যখন এ দেশে আসি, তখন জায়গাটা কত ভালই না লেগেছিল। সকলে পরস্পর ভালবাসা নিয়ে বাস করত। কলকাতার নরককাণ্ড দেখে আসার পর আমার আর তোমার জামাইয়ের কাছে এ জায়গাটা স্বর্গের মত মনে হয়েছিল। আর আজ এক বছরের ভেতর কী জায়গা কী হয়ে গেল!'

'লোকে পাগল হয়ে গেছে মা। প্রতিহিংসায় ক্ষেপে গেছে মানুষ। কলকাতার বদলা নোয়াখালিতে নিয়েছে। নোয়াখালির প্রতিশোধ বিহারে। বিহারের প্রতিশোধ এখন পশ্চিম পাঞ্জাবে নিচ্ছে। ভগবান জানেন এর পরিণাম কী? দেশজোড়া এই উন্মাদের মেলায়

একটিমাত্র মহৎ মানুষ সবাইকে প্রেমের পথে চলবার শিক্ষা বিতরণ করছেন। তিনি প্রকৃতই মহাত্মা। তোমার মা বরাবর মহাত্মাজীকে ভক্তি করতেন। তিনি মহাত্মাজীকে ভগবানের অবতার বলে মনে করতেন।'

'আচ্ছা বাবা, আপনি বিরক্ত না হলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। মার সঙ্গে কি আপনার কখনো ভালরকম সম্প্রীতি ছিল?'— সীতা বাপকে জিজ্ঞেস করে।

'এ প্রশ্নে তোমার ওপর একটুও বিরক্ত হইনি সীতা। বরং তিরিশ বছর যাবৎ মনের মধ্যে যে ভারী বোঝা নিয়ে চলছি, সেটা একটু হালকা করার সুযোগ দিলে তুমি। কাউকে না বললে বোঝাটার ভার কমে না। নিজের অপরাধের কথা নিজের মেয়ের কাছে বলা খুবই দুরূহ কাজ। কিন্তু সুযোগ হাত ছেড়ে চলে গেলে আর ফিরবে কিনা কে জানে।'— ভূমিকা করে মৌলবী তার তিরিশ বছরের অতীতকে তুলে ধরলেন।

দুরাইস্বামী আর রাজম্মালের বিয়ের পরে পরেই বোম্বাইয়ে তাদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখে কেটেছিল। দিনের দিন আনন্দ বেড়েই চলেছিল। রাজম্মাল প্রথম সন্তানের মা হতে চলেছিলেন।

সামান্য আয়ের মানুষ দুরাইস্বামী প্রথম দুঃখ কিনলেন 'তিন পাত্তি' তাসের জুয়া খেলার নেশায় পড়ে। জুয়ায় যতই হেরে যান, ততই সব পয়সা ফিরে পাবার নেশায় মত্ত হয়ে ওঠেন। টাকা ধার করে রেসের মাঠে ছোটেন। তাঁর মনে হয় বুদ্ধিবলে কেবল খোয়ানো টাকাই নয় তার সুদসুদ্ধু উশুল করা যাবে ঘোড়ার মাঠে। একবার মোটা টাকা দাঁও মারার পর হাত গুটিয়ে নিলেই চলবে। এই করতে করতে এমন তলিয়ে গেলেন যে আর ভেসে ওঠাই মুশকিল হয়ে পড়ল। এদিকে ঘরে স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। গাড়ি ভাড়া করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পয়সাও পকেটে নেই। এই ভয়ানক দুর্বহ মানসিক অবস্থা নিয়ে স্টেশনে ডিউটি দিচ্ছিলেন। এই সময় রমামণি তার বোনকে নিয়ে স্টেশনে হাজির হয়। তার চোখে জল

দেখে তার বোনের দুঃখময় জীবনের কথা শুনে দুরাইয়ের মন গলে গেল। সেইসঙ্গে তাদের সাহায্য করলে নিজের অবস্থা ফেরার সম্ভাবনাও তাঁর মনে ভেসে ওঠে। সেই ভেবে নিজের স্ত্রীকে যে হাসপাতালে দিয়েছিলেন, সেখানেই গঙ্গাবাইকে ভর্তি করে দিলেন।

স্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে গেলে দুরাইস্বামী রমামণির সঙ্গেও দেখা করে আসতেন কুশল প্রশ্ন করতেন। দৈন্য বিপন্ন দুরাইকে রমামণি মায়ামোহে আবদ্ধ করলেন। দুরাইস্বামীর মন চঞ্চল হল।

একই দিনে রাজম্মাল আর গঙ্গাবাই সন্তান প্রসব করেন। সেদিন রাত্রে দুরাইয়ের ডিউটি ছিল। তাই আসতে পারেন নি। টেলিফোনে খবর নিয়ে জেনেছিলেন রাজম্মালের মেয়ে হয়েছে। শিশু ও প্রসূতি উভয়েই সুস্থ আছে। সকালে ডিউটি শেষ করেই তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে গেলেন। ক্লান্তিতে অবসন্ন থাকলেও রাজাম্মা স্বামীকে দেখে খুশি হয়ে বললেন— 'আমার কথাই ঠিক হয়েছে।'

'কী কথা ?'— দুরাইস্বামী প্রশ্ন করেন।

রাজাম্মা বললেন— 'আমি বলেছিলাম না ছেলে হবে ?'

দুরাইস্বামী অবাক হলেন। ভাবলেন রাজাম্মা ঠাট্টা করছেন। বললেন— 'আশ্চর্য। পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠবে নাকি ? মেয়েটা রাত না পোহাতেই ছেলে হয়ে গেল ?'

'সন্দেহ হয় তো নিজের চোখেই দেখ না'— রাজাম্মা বললেন।

দুরাইস্বামী মশারী তুলে দেখলেন সত্যিই মেয়ে নয় ছেলে। প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলেন। পরে এই বলে মনকে বুঝ দিলেন যে রাত্তিরে যে খবর দিয়েছিল, সে ভুল বলেছিল। রমামণির সঙ্গে দেখা হতে জানলেন গঙ্গাবাইয়ের পুত্রসন্তান হয়েছে। গঙ্গাবাইকেও দুরাইস্বামী হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। তাই সম্ভবতঃ গঙ্গাবাইয়ের খবরটাই রাত্রে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এ তো স্বাভাবিক কথা !

রাজম্মাল আর সন্তানকে নিয়ে দুরাইস্বামী বাড়ি ফিরে গেলেন। কিছুদিন পরেই ছেলেটি মারা গেল। স্বামী-স্ত্রী বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

পুত্রশোক ভোলবার জন্যে তুরাই প্রায়ই গঙ্গাবাইয়ের সন্তানকে দেখে আসতেন। ইতিমধ্যে গঙ্গাবাই মারা গেল। তার মেয়েকে রমামণিই সযত্নে লালন পালন করতে লাগলেন।

এমনি একদিন রমামণির বাড়ি গিয়ে তুরাইস্বামী একটা সাংঘাতিক ধোঁকাবাজির ইতিহাস আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রসবের পরে পরেই রাজম্মা আর গঙ্গাবাইয়ের সন্তান বদলাবদলি করে দেওয়া হয়েছিল। রাজম্মারই মেয়ে হয়েছিল, গঙ্গাবাইয়ের ছেলে।—সেদিন এইসব ব্যাপারেই রমামণির সঙ্গে নার্সের বচসা হচ্ছিল। নার্স বেড়িয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত তুরাইস্বামী লুকিয়ে রইলেন। তারপর ভেতরে এসে রমামণিকে এমন কড়া জেরা করলেন যে সে সব বলে ফেলতে বাধ্য হল। শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলে বলল— 'আমার সমস্ত বাৎসল্য এই মেয়ের ওপর উজাড় করে দিয়েছি। আজ যদি একে কেড়ে নিয়ে যাও তাহলে আমার বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। আমি আত্মঘাতী হব! প্রচুর কান্নাকাটির ফলে তুরাইস্বামীর আর তার কথা না রেখে উপায় রইল না।

'কিন্তু, কিসের উদ্দেশ্যে এতবড় একটা কাজ করলে?'— প্রশ্নের জবাবে রমামণি যা বলল তা এই :

রমামণির বিশ্বাস ছিল যে তার বোনের ছেলেই রজনীপুর এস্টেটের ওয়ারিশ হবে। এতে তার আশঙ্কাও ছিল যে জানতে পারলে কুমন্ত্রী পাকেচক্রে ছেলেটাকে মেরে ফেলতে পারে। তাই সে মতলব করেছিল যে কোনো অজ্ঞাত জায়গায় রেখে ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলে, পরে সময় মতন রহস্য উদ্ঘাটন করা যাবে। কিন্তু গঙ্গাবাই আর তার ছেলে যে মরে যাবে এমন কথা সে ভাবেনি। সবচেয়ে বড় কথা পরের মেয়েকে কোলে নিয়ে সে যে এমন করে ভালবাসার ফাঁদে জড়িয়ে যাবে এটাও সে কল্পনা করতে পারেনি।

তুরাইস্বামী বিবেচনা করে দেখলেন যে মেয়েকে আপাততঃ রমামণির কাছে রাখাই শ্রেয় হবে। কারণ এখন নতুন করে রাজম্মাকে মেয়ে দিয়ে বলা যাবে না যে এ তোমারই মেয়ে। কী কৈফিয়ত

দেবেন ? কী করে সমস্ত ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনাবেন ?··· রমামণির আদরে যত্নে তুরাইস্বামীর নিজের মেয়ে বড় হতে লাগল। তার প্রতি পরিপূর্ণ বাৎসল্য তুরাইস্বামীকে রমামণির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধ্য করল। একদিকে তুরাইস্বামী রমামণির আকর্ষণে জড়িয়ে পড়লেন। ওদিকে রাজম্মালকেও দিনদিন দুঃসহ দুঃখ দিতে বাধ্য হলেন।

'সীতা, তোমার মা রাজম্মার কোলে জন্ম, রমামণির কোলেপিঠে মানুষ হয়ে উঠল তোমার যে দিদি— তারই নাম তারিণী। তুমি তারই ছোট বোন। তোমরা যখন ছোট তখন জীবনে যে সব বিপত্তি আমার ওপর দিয়ে গেছে, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। পৃথিবীতে খুব কম লোকই এমন সব সংকট উত্তীর্ণ হতে পারে। তবু এত বিপত্তি, এত সংকটের মধ্যেও একটা তৃপ্তি ছিল, সন্তোষ ছিল।'— তুরাইস্বামী আয়ার ওরফে মৌলবী সাহেব তাঁর কাহিনীর উপসংহার টানেন।

সীতা ভাবে জীবনের কত অজ্ঞাত গ্রন্থির উন্মোচন হয়নি তার। সেগুলো একে একে খুলে যাচ্ছে। এখন বুঝছে— রজনীপুরের লোকেরা ওকে কেন তারিণী ভেবে ভুল করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন বোঝেনি। আজ বুঝছে রাজমপেট্টাইয়ে ওকে দেখেই কেন সুন্দর রাঘবন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব। তারিণীর সঙ্গে ওর মুখের সাদৃশ্যই এই সব-কিছুর কারণ। তাই তো। তারিণীর অন্তরে সীতার প্রতি এত মমত্ব কেন ? তার কারণও জানা গেল। সীতার মনেও তারিণীর প্রতি অথৈ ভালবাসা প্রায়ই উত্তাল হয়ে উঠত। কিন্তু কোথা থেকে ঈর্ষার কালনাগিনী ফণা তুলে দাঁড়াত।···

'আমার কী নীচ মন। তারিণী দেবীর মত উদার। তার হৃদয় আকাশের মত বিরাট। ভগবানের কৃপায় এই বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আর কি কোনদিন তারিণীর মুখ দেখতে পাব ?'

সীতা তার পিতাকে প্রশ্ন করে— 'বাবা, তারিণী কি সব কথা জানে ?'

'না। আমার মনটা বড় কাপুরুষ। অনেকবার 'বলি বলি' করেও তাকে বলতে পারি নি। সাহস হয় নি। তা ছাড়া রাজিয়াও বারণ করেছিল। বলেছিল— এ রহস্য তাকে জানাবার দরকার নেই।'

'কেন, বাবা?'

'পাগলামি আর কি! ও ভাবে সব জানলে তারিণী আর তাকে ভালবাসতে পারবে না। তা ছাড়া তোমার সৎমার মনে মনে এখনও একটা বাসনা রয়ে গেছে। ও ভাবছে কোনমতে তারিণীকে রজনীপুর রাজত্বের অংশীদার করে যাবে। এদিকে যে দুনিয়া বদলে যাচ্ছে। কদিন পরে রাজত্ব-টাজত্ব কিছুই থাকবে না, সব উবে যাবে— সেকথা তাকে কে বোঝাবে বলো?'

সীতা কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে— 'পিতাজী! আমায় একটা বর দেবেন?'

'বর দেব কীরে, আমি কি ভগবান?'

'তা ভগবান ছাড়া আর কী? মাতাপিতাই মানুষের প্রত্যক্ষ দেবতা। মা চলে গেছেন। আপনি আছেন। আমার চরম সংকটের মুহূর্তেও ভগবানের প্রতীক হয়ে আপনি এলেন মেয়েকে বাঁচাতে। এবারকার এই যাত্রাই যদি অনন্ত যাত্রা হয়, আমি যদি মরে যাই আপনি তারিণীর সঙ্গে দেখা করে বলবেন— বোন হয়ে আমির দিদির প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছি— অন্তর থেকে অনুতপ্ত হয়ে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে গেছি।'

'এসব কী বলছিস তুই পাগলের মতন?'

'আপনি আমায় কথা দিন। আমার আরো কথা আছে। যদি রাস্তায় আমার মৃত্যু হয়, আপনি তারিণীকে খুঁজে বার করে বলবেন— আমার স্বামীর অন্তরে তার স্থান একই রকম রয়ে গেছে। তারিণীকে বলবেন সে যেন রাঘবনকে নিশ্চয় বিয়ে করে। ওরা বিয়ে করে সুখী হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।'

'কী যা-তা বলে যাচ্ছিস, পাগলের মত? এখন দেখছি সব কথা

তোকে বলা আমার অন্যায় হয়েছে। এমন জানলে তোকে আমি কিচ্ছু বলতাম না।'

'বলে যখন ফেলেছেন, আর তো উপায় নেই। এখন আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, তবেই এখান থেকে নড়ব। নইলে নড়ব না।'

'আচ্ছা তাই হবে। আমি কথা দিলে যদি তোমার মন শান্ত হয় তো দিলাম কথা। তবে আমার কথা রাখার কোন প্রয়োজন হবে না। আমরা ফিরে গিয়েই তারিণীর সঙ্গে দেখা করব। তোমার মনের কথা তুমি নিজেই তাকে বোলো— তোমার মন যদি চায়।'— মৌলবী সাহেব বল্লেন।

ঊনপঞ্চাশ

এর পরের সাত-আটদিনের ঘটনাগুলোকে সীতা কিছুতেই তার প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ভাবতে পারে না। কখনো তার মনে হয় এসব পূর্বজন্মের স্মৃতি। কখনো মনে হয় স্বপ্নে দেখা অস্পষ্ট ছবি, কখনো মনে হয় গল্প শুনছে।

প্রতি দিন দিনের বেলায় সীতা আর তার বাপ বনে-জঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে, পাহাড়ের কন্দরে, ভাঙা মসজিদে, পোড়ো বাড়ির ঘরে লুকিয়ে থাকে। অন্ধকার হলে, স্পন্দিত বুকে, সচকিত চোখে ভয়ে ভয়ে বারবার সামনে পেছনে তাকাতে তাকাতে পথ হাঁটে। পথের সর্বত্র আগুনে ঝলসানো পোড়া গ্রাম আর শহরগুলো চোখে পড়ে। কোন কোন বাড়িতে তখনো আগুন জ্বলছে; ধুধু আগুনের হলকা উঠে রাতের অন্ধকারকে দিনের আলোর মত করে তুলছে। এসব রাস্তা অতিক্রম করা কম বিপজ্জনক নয়।

রাত্তিরে সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে কখনো সামনে থেকে পায়ের সাড়া পেলে বুক চমকে ওঠে, পেছনে পায়ের শব্দ পেলে বসে পড়ে। চুপ করে বসে থাকে। কিছু করবার উপায় থাকে না। কখনো বহুলোকের দল বেঁধে ছুটে আসার শব্দ কানে আসে। বাপবেটিতে ছুটে বনের আড়ালে লুকোয়। যারা প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে তাদের পেছনে ছুটে আসে পিশাচের পাল। দূর থেকে নারী আর শিশুদের গগনভেদী আর্তনাদ ওঠে সেইসঙ্গে নরপশুদের বীভৎস উল্লাসের ধ্বনি। তারপর ধীরে ধীরে একসময় সব শব্দ থেমে আসে। তবুও দীর্ঘক্ষণ ধরে সীতার কানে সেই সব আওয়াজের রেশ লেগে থাকে। তার অনর্গল গুঞ্জরণ চলতে থাকে। যেন সমুদ্রের তরঙ্গস্বর। বেদনায়

ব্যাকুল হয়ে ওঠে সীতা, কাতরকণ্ঠে বলে— 'মরণ, আর কেন, এবার এস।'

হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে যায়। পায়ে ফোস্কা পড়ে, রক্ত জমা হয় তারপর পেকে ওঠে।— 'আর এক-পা হাঁটাও অসম্ভব।' পা ছুটো যেন ভেঙে পড়ছে। বাপের কাছে হাতজোর করে কাঁদে, হাত ধরে মিনতি করে— 'বাবা আমায় গুলি করে মেরে ফেল। আর পারছি না।' তারপর সে প্রার্থনা নিষ্ফল বুঝে সকাতরে মৃত্যুকে অনুরোধ জানায়— 'মরণ! এবার এস। আমায় ছুটি দাও।' কেউ আসে না। কেউ সাড়া দেয় না। শুধু ছুকান জুড়ে অবিরল সমুদ্রকল্লোলের শব্দ বাজে— অবিকল সেই শব্দ!

ওরা একটা ছোট রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছোল। অপেক্ষাকক্ষে বসে সীতা ঝিমোয়। কেউ কোন কাজে এসে সে-ঘরে উঁকি মারছে দেখলেই সীতা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। বসে বসে ঢোলে। হঠাৎ ঢেউ ওঠাপড়ার গর্জন কানে যেতে চমকে উঠে দাঁড়ায়। হাত-পা কাঁপতে থাকে। নাঃ রেলগাড়ি আসছে, তারই শব্দ। বাপ আর মেয়ে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ায়। রেলগাড়িতে অকথ্য ভিড়। কামড়াগুলো সব ভেতর থেকে ছিটকিনি আঁটা। কেউ খুলতে চায় না। মৌলবী সাহেব প্রতিটি কামরার দোরে এসে অনুনয় করেন অতিকষ্টে একটা কামরার দরজা খোলাতে সক্ষম হন। ছুজনে গাড়িতে চড়েন। কামরার মধ্যে যাত্রীরা পথে দেখা বীভৎস দৃশ্যের কথা বলাবলি করছে।

একসময় একটা জংশন স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায়। দাঁড়াল তো দাঁড়ালই। আর চলবার নামই করে না। যাত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। স্টেশনের ভেতরে বাইরে তখন লোকে লোকারণ্য।

হঠাৎ মৌলবী বলে উঠলেন— 'ঐ দেখ তারিণী।' বাবার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সীতা দেখল কিছুদূরে সূর্য আর তারিণী ভিড়ের মধ্যে হাঁটছে।

'সীতা, একটু দাঁড়াও। আমি ওদের দেখে আসছি'— বলে

মৌলবী সায়েব গাড়ি থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এর পর আবার প্রতীক্ষা। এক এক পল এক এক যুগের মত বিলম্বিত হয়ে পড়ে। এমনি কয়েক যুগ কেটে যাবার পর শ'খানেক গুণ্ডা ধারাল ছুরি হাতে প্ল্যাটফর্মে হানা দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের বহু লোক রক্তমাখা শরীরে ধরাশায়ী হল। যে দিকে তাকাও শুধু রক্তের ধারা, মাংসের পিণ্ড। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পিশাচদের উন্মত্ত নৃত্য। এবার তাদের কেউ কেউ সীতাদের কামরা লক্ষ্য করে এগিয়ে এল চার-পাঁচজনের একটা দল। ভয়ে ঘৃণায় চোখ বুজে ফেলে সীতা। মনে হল— তার অকুণ্ঠ আহ্বানে মৃত্যু তাহলে সাড়া দিল। হানাদাররা গাড়িতে গাড়িতে উঠে পড়েছে। বন্ধ চোখে এখন কেবল প্রতীক্ষা— এই এল ছুরির আঘাত··· এইবার···! তারপর...।

'সীতা! সীতা!' মৃদুমন্দ মধুর কণ্ঠে কে ওর নাম ধরে ডাকছে। কে যেন কোমল দুটি হাতে তাকে ধরেছে। সীতা এবার চোখ মেলে। তারিণী! তার একটা হাত দিয়ে রক্তের ধারা ঝরছে। 'দিদি!' সীতা চিৎকার করে উঠল।

ঐ তিনদিন সীতার জীবনে আনন্দের দিন। কোন গ্রামে, কোন বাড়ির ছাতের চিলেকোঠায়, সমস্ত জানলা দরজা অর্গলরুদ্ধ করে আলো-বাতাসেরও পথ বন্ধ করে লুকিয়ে থাকার দিনগুলি! ট্রেনের কামরায় অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে পরম যত্নে পরম মমতায় সীতাকে এখানে এনে তুলেছে তারিণী। এই রুদ্ধ কক্ষের নির্জনে বসে সীতা তারিণীকে উভয়ের সম্বন্ধের কথা জানায়। বলে— 'এসব কথা কি তুমি কিছুই জানতে না?'

'না। বহুদিন থেকেই এমনি একটা সন্দেহ আমার বুকের মধ্যে খচখচ করে। কিন্তু হাজার প্রশ্ন করেও, কখনো কারো কাছে থেকে প্রকৃত সত্য জানতে পারিনি।'— তারিণী জবাব দেয়।

'কী অন্যায়! কেন সবাই মিলে এমন করে গোপন করে গেল? আমি যে তোমার আপন বোন— এ কথা না জেনেও তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, নিজের জীবন বিপন্ন করে আমায় বাঁচিয়েছ। যদি সব কথা

জানতে, তবে হয়তো আরো বেশি করে ভালবাসতে পারতে। আমরা দুজনই কত আনন্দে থাকতে পারতাম।'—সীতার এ কথায় তারিণীর অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে। সীতার ঈর্ষার জ্বালা, যা তাকে নিজেকেই দগ্ধ করেছে—সেইসব কথা। কিন্তু সে কথা এখন তোলা যায় না। বলে—'যা হয়ে গেছে, তা চুকে গেছে। সে-সব চিন্তায় এখন কী লাভ? এখন থেকে এস আমরা এখন আনন্দে থাকি, যাতে অতীতের সব ক্ষতিপূরণ হয়।'

এত কিছু ঘটে যাবার পরেও উভয়ের মন থেকে শঙ্কার ভাব ঘোচে না। জাগরণে তারিণীর গলা জড়িয়ে ধরে সীতা অন্তরের কথা উজার করে বলে। শয়নে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়। এখন তার ভয়— তারিণী তাকে ছেড়ে চলে না যায়! এ ভয় তার গভীর মনে বাসা বেঁধে থাকে। যদি চলে যায়। কি হবে তখন!

সীতার এই আশঙ্কা একদিন সত্যি হয়। তারিণীর ছেড়ে চলে যাবার সময় আসে। সীতাও কিছুতে তাকে ছাড়তে চায় না। তারিণী বোঝায়— পেশোয়ারে নিরুপমা আছে। তাকে আনিয়ে নিতে হবে। দিল্লীতে গিয়েই আমি তোমার কাছে যাব। দেরী হবে না। দুইবোনে অনেক কথা কাটাকাটি হল। শেষকালে সীতা বলে বসল— 'তুমি যদি একটা শপথ কর তবেই তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'কী শপথ করতে হবে বল।' তারিণী রাজি হয়।

'যদি পথে কোথাও আমার মৃত্যু হয়, তুমি ওঁকে বিয়ে করবে, কথা দাও।'

'একি পাগলামির কথা সীতা?' তারিণী ওকে অনেক বোঝায়। সীতা অবুঝ। তারিণী যতই অস্বীকার করে, সীতার জেদ ততই বেড়ে যায়। শেষে নিরুপায় হয়ে তারিণী বলে—'ঠিক আছে। তুই যদি আগেই মরে যাস, আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তখন তোর স্বামীর মন বুঝে দেখে নাহয় তাকে বিয়ে করা যাবে।' তারিণী সীতাকে একটা বোরখা দিল। সীতা আপাদমস্তক সেই বোরখায়

নিজেকে মুড়ে নিল। মাঝরাতে মৌলবী সাহেব সীতাকে নিয়ে চিলেকুঠরী থেকে নেমে এলেন। সদরে একখানা জীপগাড়ি তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীপের পাশে দাঁড়িয়েছিল এক পুলিশ ড্রাইভার। সীতা তাব্নিণীকে তার শপথের কথা মনে করিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠল। জীপ তাদের নিয়ে হাওয়ায় উড়ে চলল। পথের বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জীপ চলছে। কোথাও দলব·দ্ধ জনতা রাস্তা আটকে চলেছে— জীপ তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে চলল। কোথাও রাস্তার পাশের গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে রেখেছে। কোথাও জীপ রাস্তা থেকে নেমে মাঠ ময়দান চিরে এগিয়ে চলল।

সড়কে উঠে জীপের তীব্র গতি দেখে সীতার একবার মনে হয়েছিল —তবে বুঝি বিপদ কেটে গেল। কিন্তু পরে বুঝল ভ্রান্ত ধারণা। কারণ— মনে হচ্ছে পেছনে আরো একটা জীপ ধাওয়া করে আসছে। সীতা মনে মনে আবার মরণের নাম জপ করতে থাকে—'মরণরে তু আ··· ।'

ওদের জীপ এবার একটা নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কী আশ্চর্য! সূর্য এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের আগে কী করে এল! আবার নদী পেরোবার জন্য নৌকোও এর মধ্যে ভাড়া করা হয়ে গেছে। বাঃ রে সূর্য। কোন কাজে ত্রুটি রাখে না কিন্তু যাই বল। ওদের বাপ-বেটিকে সূর্যের জিম্মা করে দিয়ে জীপচালক ফিরে যাচ্ছে। তাতে আর সূর্যতে সাংকেতিক ভাষায় কী যেন কথা হল। কী কথা? কিন্তু সেসব কথা জানবার সময় নয় এখন।

সূর্য সীতার হাত ধরে নৌকোয় চড়াল। নৌকো চন্দ্রভাগা নদীর বুক সাঁতরে চলল। নদীর স্রোতে হাওয়ার টানে সীতার বিষাদ ভেঙে যাচ্ছে। তার মনে আবার উৎসাহের জোয়ার লেগেছে। সীতা বোরখা খুলে নৌকার পাটাতনে রেখে দিল। বললে—'বাবা। এই বেশ ছেড়ে আবার আগের মতন হতে পার না?' মৌলবী বলেন '—সীতা, ভুলো না। এই বেশই তোমায় বাঁচিয়েছে।' 'আমরা তাহলে বেঁচেই গেলাম। আর কোন বিপদ নেই তো?'—সীতা প্রশ্ন করে।

নদীর তিনভাগের একভাগ পেরিয়ে গেছে নৌকো। যে পথ দিয়ে ওদের জীপ এসেছিল, সেই পথে ধুলো উড়িয়ে আর-একখানা জীপকে আসতে দেখা গেল। সীতা দেখল জীপ থেকে কে একজন বন্দুক হাতে লাফিয়ে নামল। তারপর ওদের নৌকোকে নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল। হঠাৎ মৌলবীর আর্তনাদ শুনে হতভম্ব সীতা ঘুরে দেখল— বাবার গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি পড়ে যাচ্ছেন। লাফ দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে টলমল নৌকো থেকে সীতা খর-স্রোতে পড়ে গেল।

পঞ্চাশ

শীত কাকে বলে— কেউ যদি জানতে চায় বা অনুভব করতে চায় তাকে শীতের সময় দিল্লীতে গিয়ে থাকতে হবে। মোটা কম্বলের কুর্তা, গদীর মত তুলোর পোষাক, লেপ বালাপোষ সব ভেদ করে দিল্লীর শীত মানুষের মেদমাংস, রক্তমজ্জা সব পেরিয়ে সরাসরি হাড়ে গিয়ে বেঁধবার ক্ষমতা রাখে।

উনিশশো আটচল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসের ঘোর ঠাণ্ডায় দুলক্ষের বেশি মানুষ— দেশ-গ্রাম, ঘর-সংসার আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে এসে শরণার্থী হয়ে দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় গলিঘুঁজিতে খোলা মাঠে কুঁকড়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে, ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে রাত কাটাচ্ছিল। শয্যা বলতে মৃত্তিকা, আচ্ছাদন বলতে আকাশ। তাদের সর্বশরীর ঠাণ্ডায় বিবশ কিন্তু তাদের অন্তরের আগুন ধকধক করে জ্বলছে, রক্ত ফুটছে।

সন্ধে প্রায় সাতটা। যন্তরমন্তরের সড়ক ধরে একটা মোটর কার কুয়াশা চিরে চলেছে। এসময় রাস্তায় বেশি লোক যাতায়াত করে না বলে গাড়ি চালানোয় সতর্কতার প্রয়োজন কম। গাড়ি বেগে চলছে। হঠাৎ একি! একেবারে মাঝ রাস্তায় একজন লোক। হয়েছিল আর-একটু হলে। ব্রেকের কর্কশ শব্দের সঙ্গে ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি থেমে গেল। বদমায়েসগুলো কিছুতেই ফুটপাত ধরে হাঁটবে না। যেন মরবে বলে পণ করেছে এমনভাবে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটবে। পাঞ্জাবের শরণার্থীদের মধ্যেই কেউ হবে। জেনেশুনে গাড়ির সামনে পড়তে চায় যেন।

পড়ে গিয়ে লোকটার কোথাও চোটঘাট লাগল না তো? গাড়ির

আরোহীরা নেবে আসে। রাঘবন আর ভামা। পথচারী ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পরস্পরের আশ্চর্য হবার পালা।

'আরে, এ কি তামাসা? সূর্য! তুমি এখানে? কী ব্যাপার? আমি ভাবি পাঞ্জাবের কোন রিফিউজি বুঝি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে তারপর, যাচ্ছ কোথায়? খুব তাড়াতাড়ি না থাকে আমার সঙ্গে চলো-না। তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।'—রাঘবন বলল।

সূর্য বলল—'জরুরী কাজ কিছু আছে। তা বলে আধ ঘণ্টা দেরী হলে কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না।' রাঘবনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা তারও আছে।

সুন্দর রাঘবনের সেই পুরনো বাড়িটাই। গাড়ি এসে দাঁড়াল। ওদের নামিয়ে দিয়ে ভামা আর ভেতরে গেল না। ওখান থেকেই বিদায় নিল। ওরা ভেতরে গেল। ঘরের ভেতর যেতে যেতে সূর্যর মনটা মুচড়ে ওঠে। পুরনো স্মৃতির বাঁধ ভেঙে বন্যা এসে ওর মনকে ভাসিয়ে দেয়। ওর কষ্ট হতে থাকে।

রাঘবন বলছিল—'সূর্য! শূন্য বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে।' শুনে সূর্যর কান্না আসে। চেষ্টা করে নিজেকে সামলায়। বলে—

'আপনার পুরনো চাকরীটা ফের পেয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। নইলে এ বাড়ি পেলুম কেমন করে?—তুমি কি আজকাল এখানেই আছ? কী করছ?'

'আমি আবার কী করব? এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে বেড়াই।'—সূর্য জবাব দেয়।

'এদিক ওদিক মানে?'

'এই রিফিউজি ক্যাম্পে যাই, সাধ্যমত সাহায্য করি।'

রাঘবন উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—'সূর্য। কোন ক্যাম্পে চেনা-পরিচিতি কাউকে দেখেছ নাকি?'

'চেনাজানা মানে··· কার কথা বলছেন?'

'তারিণী বা বাসন্তী এদের কাউকে···।'

'না মিস্টার রাঘবন। আমিই বরং ওদের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস

করব ভাবছিলাম।'

'মাস দুই আগে একটা অদ্ভুত চিঠি এসেছে। তারিণীর লেখা। লিখছে সে আর বাসন্তী ভাল আছে, নিরাপদে আছে। যতদূর সম্ভব সত্বর এসে দেখা করবে। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার চিঠিটা সীতাকে লেখা। এ থেকে বুঝতে পারছি সীতার ব্যাপারে সে কিছু জানে না।'

'সীতার কী হয়েছে?'—সূর্য জিজ্ঞেস করে।

রাঘবন বললে—'সে এক দুঃখের কাহিনী। পৃথিবীতে আমার মত ভাগ্যহীন লোক তুমি দুটো পাবে না, সূর্য! সীতাকে আমি এবার যে অবস্থায় হারিয়েছি, তার চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য আর কিছু হয় না। আঃ একটা বছর পাঞ্জাবের হোশঙ্গাবাদে আমরা পরমানন্দে জীবন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু ভগবানের সেটা ইচ্ছে নয়। সেবার পনেরোই আগস্ট যখন তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হল না? মনে আছে আমি কলকাতায় চলে গেলাম? সেখান থেকেই শুরু করি—'

রাঘবন যেদিন কলকাতায় পৌঁছোল সেদিন কলকাতায় ধূমধাম করে স্বাধীনতা উৎসব পালন করা হচ্ছে। রাঘবন দেখল হিন্দু-মুসলমান পরস্পর প্রীতি আর সৌহার্দ্যের সঙ্গে আলিঙ্গন করছে। 'জয় হিন্দ' 'বন্দে মাতরম' 'হিন্দু মুসলিম এক হও' ধ্বনিতে কলকাতার আকাশবাতাস ভরে উঠেছে। সে অবাক হয়ে ভাবছিল— এই সেই কলকাতা! একবছর আগে যেখানে হিন্দু মুসলমান একে অপরকে খুন করে শহরকে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল! কলকাতা নগরীর আনন্দ-কলরোল দেখে রাঘবনের ধারণা হয়েছিল ভারতে ভাগ্যোদয় শুরু হয়েছে।

অমরনাথের বাড়িতে তার চাকরী সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র পড়েছিল। সেসবগুলো নিয়ে সে চলে এল। দিল্লী এসে খবর পেল যে পাঞ্জাবে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে। ভামাও ওর সঙ্গে দেখা করে পাঞ্জাবের প্রকৃত অবস্থা ওকে জানায়। শুনেই ও স্থির করে যে করেই হোক যেতে হবে— সীতা আর বাসন্তীর জীবন বিপন্ন!

কিন্তু তখন পাঞ্জাব যাওয়া মানে উন্মত্ত বাঘের গুহায় ঢোকা, আগুন-লাগা গুদামে ঢোকা! ভামার অসম্ভব সাহস, সামর্থ্য আর লোকের সঙ্গে সহজ মেলামেশার প্রবণতা এইসব গুণ রাঘবনের খুব সাহায্যে আসে। ভামার ওপর আগে তার যে একটা বিতৃষ্ণা ছিল, এখন সেটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সত্যি মেয়েদের ভামার মতন সাহসী হওয়া দরকার।

ওরা কোনমতে প্লেনে জায়গা পেয়ে লাহোর পৌঁছায়।

লাহোরের একাংশ জ্বলছিল। সদর রাস্তায়, খোলাখুলি ছুরি চলছে, লাশের পাহাড় জমে উঠছে। শোনা যাচ্ছে আরো ভেতর দিকের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ভাগ্যক্রমে সুন্দর রাঘবন আর ভামার পোশাক আশাক আর চালচলন দেখে লোকে ওদের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কি পার্সী ভেবেছিল বলে ভেতর দিকে যাতায়াত করায় ওদের বিপদের ভয় কম ছিল।

ইংরেজ অফিসারদের কৃপায় ওরা একটা জীপ জোগাড় করে তাইতে হোশঙ্গাবাদ রওনা হয়ে যায়। পথে যেসব ভয়ংকর সাংঘাতিক দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল, তাতে সীতাদের কী দশা হয়েছে ভেবে ওদের রীতিমত উদ্বেগ আশঙ্কা হল। তবু শেষ অবধি একসময় ওরা হোশঙ্গাবাদে পৌঁছল। ওরা যখন গেল, সে সময় শহরে যারা খুন-খারাপির হাত থেকে বেঁচেছিল তাদের সকলকে একজায়গায় জড় করে রাখা হয়েছে। তাদের রক্ষার জন্যে শিখ সৈন্যদের আগমন প্রতীক্ষা করা হচ্ছে। সৈন্যরা এলে তাদের পাহারায় তাদের যাত্রা শুরু হবে। অফিসারদের অনুমতি নিয়ে রাঘবন আর ভামা সেই ভিড়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে দেখল। সীতা বা বাসন্তীকে পাওয়া গেল না।

ওরা দুজনে এরপর সাহস সঞ্চয় করে শহরে ঢুকে পড়ল। প্রথমে ওদের বাড়ির দিকে গেল। আগে যেখানে বাড়ি ছিল, এখন সেখানে ভগ্নস্তূপ। পোড়া দেয়ালগুলো ঝুল কালো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইঁট কয়লা আর ছাইয়ের স্তূপ চারদিকে। রাঘবনের

আর সহ্য হয় না। সেই ভগ্নস্তূপের মাঝখানেই ধপ করে বসে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। জীবনে এই প্রথমবার সে ঐরকম কাঁদল।

ইতিমধ্যে তামাসা দেখার জন্যে সেখানে বহুলোক জড় হয়েছিল। সঙ্গের পুলিস অফিসার তখন জোর দিয়ে বললেন যে এবার আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। ওরা রওনা হবে, এমন সময় একটা ছেলে রাঘবনকে এসে বলল—'সাহেব আপনাকে একটা কথা বলব!

'কী কথা? বলো।'

ছেলেটা বলল ঐ বাড়িতে যে-মেমসাহেব থাকত, সে মরেনি। এক বুড়ো মুসলমান তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সে-ই তাদের গাড়িতে করে পঁউছে এসেছে। তবে মেয়ের কথা সে কিছু জানে না বললে। রাঘবনরা ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে নিল। এক জায়গায় এসে ছেলেটা দেখিয়ে দিল, এইখানে সেই বুড়ো মুসলমান আর মেমসাহেবকে নাবিয়ে দিয়েছে। সে জায়গায় গোরুর গাড়ির চাকার দাগও দেখা গেল। তা ছাড়া একটা ভাঙা কাচের চুড়িও পাওয়া গেল। সেটা সীতারই চুড়ি। তাকে পরতে দেখেছে রাঘবন। এসব দেখে-শুনে রাঘবনের দুঃখ দ্বিগুণ হয়ে উঠল। ক্রমশঃ শোক ক্রোধে রূপান্তরিত হল। তার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। ছেলেটাকে সেখানে নাবিয়ে দিয়ে ওরা চলল। রাস্তায় একটা গ্রামে ওদের থামতে হল। যে বাড়িতে ওরা উঠল সে ভদ্রলোক একজন বিশিষ্ট হিন্দু উকীল। কোম্পানীর চাকরীতে থাকার সময় রাঘবনের তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে অঞ্চলে হিন্দুদের প্রাধান্য হওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা কিছু কম ছিল। তবুও লোকের মনে দাঙ্গার ভয় ছিল। তারা প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। আশপাশের এলাকার খবর নেবার জন্যে তাদের গুপ্তচর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াত। যেদিন রাত্রে রাঘবনরা সেখানে ছিল, সেই রাত্তিরেই খবর এল যে এক বুড়ো মুসলমান একজন হিন্দু যুবতীকে বোরখা পরিয়ে জীপে

চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুনেই রাঘবনের মনে সন্দেহ হল— সীতা নয় তো ? আর সীতা যদি নাও হয় হিন্দু মেয়েছেলে বিপদে পড়েছে তাকে রক্ষা করাই তার কর্তব্য। তার জন্যে প্রাণ যায় সেও স্বীকার !

তাড়াতাড়ি সেই জীপের সন্ধান করে সেই রাস্তায় নিজের জীপ চালাল। রাস্তায় বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ওরা আগের জীপের পেছু নিতে ছাড়ল না। পেছু ধাওয়া করে তারা চেনার নদীর ধারে এসে পৌঁছোল। নদীর মাঝ-বরাবর একটা নৌকো যাচ্ছিল। রাঘবন দেখল নৌকোয় এক বুড়ো মুসলমান আর এক যুবতী। তারপর আর দেখার শোনার কিছু বাকি রইল না। চট করে বন্দুক নিয়ে বুড়োকে তাগ করে গুলি করে দিল। বুড়ো গড়িয়ে নদীতে পড়ে গেল। কিন্তু তারপর যা ঘটল, সেটা অপ্রত্যাশিত। নৌকোয় সেই স্ত্রীলোকটি ছাড়া আরও একজন পুরুষ ছিল। তারা দুজনেই যেন পরপর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মনে হল। তখন নৌকোয় এক মাঝি ছাড়া আর কেউ নেই। রাঘবন তখন রাগে শুধু উন্মত্ত নয়, অন্ধও। মাঝিকে নিশানা করে দ্বিতীয়বার গুলি করল। গুলিটা নৌকোয় লাগতে নৌকো উলটে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবেও গেল।

নৌকোটা ডুবে যেতে তখন রাঘবনের অনুশোচনা হল। ততক্ষণে তার মেজাজ কিছুটা শান্ত হয়েছে। ভাবল—'এ আমি কী করে বসলাম। নৌকোয় মেয়েটা যদি সীতাই হয়...?' তারপর ভেবে দেখল— সীতা হলেই বা কী ? মুসলমানের ঘরে রাত কাটিয়ে তার লালসার শিকার হবার পর, তার বেঁচে থাকার চেয়ে এভাবে নদীতে ডুবে মরাই শ্রেয়।

এরপর বহু বিপদ কাটিয়ে রাঘবন আর ভামা দিল্লী এসে পৌঁছোল। দিল্লী আসার পরেও রাঘবন বহু সন্ধান করেছে। পানিপথ, কর্নাল, কুরুক্ষেত্র কোন শরণার্থী শিবিরে খোঁজ করতে বাদ রাখেনি। কিন্তু সীতা বা বাসন্তীর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

'সূর্য, আজকাল আছ কোথায় ?'— রাঘবন প্রশ্ন করে।

সূর্য বললে— 'এখনো কোন পাকাপাকি আস্তানা জোটেনি। জুটলে আপনাকে জানাব। আপনার আর ভামার বিয়ের সময় আমায় নেমন্তন্ন করতে ভুলবেন না !'—ঈষৎ শ্লেষ মিশিয়ে হাসে।

রাঘবন আশ্চর্য হয়। বলে— 'তুমি এ কথা জানলে কী করে ? আমরা তো এখনো কাউকে বলি নি।'

সূর্য বলে— 'এসব কথা বলতে হয় না। আন্দাজে বোঝা যায়। আহা, এতবড় বাড়িটায় আপনি একলা কতদিন' পড়ে থাকবেন ? বাড়িটা গিলে খাবে না ? যাক, বিয়েটা কবে হচ্ছে ?'

'এখন ওসব কথা ভাবতেও সংকোচ হচ্ছে সূর্য। এ কথা সত্যি যে আমি এভাবে জীবন কাটাতে পারব না। কিন্তু, সীতার বিষয়ে এখনো তো সঠিক কোন খবর পাইনি। তার ওপর তারিণীর চিঠিটা পাবার পর মনটা আরও বিচলিত হয়ে পড়েছে।'

'তারিণীর চিঠি পেয়ে মন বিচলিত হল কেন ?'

রাঘবন বললে— 'তোমায় বলতে আপত্তি নেই, সূর্য। সীতাকে হারিয়ে যে দুঃখ পেয়েছি, সে দুঃখ দূর করার শক্তি ত্রিভুবনে এক তারিণীরই আছে। হয়তো এ কথায় তোমার আপত্তি আছে। তবু এ ব্যাপারটায় তুমি নাক না গলালেই সুখী হব।'

সূর্য বললে— 'রক্ষে করুন। একবার অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে আমি আজও দুর্ভোগ ভুগে মরছি— আবার ! না, রাঘবন ! আমার পরের ব্যাপারে আর আগ্রহ নেই।— বরং আপনাকে আরও একটা সুসংবাদ দিই। সীতা যদি মরেও গিয়ে থাকে, তা হলে তারিণীর সঙ্গে আপনাদের শুভ-বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দেখলে সে পরম তৃপ্তি লাভ করবে, অত্যন্ত শান্তি পাবে।'

শুনে রাঘবন রাগে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়ল। এতক্ষণে তার ধারণা হল সূর্য তাকে বিদ্রূপ করছে এবং অপমান করবার চেষ্টা করছে। সে চেঁচিয়ে উঠল— 'তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে এসেছ, রাস্কেল ! ভেবেছিলুম বুঝি তোমার দেমাক ভেঙেছে !

যেমনকার প্যাঁচোয়া তেমনি আছ? বেরিয়ে যাও এখান থেকে। গেট আউট!' সূর্য উঠে পড়ল। বললে— 'আচ্ছা, তবে উঠি। এতক্ষণ আপনার 'গেট আউট্' বলার অপেক্ষাতেই ছিলাম। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এবার যাই।'

রাঘবন বলে— 'না, যেও না, একটু বোসো। কেন তুমি ওকথা বললে?... তুমি কি সত্যিই মনে কর তারিণীর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে সীতা...' রাঘবন কথাটা শেষ করতে পারে না। ওর সংকোচ হয়।

দ্বিধার কোন কারণ নেই। বলছি তো। সীতার আত্মা তাতে তৃপ্তি পাবে। তার বিশেষ হেতুও আছে।'

'হেতু আছে! কী হেতু?'

'সীতা আর তারিণী সহোদরা। একই মা-বাপের সন্তান। এর চেয়ে বেশি আর কী কারণ থাকতে পারে?'— সূর্য বলতে বলতে বাইরের দিকে হাঁটতে থকে।

'দাঁড়াও সূর্য, যেও না! হঠাৎ একটা এটম্ বম্ ফেলে দিয়ে চলে গেলেই হল? তোমার কথা সত্যি তার প্রমাণ কী? কে তোমায় বলেছে?'— রাঘবন প্রশ্ন করে।

'সীতা আর তারিণীর বাবাই বলেছেন। তাঁর মুখেই আমার সব বৃত্তান্ত শোনা।'

এরপর সূর্য সবিস্তারে দুরাইস্বামীর পূর্ব জীবনের বৃত্তান্ত রাঘবনকে শোনায়। এমন বিচিত্র কাহিনী সহজে লোকের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু রাঘবন সবটাই সত্যি বলে বিশ্বাস করল।

'সূর্য! তিনি এখন কোথায়— দুরাইস্বামী আয়ারের কথা বলছি। সীতার বিয়ের পর থেকে আর তাঁর দেখা পাইনি। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলেন জানি না।'

'রাঘবন! সেসব কথা কেন জানতে চাইছেন? জানলে আপনার মনের দুঃখ বাড়বে বই কমবে না!'

'কেন, দুঃখ বাড়বে কেন? তোমার সব কথাই তো হেঁয়ালি! কিছুই বোঝার উপায় নেই!'— রাঘবন অবাক হয়।

'আপনি নিষ্ঠাবান সৎব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। আপনার শ্বশুর মৌলবী সাহেব— এ কথা জানলে আপনার বাবা পদ্মলোচন শাস্ত্রীর হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে না?'

'আমার শ্বশুর তো তোমার পিসে। তিনি মুসলমান মৌলবী হতে গেলেন কেন? তাঁর কি বিশ্বাস— ইসলামে হিন্দুধর্মের চেয়ে একটু শীগ্যির মোক্ষলাভ করবেন? নির্বাণ পেয়ে যাবেন নাকি!'

'তাঁর ধর্মবিশ্বাসের বিষয়টা আমার ততটা জানা নেই। আমার মতে দুনিয়ার লোককে ধোঁকা দেবার জন্যেই ভেক ধরেছিলেন। তবে ঐ ভেকের দৌলতেই তিনি হঠাৎ মুক্তি পেয়ে গেছেন। নির্বাণ বলতে চান, তাই বলুন।'

'সেকি!'— রাঘবন স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ। সেদিনকার নৌকোয় আমরা তিনজনেই ছিলাম। ওপার থেকে বন্দুকের নিশানা লাগানো দেখে একবার আমার সন্দেহ হয়েছিল। আজ বুঝলাম সন্দেহটা সত্যিই।'

—নৌকোতে তোমরা তিনজনই ছিলে! তার মানে? তুমি কী বলছ সূর্য! আমার মাথা ঘুরছে। সব কথা ভেঙে বলো।

'পাঞ্জাব থেকে আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছিলাম। আমি, সীতা আর সীতার বাবা। সীতার বাবা ভেবেছিলেন মৌলবীর পোশাকে সীতাকে বাঁচানো সহজ হবে। তাঁর জামাই যে সেটা উলটো বুঝবে তা বুঝতে পারেননি!'

'আঃ··· তা হলে··· সেদিন নৌকোয়··· যে মুসলমানকে আমি গুলি করেছিলাম, তিনি···'

'হ্যাঁ, আপনারই শ্বশুরমশায়। আর আপনার লক্ষ্য অব্যর্থ। একটুও ভুল হয়নি। রাঘবন! সেই দৈব-দুর্বিপাকের ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আমি। আজ আপনিও জানলেন। আমি এ কথা

কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বলব না। আমার ধারণা, আপনিও বলবেন না।'— কথা শেষ করে সূর্য বেরিয়ে পড়ে।

কাঠের পুতুলের মত বসে থাকে রাঘবন। সূর্যর শেষের কথাগুলো তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতন তার বুকে বিঁধে থাকে। সূর্য যা বলে গেল তার পরিণতির কথা চিন্তা করারও শক্তি নেই তার। শুধু একটা কথাই বারবার ওর মগজে ঘুরছে— তারিণী যেন এ কথার বিন্দুবিসর্গ না জানতে পারে, ভগবান!

রাঘবনের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পথে পা দিয়েই সূর্য চলার বেগ বাড়িয়ে দেয়। প্রতি পদক্ষেপে তার আকণ্ঠ উদ্বেগের লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

একান্ন

রকমারী সড়ক আর গলিঘুঁজি পার হয়ে সূর্য পথ হাঁটছে। একটা গলির ভেতরে একটা পায়েচলা পথ। পথটা একটা টিলার ওপর পৌঁচেছে। সূর্য সেই পথটা ধরে চলল। টিলাটার মাথার ওপর মসজিদ। অনাথ শরণার্থী মেয়েদের ঐ মসজিদে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা কেউ চরখায় সুতো কাটছে, কেউ মেসিনে সেলাই করছে। কেউ কেউ শৌখিন ফুলদানি তৈরী করছে। কারুর মুখেই প্রাণের সাড়া নেই। কোটরে বসা চোখগুলোয় ভাবলেশ নেই। যেন কতকগুলো নির্জীব প্রেতলোকের বাসিন্দাদের ধরে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সূর্য একবার করুণার চোখে তাদের দিকে তাকায়। আবার হাঁটতে থাকে। একটা অন্ধকার গলির ভেতর তস্য অন্ধকার একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়।

এই শরণার্থী শিবিরটা বিখ্যাত শহর পানিপথে।

সীতা রান্নাঘরে। দুরাইস্বামী আয়ার সামনের রকে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। নদীতে পড়ে যাবার পর থেকে শক্ লেগে সীতার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। কানে শুনতে পায় না, কথা বলার শক্তিও হারিয়েছে।

দুরাইস্বামী বললেন— 'সূর্য, এসো। এত দেরী করে এলে? কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলে?' সূর্য চুপ করে থাকে। দুরাইস্বামী আবার বলেন— 'কী ব্যাপার। চুপ করে রয়েছ যে? দিল্লীর কোন বিশেষ খবর আছে নাকি?'

বিশেষ কিছু নয়। সর্বত্রই অশান্তি, অসন্তোষ। হিংসা-দ্বেষ,

রাগ-জ্বালা, ভয় আতঙ্কের রাজত্ব। কারুর মনে শান্তি নেই।'— সূর্য বলে।

'এবার মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনাসভায় যাওনি? তুমি তো বল সেখানে গেলে মনে শান্তি পাওয়া যায়।'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার সেখানেও শান্তি পেলাম না। আমার মতে মহাত্মাজীর এখন দিল্লীতে থাকাটাই ভুল। উনি এসময়টা আর কোথাও চলে গেলেই ভাল হয়।'

'এ আবার কী কথা? মহাত্মাজী দিল্লীতে আছেন তো তোমার কী ক্ষতি হচ্ছে?'

'না ওখানে সবাই গান্ধীজীর নামে যা-তা বলছে। সকলেরই ওঁর ওপর রাগ। তাঁর কাজ দিল্লীতে কারুই পছন্দ নয়।'

'তা গুরুজনেরা কি সাধে বলেছেন যে, 'যথার্থবাদী বহুজনবিরোধী' হয়ে থাকেন? লোকের যা খুশি হয় বলুকগে। এ বাড়িতে তাঁর এক পরম ভক্ত শয্যা আছে। তোমার পিসতুত বোনটি। ওকে একবার নিয়ে যাও, মহাত্মা-দর্শন করিয়ে দাও। পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ। বলা যায় না দর্শন করলে হয়তো ওর মনোবিকার সেরেও যেতে পারে। আজ আবার ফিট্ হয়েছিল। জ্ঞান ফিরতে বেশ দেরী হয়েছিল। জ্ঞান হতে একবার এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে শুনে আমার হৃৎকম্প হবার উপক্রম। তুমি আর আমি ছাড়া কে ওকে দেখবে।'

'সীতাকে মহাত্মাজীর দর্শন করাতে হলে তাড়াতাড়ি একদিন দিল্লী নিয়ে যেতে হয়। আমার মনে হয়, খুব বেশি দিন আর দিল্লীতে থাকবেন না উনি। ওখানকার আবহাওয়া দিনদিন এমন কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। সেদিন প্রার্থন-সভায় কে যেন বম্ ছুঁড়েছে, জানেন?'

'জানব না কেন? কাগজেই তো দেখলুম। তাতে মহাত্মাজীর মত মানুষ ভয় পান না।— দিল্লীতে তোমার এবার আর কারুর সঙ্গে দেখা হল নাকি? কোন নতুন খবর-টবর?'

তুরাইস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে সূর্য বলল— 'হ্যাঁ, হয়েছে। আপনার আদরের জামাইয়ের সঙ্গে।'

শুনে ত্বরাইস্বামীর মুখে চোখে প্রশ্ন ফুটে ওঠে। কিন্তু ঔৎসুক্য চেপে গিয়ে সহজ প্রশ্ন করেন— 'তুমি কি গিয়ে দেখা করলে নাকি?' তোমায় বারণ করে দিয়েছিলুম না?'

'আমি নিজে যাইনি। হঠাৎ রাস্তায় দেখা। সে এক বিপত্তি। আপনার জামাই এই নিয়ে আমায় তৃতীয়বার মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন। ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছি।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। বেঁচে না গেলে কথা বলছ কী করে? তা সে কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করল?'

'করল না আবার? বাড়ি নিয়ে গিয়ে জানতে চাইল সীতার খবর জানি কিনা।'

'তুমি কি জবাব দিলে?'

'বললুম সীতা মরে গেছে।'

'কী সাংঘাতিক কথা। তুমি ও কথা বললে কেন?'

'তা ছাড়া কী বলব বলুন? এদিকে আপনার কন্যারত্ন বলছেন তাঁর জীবিত থাকার কথা যেন তার স্বামীকে জানানো না হয়। ওদিকে তিনি আবার একটা বিয়ে করবেন বলে ক্ষেপে উঠেছেন।'

'কী বললে? আবার বিয়ে করবে? ঐ পাপীকে কে বিয়ে করবে? কার এমন ত্বর্বুদ্ধি হবে?'

—এটা আপনি কী বললেন পিসেমশায়! আপনার জামাই তো আপনারই বড় মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।

ত্বরাইস্বামী এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে কথা বলছিলেন। এবার উঠে বসে বললেন— 'সূর্য! তারিণীর বিষয়ে রাঘবন কিছু বলছিল?'

'হ্যাঁ, বলছিল তারিণী আর বাসন্তী বেঁচে আছে।'— সূর্য সীতাকে লেখা তারিণীর পত্রের উল্লেখ করে।

'তবে তো আমাদের তারিণীকে খুঁজে বার করতে হয়। তুমি যা বললে কিছুতেই যেন তা ঘটতে না পায়। সতর্ক থেকে আমাদের তাতে বাধা দিতে হবে। তার জন্যে, যদি দরকার হয় তো চলো আমরা এখনই দিল্লী চলে যাই।'—ত্বরাইস্বামী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

'পিসেমশায়। আমার একটা পরামর্শ নেন তো বলি।'— সূর্য নরম সুরে বলে।

'কিসের পরামর্শ! নতুন কী পরামর্শ দেবে তুমি? বলো শুনি।'

রাজমপেট্টাই যাবার পথেই আমি প্রথম সীতাকে দেখি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে লুকিয়ে রেখে আমিই রাঘবনের সঙ্গে সীতার বিয়েটা হতে দিয়েছিলাম।'

'সেটা জানতে পেরে তোমায় বহুবার শাপশাপান্ত করেছি। মরুকগে। এখন বলো, কী বলতে চাও।'— দুরাইস্বামী ঔৎসুক্যে অধীর হয়ে ওঠেন।

'আমি সেটা ভুল করেছিলাম, কিন্তু তার পেছনে আমার ভাল উদ্দেশ্যই ছিল। পিসেমশায়। তার জন্যে প্রায়শ্চিত্তও করেছি আমি। সীতা আত্মহত্যা করতে গেলে আমিই তাকে বাঁচাইনি কি? চন্দ্রভাগায় ডুবে মরা থেকেও আমিই তাঁকে বাঁচিয়েছি।'

'ওসব পুরনো কথা কেন তুলছ সূর্য? কী বলতে চাও তুমি?'

'এটা প্রমাণ করার জন্যে যে সীতার ওপর আমার অধিকার আছে। আমি দুবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছি। তাই সীতার নতুন জীবনে রাঘবনের কোন অধিকার নেই। এ-কথাটা আপনি যদি মানতে প্রস্তুত থাকেন, তবে চলুন দিল্লীতে, আমরা দুজনেই যাব রাঘবনের কাছে— সীতার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদে তাকে রাজী করাব।'

'ধরো সে রাজী হলই— তাহলে কী হবে?'— দুরাইস্বামীর কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পায়।

'পরের কথাটা আপনি অনুমান করে নেবেন আশা করেছিলাম। যাক, বলছি। ওদের বিবাহবিচ্ছেদের পর সীতাকে আমিই বিয়ে করব। তারপর ওকে নিয়ে কাশ্মীরে চলে যাব, কিংবা নেপালে নতুন জায়গায় নতুন জীবনে তাকে আমি সুস্থ করে তুলব। তাকে আমি সুখী করে তুলব—'

দুরাইস্বামীর হাতের কাছে একটা রিভলবার পড়েছিল। সেটা হাতে নিয়ে তিনি সোজা সূর্যর বুক লক্ষ্য করে ধরেন। তারপর

বলেন— 'আবার যদি কোনদিন সীতাকে নিয়ে এই ধরনের প্রস্তাব তুমি কর, তোমায় গুলি করে মারব। খবরদার!'

সূর্য কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মাথা তুলে বলে— 'আমার ভুল হয়েছে পিসেমশায়। মাথাটা বোধহয় গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। নইলে…'

তুরাই বলেন— 'অনুশোচনা করতে পারছ যখন, তার মানে তোমার বিবেক বলে এখনো কিছু আছে। তাহলে আর ও-নিয়ে ভেবো না। তোমার প্রলাপ আমি ভুলে যাব, তুমিও ভুলে যাও। আর দিল্লী যাবার জোগাড় করো।'

বাহান্ন

সীতার দুরদৃষ্ট, তার শেষ বাসনাটুকুও পূর্ণ হতে দিল না। তাতেও বাধা পড়ল। ওরা দিল্লী যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। আর দু'তিন দিনের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগেই আকাশবাণীর ঘোষণায় একটা বজ্রপাতনের শব্দ শোনা গেল— সেদিন তিরিশে জানুয়ারি। খবরটা বিশ্বশুদ্ধ ছড়িয়ে গেল— পানিপথও পৃথিবীর বাইরে নয়। কাজেই ওরাও সবাই শুনল। গোড়াতে কারুরই কথাটা বিশ্বাস হতে চাইল না— 'একি সত্যি? সত্যি নাকি?' প্রত্যেকেই পরস্পরকে প্রশ্ন করছে। কেউ বা বললে— 'যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে যদি নরক থেকে ছাড়া পেয়ে কোন শয়তানের অনুচর পাপযন্ত্র থেকে তাঁর বুকে একটা গুলি দেগেই থাকে, তা বলে মহাত্মার প্রাণ কি ফেলনা, যে এত সহজেই শেষ হয়ে যাবে?' কেউ বা প্রচার করছিল— শীগ্যির মহাত্মাজীর পুনর্জীবিত হবার শুভসংবাদ এসে পড়বে।

রাত্তির যখন সাড়ে আটটা তখনই সব সংশয়ের অবসান হয়ে গেল। বেতারযন্ত্রে পণ্ডিত নেহরু আর সর্দার প্যাটেলের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের মারফত সত্য ঘোষণা প্রতিষ্ঠিত হল— মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন।

শরণার্থী শিবিরে বসে সূর্য এই খবর শুনল। দিশেহারা হয়ে সে বাড়িতে ছুটে এল। সেখানে তখন দুরাইস্বামী সীতার মূর্ছার শুশ্রূষা করছেন। সূর্য তাঁকে বেতারের খবর শোনাল। অসহ বেদনা সত্ত্বেও তাঁদের তখন ভাবনা— সীতাকে কী ভাবে এ খবর দেওয়া যায়? আরো অনেকক্ষণ পরে সীতার মূর্ছা ভাঙল। ইঙ্গিতে সে জানাল— সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। কাজেই যথাশীঘ্রসম্ভব গান্ধীদর্শন

করতে দিল্লী যেতে চায়। ওরা তুই অভিভাবক তখন স্থির করল কাল সকালেই সূর্য তাকে দিল্লী নিয়ে গিয়ে অবসরমত গান্ধী নিধনের খবরটা তাকে শুনিয়ে দেবে, অথবা নিজের চোখেই দেখাবে।

তুরাইস্বামীর তখন দিল্লী পর্যন্ত যাবার শক্তি ছিল না। তাই তিনি তাদের সঙ্গে যাবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। ওদের বিদায় দিয়ে তিনি সূর্যকে বলে দিলেন সীতার প্রতি সযত্ন সতর্কতা অবলম্বন করতে। বলে দিলেন— 'সাবধানে ফিরে এসো।'

সীতার জীবনে এ আরো একটা স্বপ্নময় ঘটনা।. পানিপথ থেকে দিল্লী যেতে সারাপথ লোকের মুখ দেখেই তাদের ব্যাকুলতার কথা জানতে পারল। সীতার মনে নানান রকম সংশয় জাগল। পুরনো দিল্লী থেকে নতুন দিল্লীর পথে পথে জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে চলেছে। সীতা যেন স্বপ্নের ঘোরে তাদের সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

মহাত্মাজীর মরদেহের অন্তিম যাত্রা শুরু হব-হব। সেই সময় সূর্য আর সীতা পৌঁছোল। জনসমুদ্রের বুক চিরে কোন রকমে ওরা ভেতরে ঢুকল— শেষ দেখা দেখতে হবে। সীতার প্রথম ও শেষ দেখা। সীতা তখনও জানে না। শুধু ভাবছে আজ হয়তো কোন বিশেষ দিন। তাই এত লোকারণ্য। ক্ষিপ্র পায়ে সামনে এগোয় সীতা। কিছু দূর গিয়েই দেখে ফুলের পাহাড়ে ভরা একটা পুষ্পরথ। তার ওপর মহামানবের মরদেহ শায়িত। নিশ্চল, প্রশান্ত তাঁর আনন্দ। তাঁর তুপাশে দেশের বড় বড় নেতারা বসে আছেন। আপামরজনতা রথের অনুগমন করছে। তাদের চোখে বাদলের ধারাপাত। সীতা সব বুঝতে পারে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের সরব বিলাপে আকাশে কান পাতা যায় না। সীতার কানে এমনিতেই কল্লোল বাজে, আজকের এই শোকোচ্ছ্বাস তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।— হঠাৎ সীতার বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। তু'কানের মাঝামাঝি কোথাও যেন কোন একটা শিরা ছিঁড়ে গেল। মনে হল কণ্ঠবীণার মন্ত্র তার টুটে গেল।

খানিক পরেই তার ঘোরটা কেটে গিয়ে সংজ্ঞা ফিরে আসতে

থাকে। আহা! এই দর্শন পাবার প্রয়াস তার কতদিনের। কত বছর থেকে এই একবার দেখার আকুলতা তার। প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। কোন-না-কোন কারণে বাধা পড়েছে। আর আজ, হায়রে! আজ সেই মহৎ প্রাণ যখন এই দেহ ছেড়ে চলে গেছে, তখনই সীতার সুযোগ এল নিষ্প্রাণ, নিশ্চল, নির্জীব সেই দিব্যদেহ দর্শনের। সীতা ভাবতে ভাবতে হাঁটছে। ভিড়ের ধাক্কায় একবার দশহাত পিছিয়ে পড়ছে। আবার অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে শব-বাহিকার সামীপ্যে চলে আসছে। মাঝে মাঝে মনে তীব্র ইচ্ছা জাগছে ঐ পবিত্র চরণকমলে তার চোখে ছোঁয়াতে।

ইতিমধ্যে সে সূর্যর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সূর্য কোথায় জনসমুদ্রে ভেসে, হারিয়ে গেছে। মহাত্মাজীর মরদেহ দর্শনের পর থেকে মুহূর্তের জন্যেও তার কথা মনে পড়েনি সীতার। ওদিকে সূর্য আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে সীতাকে খুঁজে মরছে। ভিড়ের মধ্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। পাগলের মত।

বিকেল প্রায় চারটের সময় শোকযাত্রা যমুনার তীরে পৌঁছোল। চিতা সাজানো হল। শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। সেই সময় সমবেত মর্মাহত অনুরাগীদের ভিড়কে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বৃত্তের বাইরে সরিয়ে দেওয়া হল। লাখ চেষ্টা করেও সীতা সেই ভিড় ভেদ করে এগোতে পারল না।

ওদিকে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হল। রক্তজিহ্ব উদ্ধত আগুন আকাশকে লেহন করছে। ভিড়ের সর্বহারা মানুষগুলো কেঁদে উঠল, যেন ভূলোকের সাতসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ কল্লোল। সীতা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার অসহ্য লাগছে। সব-কিছুই যে শেষ হয়ে গেল; সারা জীবনটাই সাঙ্গ হয়ে গেল গো! তার সকল ভুবন ব্যর্থ হয়ে গেছে... এবার বুঝি তার শেষ আকাঙ্ক্ষার শেষ আশ্রয়ের আকাশটুকুও ঘুচে গেল। সব জ্বলে গেল, সব পুড়ে গেল; সব ক্ষয়ে গিয়ে শুধু একমুঠো ছাই রয়ে গেল। আর সে কিসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকবে?

সীতা ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু যাবে কোথায়? কোন নিশ্চিত ঠাঁই তো আর নেই। তাই পা দুটো যেখানে টেনে নিয়ে যায়, সেই দিকেই চলল। তখনো তার সূর্যর কথা মনে নেই।

তার মেয়ে? বাসন্তী! কোথায় সে? বেঁচে আছে... নাকি...? যদি বেঁচে থাকে তবে কে তাকে রক্ষা করবে? কেন ভগবান! তিনি তো আছেন! তিনি আছেন বলেই তো এত যন্ত্রণা, এত অত্যাচার সহ্য করেও মানুষ বেঁচে আছে! কিন্তু তিনি কেন সব মুখ বুজে দেখছেন? তিনি তবে কিসের করুণাসিন্ধু? সব কি মিথ্যে? কিন্তু তবে গান্ধীর মত পুণ্যশ্লোক করুণার অবতার কেন ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন? তাঁর বিশ্বাস তো ভিত্তিহীন হতে পারে না। ভাবনার অথৈ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সীতা কেবল এগিয়ে চলে। পথের কোন দিকনির্দেশ নেই, নেই ঠিকানা। শুধু হাঁটছে। সমস্ত দিন একবিন্দু জল খায়নি, এককণা খাবার নেই পেটে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় তার পা আর চলল না, টলমল করে উঠল। একটা বাংলো বাড়ির পাঁচিল ধরে কোনমতে টাল সামলে নিল। ভেতর থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল। আকাশবাণীর গান। যে-গান মরমকে মোমের মত গলিয়ে চোখে অবিরল ধারায় জল এনে দেয়! 'হরি। তুম হরো জন কী ভীর!'

সুধাবর্ষী গীতলহরী সীতার কানের ভেতর দিয়ে অন্তরে পথ করে নিচ্ছে। স্পষ্ট দু-কান ভরে গান শুনছে সীতা। গান শুনছে! এ কী! সীতা...গান...শুনতে পাচ্ছে! তাই তো! কানের সেই অহরহ তরঙ্গবিক্ষেপ কই নেই তো আর। সেই তীব্র যন্ত্রণার অবসান ঘটে গেছে তবে? মহাত্মাজী! ওগো করুণার পুণ্যমূর্তি। তোমার মৃত্যু দিয়ে তুমি তুচ্ছ ভক্ত শিষ্যার পুনর্জীবন দিয়ে গেলে!

তখন আকাশবাণীতে গান্ধীজীর প্রিয় ভজনগুলি একে একে শোনানো হচ্ছে। তখন যমুনাসৈকতে তাঁর মাটির শরীর ভস্ম হয়ে যাচ্ছে...

'হরি। তুম হরো জন কী ভীর!
দ্রৌপদী কী লাজ রাখী তুম বঢ়ায়ো চীর!
ভগত কারণ রূপ নরহরি ধরিয়ো আপ শরীর!
হিরণকশিপ মার লিন্‌হো ধরিয়ো নাহিন ধীর!
দাসী মীরা লাল গিরধর দুখ্ জঁহা তাঁহা পীর!'...

সীতা সব ভুলে মগ্ন হয়ে শুনছে। ভজন শেষ হয়ে যায়। চারদিকে গাড়ির হর্ন বেজে ওঠে। আরো কত কিছু বিচিত্র আওয়াজ।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। সীতা ভাল করে ঠাহর করে দেখে একসময় চমকে ওঠে। এ কার বাড়ি! কার বাড়ির দেয়াল ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে! হায় ভগবান! এ সেই বাড়ি। যে বাড়িতে সে সংসার করে গেছে। জীবনের কয়েকটা বহুমূল্য বছর যে-বাড়িকে সে 'নিজের বাড়ি' বলে ঘরকন্না করেছে। আজ নিজেরই অজ্ঞাতে কখন সে এখানেই এসে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এখন এখানে কে থাকে? কেন, সে-ই তো থাকে। সেই রেডিয়ো শুনছে। তা হলে একবার ভেতরে গিয়ে দেখি-না কেন? তাকে গিয়ে বলি-না কেন—যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, আমরা আবার নতুন করে জীবন শুরু করব? তা হয় না? হবে না কেন? কিন্তু এত কথা সীতা তাকে বলবে কেমন করে। সীতা কি কথা বলতে পারে?

সীতার মনে হল ঠিক আগের মতন ওর জিভটা মুখের ভেতর নড়েচড়ে উঠছে। মনে হল কথা বলতে পারবে। বুকের ভেতর অজস্র কাঁপন নিয়ে, টলমল পায়ে সীতা সেই বাংলো বাড়ির ভিতরে বাগানে ঢুকল।

বড় দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ সীতার। এখন ভেতরে আর গানের সুর বাজছে না। সীতা দাঁড়িয়ে ভাবছে। এমন সময় বাহিরের দরজায় কারুর পায়ের শব্দ হল। দরজাটা খুলছে। কে আসছে? যে আসছে সে ওকে এখানে দাঁড়াতে দেখে যদি কিছু বলে! কাজ নেই। দোরের কাছ থেকে চট করে নেমে আসে সীতা। দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংহত করে দেখতে থাকে— কে এল?

যে আসছিল একজন মহিলা। তার আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। এই ভর সন্ধেবেলায় এই মুসলমান মহিলা এ বাড়িতে? তবে নিশ্চয়ই এটা এখন মুসলমানের বাড়ি। হে ভগবান। কেন এই অসময়ে ও এখানে এল? ভীষণ আহাম্মকী করেছে। তবু ভাগ্যে বাড়ির ভেতর যায় নি। যাক। এ মহিলা ভিতরে গেলেই সীতা এক ছুটে বাইরে চলে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে?

বোরখা পরা মেয়েমানুষটা শব্দ না করে অত্যন্ত মৃদু পায়ে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত যেন দ্বিধা করল। তারপর ভেতরের দরজার গায়ে আঙুল দিয়ে টকটক করে টোকা মারল। টোকার ক্ষীণতম শব্দ শুনতেও সীতার অসুবিধা হল না। আশ্চর্য! তার শ্রবণশক্তি প্রখর হয়ে গেছে।

ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল—'গেট্ ইন।' শুনে সীতার রোমাঞ্চ হল। এ সেই স্বর। বারো বছর ধরে যে কণ্ঠস্বর তাকে অমিত সুখ দিয়েছে, অজস্র দুঃখ। যে তাকে স্বর্গের প্রেম বিলিয়েছে, নরকের ঘৃণায় ডুবিয়েছে। হ্যাঁ এ— সেই। সীতার আর কোন সন্দেহ নেই। গলায় মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিয়ে যে ভর্তা তাকে ভার্যা বলে গ্রহণ করেছিল। ঘরের ভিতরে সেই আছে।

সীতা দেখল বোরখা পরা মহিলা দোর খুলে ভিতরে যাচ্ছে। পরক্ষণেই সীতার মনে উৎকণ্ঠা জাগল। মনে ভাবল তারও ভেতরে গিয়ে দেখা দরকার ভেতরে কী হচ্ছে। ক্রমে উৎকণ্ঠা তার শিরায় শিরায় প্রতি রোমকূপে ছড়িয়ে গিয়ে তাকে অস্থির করে তুলল। দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে সীতা ভাবে— কী করা উচিত? সামনের দরজা দিয়ে ঢোকা উচিত হবে না। কেননা সেই দোরটা খুললেই বসবার ঘর। সেই ঘড়েই রেডিয়ো। উনি নিশ্চয়ই রেডিয়োর পাশে বসে আছেন। সামনাসামনি দেখে ফেলবেন। যে কথা ও শুনতে চায়, যা ও জানতে চায় তা পণ্ড হয়ে যাবে।

তার চেয়ে বরং ভেতরের দোর দিয়ে যাওয়াই ভাল। খিরকির দরজা যদি ভেতর থেকে খিল দেওয়া না থাকে তবে তার কাজ সহজ

হয়ে যাবে। নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকতে পারবে। ওর আসার কথা কেউ জানতেও পারবে না। ও চুপচাপ পাশের ঘরে থেকে ওদের কথাবার্তা অনায়াসে শুনতে পারবে। আর যদি পেছনের দরজা খোলা না থাকে, তা হলে শোবার ঘরের কাছে, জানলার আড়ালে দাঁড়ালেও কথা শোনা যাবে।

সীতা পা টেনে টেনে নিঃশব্দে পিছনের দিকে চলে যায়। খিড়কির দোর বন্ধ ছিল না। ছুঁতেই খুলে গেল। পা টিপে টিপে সীতা ভেতরে গেল। বসবার ঘরের লাগোয়া ঘরে ঢুকে পড়ল। উদ্বেগের তীব্রতায় আর ও দাঁড়াতে পারছিল না। দেয়ালের গায়েই সোফা ছিল। ক্লান্ত অবসন্ন সীতা সোফায় গা ঢেলে বসে পড়ল।

'কে তুমি? এখানে কী দরকার? মনে হচ্ছে আর কোন বাড়ি ভেবে ভুল করে ঢুকে পড়েছ। যাও, যাও, এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও। বাড়িতে আমি একা থাকি। এখানে কোন স্ত্রীলোক নেই। চলে যাও শীগ্যির!'—রাঘবন কড়া গলায় বলে।

'মাপ করবেন রাঘবন! আমি বেশি সময় নেব না। এখনই চলে যাব!'—নারীকণ্ঠের আওয়াজ।

সে গলা শুনেই সীতার মন পুলকিত হয়ে ওঠে। তারিণীর গলা। সীতার মন আবেগে উত্তাল হয়ে উঠল। তখনই ছুটে গিয়ে তারিণীর গলা জড়িয়ে ধরতে চাইল তার মন। অতি কষ্টে মনকে বশে রাখে সীতা। এখন সে সময় নয়। ও যে বেঁচে আছে তা স্বামীকে জানতে দিতে চায় না।

'কে! তারিণী! তুমি?'—রাঘবন বিস্মিত আনন্দে চীৎকার করে বলে— 'এমন অদ্ভুত পোশাক কেন তোমার? বোরখা পরেছ কেন? বোসো, বোসো। জান, কতদিন ধরে তোমার আসার প্রতীক্ষায় রয়েছি। তপস্যা করছিও বলতে পারো। বোসো। দয়া করে বোসো।'—রাঘবন উতলা হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, বসব বৈকি। নিশ্চয়ই বসব। বড় ক্লান্তি বোধ করছি

তাই যা বলতে এসেছি, বসে বসেই বলে যাব। তা ছাড়া, আপনার সময় বেশী নষ্ট করতে চাই না। আমাকেও শীগ্যির চলে যেতে হবে। নইলে বাসন্তী খুব ভাববে।'

'বাসন্তী! তারিণী, বাসন্তী কোথায়? তাকে সঙ্গে আননি কেন? সে ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ, ভালই আছে। তার কথা বলতেই আজ আমার আসা। আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই তাঁকে পোঁছে দিয়ে যাব।'

'কী বলছ? পোঁছে দিয়ে যাবে? বেশ তো পোঁছে দিয়ে যাও।. মা-হারা মেয়েটাকে এই শূন্য বাড়িতে রাখতে আমায় কত ভুগতে হবে। তা হোক। কোন ভাবনা নেই, সে আমি বুঝব। তুমি পোঁছে দিয়ে যাও।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাকে 'মা-হারা মেয়ে' বলছেন কেন? সীতার ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত কোন খবর পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। আমার মতন হুর্ভাগা এই পৃথিবীতে কে আছে বল! সীতা চেনাব নদীতে ডুবে মারা গেছে। সূর্য নিজের চোখে দেখেছে!'—সেই সময় একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ শোনা গেল। ঘরের ভেতর— কেউ শুনতে পেল না।

—'সীতাকে আর মেয়েকে হোশঙ্গাবাদে একলা রেখে আমি এই হতচ্ছাড়া চাকরীর পেছনে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম— সে কথা মনে পড়লে আজও আমার বুক ফেটে যায়। কী করে জানব বল যে পাকিস্তানের লোকগুলো রাতারাতি ভূতপ্রেত পিশাচ হয়ে যাবে··· ?'

'রাঘবন, অতীতের কথা মনে করে মিথ্যে কষ্ট পাবেন না। সীতা তো ভাগ্যবতী। বিশ্বপ্রেমিক বাপু, যাকে নিয়ে পৃথিবীর গর্ব— তিনিই নিষ্ঠুর ভাবে খুন হয়ে গেলেন। আমরা বেঁচে রইলাম সেই কলঙ্কের সাক্ষী হয়ে। সীতার অনেক সৌভাগ্য তাই পৃথিবীর এই হুর্দিন দেখার আগেই সে চলে গেছে।'

'জান তারিণী, কাল এই নৃশংস খবরটা শোনবার পর থেকে আমার

কেবলই সীতার কথা মনে পড়ছে। মহাত্মাজীর ওপর অগাধ ভক্তি ছিল তার। হোশঙ্গাবাদে থাকতে— সীতা গান্ধীজীকে ঈশ্বরের মত পুজো করত।'

'সীতা পুণ্যবতী। আমি চলি রাঘবন। কাল সকালে আপনার মেয়েকে দিয়ে যাব।'

'কালকের কথা ছেড়ে দাও। আমি এখনই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। বাসন্তীকে আমি আজই আনতে চাই, এখনই। আর শোনো। মা-হারা বাচ্চাটাকে এই ফাঁকা বাড়িটাতে একলা আমার কাঁধে ফেলে দিয়ে তুমি চলে যাবে, ওসব খেয়াল ছেড়ে দাও, তোমাকেও এখানে থাকতে হবে। তুমি সীতার জায়গায় ঘরসংসারের ভার নেবে, মেয়ের মা হয়ে তাকে সামলাবে কথা দাও, তবেই আমি এই দায়িত্ব নেব।'

'আপনি কী বলছেন, রাঘবন! সীতার শূন্যস্থানে আমায় বসাতে চাইছেন? আপনার সেই পুরনো মতিভ্রম ঘোচেনি এখনো?'

'না ঘোচেনি। তুমিই ভেবে দেখ তারিণী। এ বাড়িতে বাসন্তীকে লালনপালন তার তদারক করার জন্যে তোমার চেয়ে যোগ্যতর আর আমি কাকে পাব? তোমার যদি আমাকে বিয়ে করতে··· না, সে-কথা থাক। আজ তোমার ও কথা ভাল লাগবে না জানি। আজ সবারই মন বড় ভার। সবাই বিচলিত। চলো, আজ আমার মেয়েকে গিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু একটা কথা, তোমার এই বোরখাটা একটু দয়া করে খোলো। তোমার এই অদ্ভুত পোষাক আমার আদৌ পছন্দ নয়।'

'আচ্ছা, এ পোশাক আমি খুলব। বোরখাটা খুলে ফেলাই আমার উচিত। কিন্তু, বিয়ের কথাটা আবার অন্য দিনের জন্যে তুলে রাখতে আমার ইচ্ছে করছে না। ওকথাটা আসুন-না আজই আমরা পাকা করে নেই। তবেই আমার মনটা শান্ত হয়।'

'তারিণী। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। এক্ষুনি স্থির করে ফেল। কিন্তু স্থির করা, বা কথা পাকা করার কী আছে? তুমি

তোমার মত দিলেই তো হয়ে যায়। আমি তো চোদ্দ বছর ধরে এই দিনের জন্যে তপস্যা করছি !'

'আমি আমার স্বীকৃতি দেবার আগে একটা কথা স্পষ্ট করে নিতে চাই। আমি সীতার কাছে শপথ করেছিলাম যে আপনি আমায় বিয়ে করতে চাইলে আমি নিশ্চয় রাজি হব।'

'এখন কি তোমার শপথ পালন করতে চাও, না চাও না ?'

'সীতা যতদিন বেঁচে ছিল, আমার জন্য তাকে বহু কষ্ট পেতে হয়েছে। আমি শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাবার যে চেষ্টা করেছিলাম তাও বৃথা হয়ে গেল। অন্ততঃ তার আত্মার শান্তির জন্যে তাকে দেওয়া কথা আমি ফিরিয়ে নেব না ! আপনি যদি আমায় বিয়ে করতে রাজি থাকেন, তবে আমিও রাজি আছি। কিন্তু ভাল করে ভেবেচিন্তে দেখুন আগে। তারপর মত দেবেন। কেমন ?'

সীতা এতক্ষণ সোফায় চুপ করে বসে শুনছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। 'আর কেন সীতা, এবার ওঠো। আরো বসে থাকতে চাও ? এবার ভাগ ! তাড়াতাড়ি বিদেয় হও। এখনো তোমার মন শক্ত আছে। এইবেলা চলে যাও। কে জানে কখন মন দুর্বল হয়ে পড়ে, কী করে বসে ?'···সীতার অন্তর তাকে তাড়না করতে লাগল। সীতা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। খিড়কি দুয়ার দিয়ে বাড়িটা শেষবারের মত প্রদক্ষিণ করে সদর দরজায় চলে আসে। ফটকের বাইরে রাস্তায় পা দিয়ে তীব্র বেগে পথ অতিক্রম করে।

রাঘবন ঝাঁজিয়ে ওঠে—'কী বারবার এক কথা বলছ ? এতে ভেবেচিন্তে দেখার কী আছে আমার ? অনেক ভেবেছি আমি। ভাবনাচিন্তার বিবেচনার আর কিছুই নেই।'

আপাদমস্তক আবৃত তারিণীর বিচিত্র অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে একটা চাপা হাসি ভেসে আসে। সেই হাসিতে এমন কিছু ছিল যা শুনে হঠাৎ রাঘবনের মনে কেমন যেন অজ্ঞাত ভীতির সঞ্চার হল। ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল—'হাসছ কেন ? তোমার হাসির কি সময়-অসময় নেই ?'

তারিণী উঠে দাঁড়ায়।

'আমি মাপ চাইছি, রাঘবন! আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমার হাসা উচিত হয়নি। আপনি যাই বলেন— আরও একদিন —পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় আমি আপনাকে দিতে চাই। কাল্ ঠিক এই সময় আপনার মেয়েকে নিয়ে আসব।'—তারিণী বলল।

রাঘবন বলল—তোমার জেদী স্বভাবটা আগের মতই রয়ে গেছে তারিণী। তোমার খুশি, তুমি বাসন্তীকে কালই এনো। কিন্তু যাবার আগে তোমার এই পরদা টরদা খুলে একবার মুখটা দেখিয়ে যাও।

এক মিনিট তারিণী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর মুখ খোলে—'আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ করছি! কিন্তু, আমায় দোষ দেবেন না।' তারিণী তার বোরখা খুলে ফেলে।

কে এ! সুন্দর রাঘবন বিস্ফারিত চোখে অপলকে তাকিয়ে থাকে। অসংখ্যবার যে মুখ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে— যে সম্মোহনী রূপের আকর্ষণে তার দেহ মন উচ্ছ্বসিত হয়েছে— যাকে পাবার জন্য সে লালায়িত হয়েছে, উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে— এই কি সেই তারিণী! পূর্ণিমার চাঁদকে যে রূপের প্রতিযোগিতায় হার মানাতে পারত, সীতার সহোদরা সেই তারিণী কোথায়!

বোরখা-উন্মোচিতা এই নারীটি এক মূর্তিময়ী বিভীষিকা! তার একটা হাত কাটা। একটা চোখের জায়গায় শুধু একটা গহ্বর। কপালের ডানদিক থেকে বাঁ-গালের প্রান্ত অবধি একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন সমস্ত মুখটা চিরদিনের জন্যে বীভৎস ভাবে বিকৃত করে দিয়েছে।...

রাঘবন উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে পাথরের মতন অনড়। তার খোলা মুখটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। বহুক্ষণ যাবৎ পলক পড়েনি তার চোখের। ত্রাস-বেদনা ঘৃণা-বিস্ময় বিচিত্র অনুভূতির তীব্র কশাঘাতে অর্ধ অচেতন রাঘবন এবার ধপ করে সোফায় বসে পড়ে।

নারীমূর্তি মুখ খোলে। সামনের পাটির কয়েকটা দাঁত নেই, তাই মুখ খোলায় আরো ভয়াবহ দেখায়। বলে—'মাপ করবেন রাঘবন। আপনাকে দুঃখ দিতে আমি চাইনি। কিন্তু আপনি কিছুতেই মানলেন না যে!... না। এই বিকৃত, বীভৎস ভয়ংকরী নারীর দুঃস্বপ্নের মত কুশ্রীতা সত্ত্বেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কণ্ঠস্বর ভুল হবার নয়। এ তারিণীই।

'আচ্ছা। আজ আমি যাই'—তারিণী আবার কথা বলে। 'পুরো একটা দিন আপনি পাচ্ছেন। খুব ভাল করে চিন্তা করে করে জবাব দেবেন। কেমন?...একদিন কেন? আপনি সাতদিন সময় নিন। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তারপর বলবেন।'

সুন্দর রাঘবনের মস্তিষ্কের মধ্যে কয়েক শত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিশাচের অনুপুঞ্জ অনুপ্রবেশ করেছে। তারা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে আর অট্ট হাহাকারে হাসছে। হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে সে—'যেও না, তারিণী। যেও না। কিছু বলে যাও। আমাকে বলে যাও। নয়তো পাগল হয়ে যাব।'

তারিণী আবার ফিরে এসে বসল। বলল—'এত অস্থির হবেন না রাঘবন। শান্ত হোন, ধৈর্য ধরুন। বলবার আর কী আছে? তবু যদি সব শুনতে চান...বলছি।'

রাঘবন আরো একবার ভাল করে তারিণীর দিকে তাকায়। তারপর টেবিলের ওপর মুখ রেখে হু হু করে কেঁদে ওঠে।

তারিণী আস্তে আস্তে সান্ত্বনার সুরে বলে—'আপনি শিক্ষিত মানুষ। কত পড়াশুনা করেছেন। বিধির বিধান কি কেউ কোনদিন লঙ্ঘন করতে পেরেছে? যা ঘটে গেছে, তা গেছে। অতীতকে স্মরণ করে কান্নাকাটি করে কি লাভ আছে?'

রাঘবন মাথা তোলে। বলে—'যে-বিধাতার দোহাই দিচ্ছ তারিণী, তিনি আমায় কেন বাঁচিয়ে রাখলেন বলতে পার? এই দুর্ভাগ্যের সাক্ষী হবার জন্যে! সেবার কলকাতায় মরে যেতে পারতাম তো।'

তারিণী বললে— নিয়তিকে জয় করবার শক্তি না দিলেও, কঠিনতম সংকট আর গভীরতম দুঃখ সহ্য করবার শক্তি ভগবান আমাদের দিয়েছেন। যে গান্ধীজীকে হারিয়ে সমস্ত পৃথিবী আজ হাহাকার করছে, দেখবেন একমাস যেতে না যেতেই তাঁকে ভুলে যাবে। সবাই যে যার কাজে মত্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীতে শাশ্বত সুখ বা শাশ্বত দুঃখ বলে কিছু নেই। ভগবানকে ধন্যবাদ তিনি আমাদের দুঃখ ভোলবার শক্তি দিয়েছেন।

'ভগবানের নাম নিও না,' রাঘবন বলে, 'আমি হলফ করে বলতে পারি ভগবান বলে কেউ নেই। তোমাকে এইরূপে দেখার পর আমার সব বিশ্বাস লোপ পেয়েছে।'

'আমার তো এই রূপহানির পরেই আমার ভগবানে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। তাঁর অপার করুণাতেই আমি আমার মাকে আর মেয়েকে— বাসন্তী তো আমারই মেয়ে— ঠিক সময়মত বাঁচাতে পেরেছি। ঠিক সময়ে না গিয়ে পড়লে তাদের প্রাণ বাঁচত না। তাদের বাঁচাতে গিয়েই হাত গেছে, চোখ গেছে শাবলের ঘায়ে মুখের চেহারাই বদলে গেছে। তবু তো আমার রূপের বিনিময়ে আমি আমার পালয়িত্রী ধাই মাকে আর প্রাণপ্রিয় বোনের একমাত্র সন্তানকে মরণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছি। এটা তো সেই ভগবানেরই করুণা!'

এর পর তারিণী রাঘবনকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনায়। রজনীপুর এস্টেটের মসজিদে কয়েকজন মহিলা বাঁচবে বলে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা মসজিদের দোর বন্ধ করে ভেতরে ছিল। কিন্তু রক্তলোলুপ উন্মাদরা মসজিদে আগুন লাগিয়ে আটকাপড়া মেয়েমানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারবার আয়োজন করে। তারিণী একা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ততক্ষণে জানতে পেরে মহারানী একদল ফৌজ নিয়ে এসে পরেন এবং অসহায় নারীদের সযত্নে রক্ষা করেন।

এ খবর রাঘবন কাগজে পড়েছিল। পড়ে সেদিন রজনীপুরের রানীর উপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল— অত্যাচারী মুসলমানদের

মসজিদ রক্ষা করতে যাওয়া কেন ঘটা করে? আজ তারিণীর মুখে সব কথা শুনে তার অন্তরে আকস্মিক পরিবর্তন আসে।—হে ভগবান! ঐ মসজিদের ভেতরেই আমার বিপন্ন সন্তান ছিল। তুমিই তাকে রক্ষা করেছ। তুমি সত্যিই দয়াময়।

এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে ওঠে।

তিপ্পান্ন

তারিণীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর রাঘবনের হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। সেই ব্যাকুলতা থেকে সে যেন কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছিল না। টেলিফোন বেজে উঠে ওকে বাঁচিয়ে দিল। ও যেন কথা বলতে পেয়ে বেঁচে গেল।

'এই অসময়ে কে আবার টেলিফোন করে?'

রাঘবন বিরক্ত স্বরে টেলিফোনের রিসিভার তুলে প্রশ্ন করে—'কে বলছেন?'

টেলিফোনে সম্ভবত ওর জন্যে এক অবিশ্বাস্য বার্তা অপেক্ষা করছিল। কারণ কথা শুনতে শুনতে ওর মুখে ভাবের বিচিত্র সব রঙবদল দেখা যাচ্ছিল। কথা শেষ করে টেলিফোন হুকে রেখে দিয়ে এসে রাঘবন তারিণীকে বলে—'শুনেছ তারিণী। সীতার জলে ডুবে মরার কথা নাকি সর্বৈব মিথ্যে। বুঝতে পারছি না সূর্য আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলল কেন? তুমি ভামাকে চেন তো— দেওয়ান সাহেবের মেয়ে? সীতা ওদের বাড়িতেই আছে। সূর্যও সেখানে। ভামা আমায় এক্ষুনি চলে যেতে বলছে। তুমিও কি—'

রাঘবন কথা অসম্পূর্ণ রাখে।

তারিণী সব বোঝে। রাঘবের গলায় ব্যগ্র উদ্দীপনার যে আভাস, সীতাকে ফিরে পাবার আনন্দই তার একমাত্র কারণ নয়। নষ্ট চোখ, কাটা হাত এক ঘোর কুরূপা নারীকে বরণ করার প্রস্তাব বিবেচনার হাত থেকে বাঁচার স্বস্তিও একটা কারণ।

তারিণী বলে—'হ্যাঁ, আমিও যাব।'

রাঘবন দ্রুত গাড়ি বার করে। তারিণী আজ পেছনের সীটে

গিয়ে বসে। গাড়িতে যেতে যেতে রাঘবন টেলিফোনে শোনা কথাগুলো তারিণীকে শোনায় :

'সীতা আর তার বাবা এযাবৎ পানিপথেই ছিল। আজ গান্ধীজীর অন্তিম দর্শনের জন্যে সূর্য সীতাকে দিল্লী নিয়ে এসেছিল। ভিড়ে দুজনে আলাদা হয়ে যায়। এক সময় সূর্য ভিড়ের মধ্যে ভামাকে দেখতে পেয়ে তাকে সব কথা বলে. দুজনে তখন ভামার বাড়িতে এসে পুলিশকে টেলিফোন করবে ঠিক করে। ভামার বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দেখে সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। ওরা তাকে তুলে ভেতরে গিয়ে ডাক্তার ডাকিয়েছে। ভগবানের করুণাই বলব একে, কী বল তারিণী—যে আজই সীতাকে পাওয়া গেল!'

গাড়ি ভামার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। গাড়ির আওয়াজ শুনে ভামা আর সূর্য দুজনেই এসে সদরে দাঁড়াল। রাঘবনের হাত ধরে 'আসুন শীগ্গির' বলে ভামা তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। রাঘবন ভেতরে যেতে যেতে সূর্যকে বলে গেল—'তুমিও খুব ধোঁকা দিয়েছিলে, সাহেব। যাও গাড়িতে তারিণী বসে আছে। দেখা করো।' সমস্ত ব্যগ্রতার মধ্যেও রাঘবনের মন এ কথাটা ভাবতে ভোলে না যে তারিণীর সাম্প্রতিক বীভৎস কুরূপতা দেখে সূর্যের মানসিক অবস্থা কী রকম হবে।

সূর্যকে গাড়ির দিকে আসতে দেখেই তারিণী জিজ্ঞেস করে—'সীতার শরীর এখন কেমন?'

সূর্য বলল—'ডাক্তার বলেছে ও আর বাঁচবে না। এখন একটু জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান হতেই তোমার আর বাসন্তীর নাম করছিল।'

তারিণী বলল—'তবে তো এক্ষুনি গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে আসতে হয়। আমাদের পুরনো বাড়িতে রয়েছে। তুমিও আসবে নাকি?'

সূর্য বললে— 'নিশ্চয়। বেচারা রাঘবন। সীতার অন্তিম সময়টাতে অন্ততঃ তার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলে নিক। ডাক্তার ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ঠিক করছেন।'

রাঘবন সীতার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। আর মুখ থেকে বারবার চাপা কান্নার আওয়াজ বেরোচ্ছে।

সীতা স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়, তার জিভটা এড়িয়ে যাচ্ছে— 'তুমি কাঁদছ কেন? এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার আর কী হতে পারে? আমি তো এই দিনটির জন্যে কত তপস্যা করেছি যে মাতা কস্তুরবার মত আমিও স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরতে পারি। আমার সেই তপস্যা আজ সার্থক হয়েছে। তুমি আমার সৌভাগ্যে আনন্দ করো। কেঁদো না তুমি।'

সুন্দর রাঘবন দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। বললে— 'সীতা! অমন কথা মুখে এনো না। তোমার কিচ্ছু হয়নি। তুমি খুব শীগ্যিরই সুস্থ হয়ে উঠবে। আবার চলা-ফেরা করবে।'

'না আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। জানি না কেন আমার মন বলছে— আর বাঁচব না। তারিণী দিদি কোথায়? তাকে একটু ডাক না!'

রাঘবন বললে— 'তারিণী বাসন্তীকে নিয়ে আসতে গেছে। তুমি যা ভাবছ তেমন কিছুই হবে না। সীতা! আমায় একা ফেলে তুমি চলে যাবে তা নিশ্চয় ভগবানের ইচ্ছে নয়।' মনে মনে প্রার্থনা করে রাঘবন— 'হে ভগবান। এইবারটি তুমি সীতাকে বাঁচিয়ে দাও। আমার আচরণের ত্রুটি শুধরে নেবার আর-একটা সুযোগ দাও। আমি আর কখনো স্বার্থপরের মত ব্যবহার করব না। সীতাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখব।'

সীতা বললে, 'আমার মনের একটা অভিলাষ আছে। তুমি সেটা পূর্ণ কোরো। আমি চোখ বোজার পরে তুমি আমার বোন তারিণীকে বিয়ে কোরো। সে আমায় কথা দিয়েছে। সে কখনো কথার খেলাপ করবে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যে তারিণী আর সূর্য বাসন্তীকে নিয়ে ফিরে এল। সীতা দুর্বল হাত বাড়িয়ে মেয়েকে নিজের কাছে টানবার চেষ্টা করল।

কিন্তু তার হাতে আর বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। তাই দেখে তারিণী মেয়ের মুখ মায়ের মুখের কাছে তুলে ধরে।

সীতা এবার চোখ তুলে দেখে। বোরখায় ঢাকা নারীমূর্তিকে চিনতে পারে না। বলে— 'এ কে?'

তারিণী বলে— 'আমায় চিনতে পারলে না সীতা?'

কণ্ঠস্বরে সীতা তারিণীকে চিনতে পারে। বলে— 'দিদি! এসে গেছ? এসো আমার কাছে এসো। আঃ বুকটা আমার যেন ঠাণ্ডা হল এতক্ষণে। তুমি এঁর সঙ্গে যখন কথা বলছিলে আমি লুকিয়ে সব শুনেছি। এখন আমার কোন চিন্তা রইল না।... কিন্তু অমন মুখ ঢেকে বসেছ কেন দিদি? পরদাটা খুলে ফেল। মরবার আগে তোমার মুখটা একবার দেখে নিই। তোমার মুখটা দেখে, ঐ মুখটা মনে করতে করতে আমি ইহলোক ছেড়ে যেতে চাই।'— বলতে বলতে সীতার চোখদুটো আপনিই বুজে যায়।

তারিণী বললে— 'সীতা। আমার মুখের ঢাকা খুলে ফেলছি। তুমি একবার চোখ ভরে আমার মুখটা দেখে নাও। কিন্তু দেখে যেন ভয় পেয়ো না বোন। তোমার মেয়ে বাসন্তীকে বাঁচাতে গিয়েই আমার এই দশা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে কোন কষ্ট নেই। তুমি কষ্ট পেয়ো না।'

তারিণীর এত কথার কিছুই আর সীতার কানে পৌঁছল না। সীতার ইন্দ্রিয়গুলি তখন সম্ভবতঃ ওপরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সীতা একবার চোখ মেলে। বোরখা খোলা তারিণীর মুখের ওপর রাখে। সীতার মুখে নিবন্ত দীপশিখার শেষ উজ্জ্বল জ্যোতি। আগের চেয়ে স্তিমিত অথচ অপূর্ব আনন্দময় স্বরে সীতা বলে— এই তো দেখতে পাচ্ছি। দেখি দেখি! সেই সুন্দর মুখটা আমার বোনের। আগের চেয়ে আরও সুন্দর হয়েছে। তুমি তো রূপের খনি। তোমায় দেখে উনি যে মুগ্ধ হয়েছিলেন সে তো স্বাভাবিক। তোমায় দেখে যে মুগ্ধ হয়েছে, সে আমায় ভালবাসতে পারবে না এতে আশ্চর্য কী। আমি বড়ই ভাগ্যবতী। আমার কারুর ওপর

কোন নালিশ নেই। কোন ক্ষোভ নেই। বড় শান্তি নিয়ে আমি যাচ্ছি আমার জন্যে কেউ দুঃখ কোরো না। সূর্যটা পাগল। আমার জন্যে দুঃখ পাবে, চোখের জল ফেলবে। ওকে দেখো। ওকে শান্ত কোরো।”

সীতার মুখে নিজের নাম শুনে সূর্য তার মুখের ওপর ঝুঁকে বলে—‘সীতা! এই যে আমি!’

ক্ষীণতম কণ্ঠে সীতা শেষবারের মত কথা বলে—‘সূর্য! আমি অভাগিনী। তুমি শীগ্যির বিয়ে করে ফেলো।’

সীতা ভাগ্যবতী!

সূর্য ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সুন্দর রাঘবন গুমরে গুমরে কাঁদছে। তারিণী আর বাসন্তী অসহ্য ব্যথায় আছড়ে পড়ে কাঁদছে। এখন এসব কান্না সীতার কানে আর পোঁচচ্ছে না। তার ইন্দ্রিয় আর সাড়া দিচ্ছে না। তার প্রাণ অনিত্য শরীরের মায়া কাটিয়ে অনন্ত আকাশের পথে চলে গেছে। উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে, পার্থিব মালিন্যের বহু উর্ধ্বলোকের আকাশে, ইন্দ্রধনুর বর্ণস্রোতে অবগাহন করে—শ্বেত মেঘপুঞ্জের সমুদ্রে স্নান করে— নন্দনের পরিমলে প্রসাধন সেরে সীতার বিমুক্ত আত্মা অনন্ত গীতলহরীর সুষমা পান করতে করতে চলে যাচ্ছে।

সীতার আত্মাকে ঘিরে সুরলোকের পারিজাত মন্দার পুষ্পবর্ষণ হতে থাকে। আরো উর্ধ্বে গাঢ় নীল আকাশ। নিঃসীম নীল আকাশ! অনাদি অনন্ত নীলের প্রবাহ। সেই নীলের অনঙ্গে মিলে মিশে একাকার অভিন্ন হয়ে যায় পৃথিবীর সীতার লোকোত্তর আত্মা! নিঃসন্দেহে সীতা পরম ভাগ্যবতী!

চুয়ান্ন

দেবপট্টণমের রথবীথির ওপরে যে দুটি দোতলা বাড়ি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে, আজকাল তার দরজায় আগের-নেমপ্লেট দুটি আর দেখা যায় না। এডভোকেট আত্মনাথ আয়ারের অনুসরণ করে তাঁর একান্ত সুহৃদ দামোদরম পিল্লেও পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন। সেখানের উচ্চ আদালতে ওঁরা দুজনেই ওকালতির পেশায় লেগে গেছেন কিনা ঠিক বলা যাচ্ছে না।

পিতার মৃত্যুশয্যায় অমরনাথ দেবপট্টণমে এসেছিল। তারপর আর কলকাতায় ফিরতে মন চায়নি তার। তারা দুই বন্ধুতে স্বাধীন দেশের আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় কোন স্বাধীন শিল্প-প্রচেষ্টার কথা চিন্তা করছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ গান্ধীজীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে তারা মুষড়ে পড়ল। তার পরেই সীতার মৃত্যুর খবরে তাদের শোক দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

কলকাতার রাস্তায় মূর্ছিতা সীতাকে বাঁচানোর পর থেকে অমরনাথ আর চিত্রার সঙ্গে সীতার এমন নিবিড় অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল যেন ওরা পর নয়, ঘরের লোক। পট্টভির জনসেবার জীবনে সীতার ভূমিকা ছিল অনবদ্য ও অবিচ্ছেদ্য। কাজেই সীতার অকালবিয়োগে ওরা দুই বন্ধুই শোকসন্তপ্ত হবে এ তো স্বাভাবিক। সীতার নানা সদ্‌গুণ আর কিছু অসদ্‌গুণ নিয়ে ওরা দুই বন্ধু আলোচনা করছিল। এতে দুঃখ ভুলতে সাহায্য করে।

দুই বন্ধুর দুই সহধর্মিণী চিত্রা আর ললিতা কিন্তু স্বীকারই করে না যে সীতার কোন দোষ থাকতে পারে। ললিতা আজ সমস্ত অপরাধ নিজের ওপর নিয়ে নিজেকেই দোষারোপ করে আর বারবার নিজের

কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা করে। সীতার সমস্ত ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্যে আপনাকে দায়ী করে ললিতা চোখের জল ফেলে। আসলে সুন্দর রাঘবন তো তাকেই দেখতে এসেছিল। সীতাকে তো ললিতাই জোর করে তার চোখের সামনে তুলে ধরেছিল। রাঘবনের স্ত্রী হলে ললিতাকে যত কষ্ট আর বিপত্তি সইতে হত, সীতাই তাকে বিয়ে করে ললিতার জন্যে বিধি-নির্ধারিত সব দুর্ভাগ্য নিজের মাথায় নিয়েছিল। শুধু কি তাই, দেবপট্টণমে এসে থাকাকালে সীতার মনে কত জ্বালা কত যন্ত্রণা ছিল। একদিনও কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। কত কর্ম কত কোলাহল— সব হাসিমুখে সহ্য করেছে। ললিতাই বরং ভুল বুঝে তার মনে আরো কষ্ট দিয়েছে। সেসব দিনের কথা ভেবে অশ্রুপাত করে ললিতা। চিত্রা তাকে কত বোঝায়, সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু ললিতার মন মানে না। সে বারবার একই কথায় ঘুরে ফিরে আসে। বলে— 'চিত্রা। তুমি যতই বোঝাও আমার মন মানবে না। বেচারী সীতা সারাটা জীবন দুঃখ পেয়েই গেল।' তখন চিত্রা বলে— 'এটা তোমার ভুল ললিতা। আমিও সীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছি। তার অনেক কথাই আমি জানি। জীবনভর শুধু দুঃখই পেয়েছে সে, এমন নয়। সুখও পেয়েছে অনেক। সুখ দুঃখ দুইই সে ভোগ করেছে চূড়ান্তভাবে। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন জান?— সুখে দুঃখে গড়া জীবনই প্রকৃত জীবন। কাব্য, ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস— সর্বত্রই তুমি তাই দেখবে। নায়ক বা নায়িকার জীবনে দুঃখ তো অনিবার্য।'

ললিতা বলে— 'চিত্রা, সীতার জীবনটাও যেন একটা কাহিনী, না? তুমি জান না। সীতা ছোটবেলা থেকেই গল্পের নায়িকা হবার স্বপ্ন দেখত। রাজমপেট্টাইয়ে থাকতে আমায় কত প্রেমের গল্প শোনাত। লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট, নলদময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, আনারকলি— সব গল্পই আমার তার মুখে শোনা। আমাদের বিয়ের আগের দিন সন্ধেবেলাও আমরা দীঘির পাড়ে বসে বসে গল্প করেছি। গল্প বলতে বলতে কতদিন সীতা গল্পের নায়িকার

সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। অনেক সাধ, অনেক সুখস্বপ্ন ছিল বেচারীর। সব অপূর্ণ রেখে তাকে চলে যেতে হল।'— বলতে বলতে ললিতা কেঁদে ফেলে।

চিত্রা দুঃখ ভোলাবার জন্যে বলে— 'ললিতা, তুমি কেবল সীতার দুঃখেই কাঁদছ। কিন্তু তার সেই বড়বোন, তার দুঃখও তো কম নয়। অমন রূপসী মেয়ে— এক চোখ আর এক হাত খুইয়ে সে আজো বেঁচে রয়েছে। কী শোচনীয় দশা তার একবার বোঝ তো। তার প্রতি সহানুভূতি নেই তোমার?' ললিতার কান্না সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। বলে— 'চিত্রা। দুঃখ আমার তার জন্যেও খুব। আজো আমার সেই পিসতুতো বোনকে আমি চোখে দেখিনি। শুনেছি সে নাকি অসামান্য সুন্দরী ছিল। আর আমি যখন তাকে প্রথম দেখব তখন তাকে কী অসহ্য কুৎসিত চেহারায় দেখতে হবে— ভেবে আমার বুক ফেটে যায়।'

'শুধু মনে কষ্ট পেও না ললিতা! তোমার ভাই সূর্যকে দেখে শেখো। কী ধীর অপ্রমত্ত অন্তর। কুরূপা অঙ্গহীনা মেয়েকে বীরের মত জীবনসঙ্গিনী করে নিচ্ছে। তোমার স্বামীই বল, আর আমার স্বামীই বল— এরকম অবস্থায় ছুটে পালাত।'

'সে কথা তো সত্যি চিত্রা! কিন্তু সূর্য কি কাজটা ভাল করছে? আমার কী জানি ভাল লাগছে না। এ কীরকম বিয়ে বল তো? এক চোখ এক হাত এমন মেয়েকে বিয়ে করার কী দরকার ছিল তার? মা তো এ কথা শুনলে বাঁচবেই না।'

'না বাঁচে না বাঁচুক। দুনিয়ায় সবাই একদিন মরবে। প্রতিনিয়ত হাজার হাজার লোক মরছে। মহাত্মা গান্ধীর মত মানুষই মরে গেল। তোমার মা বেঁচে না থাকলে জগতের কোন্ ক্ষতিটা হবে? সূর্যর মতন ছেলে পেয়েছিলেন বলে তাঁর ধন্য মানা উচিত। তা যদি তিনি বুঝতে না পারেন তো সে দোষ কার? তুমিও তোমার মার দুঃখে কাঁদছ! তোমার বদলে আমি যদি অমন ভাই পেতাম তো গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়াতাম।'— চিত্রা উত্তেজিত সুরে বলে।

রাজমপেট্টাই গ্রামের দীর্ঘ সড়কের দুপাশে বড় গাছের ঘন ছায়া এখনো আগের মতই আছে। ডাকঘরটাও অবিকল সেই পনেরো বছর আগের মতই রয়েছে। বিশ্বের সমস্ত রদবদলকে উপেক্ষা করে রাজমপেট্টাইয়ের বামুনপাড়া— অগ্রহারমও ভারতের সব পল্লীগ্রামের মতই অপরিবর্তনীয় পুরাতনকে আঁকড়ে রয়েছে। পরিবর্তন বলতে একটাই লক্ষ্য করা যায়— সেদিনের সেই জৌলুস আর নেই। প্যাটেল কিট্টবায়ার নেই। তাঁর ছেলে শুণ্ডু ওরফে শ্যামসুন্দরই এখন গ্রামের মোড়ল।

ললিতা মাকে দেখতে বাপের বাড়ি এসেছে। দরজায় ডাকপিওন আসার সাড়া পেয়েই সে ছুটে যায় ডাক আনতে। তার এই স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। চিঠি লিখেছে তার স্বামী। সকলের কুশলপ্রশ্নের পর লিখেছে : 'শুনলে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে এমন একটা কথা জানাচ্ছি। দেখো যেন মাথা ঘুরে পড়ে যেয়ো না। তোমার ভাই সূর্য এসেছে। সঙ্গে তার নবপরিণীতা স্ত্রী। তার বউকে দেখলে আরো অবাক হবে। ভাবছ ঠকাচ্ছি। সব কথা চিঠিতে লিখব না। নিজের চোখেই দেখবে। আমরা তিনজনেই কাল যাচ্ছি।'

চিঠি পড়ে ললিতার মন অধৈর্য হয়ে পড়ে। এবার বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যেই ওর আসা যে মাকে সূর্যর বিয়ের খবরটা আগেভাগে দেবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আর বলা হয়নি। ওর ঠিক সাহসে কুলোচ্ছিল না। কিন্তু আর তো চেপে রাখা যায় না। এবার বলে ফেলতেই হয়। কাল ওরা এসে পড়ছে।

শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে ললিতা বলেই ফেলে খবরটা : সূর্যর বিয়ে হয়ে গেছে। বউ নিয়ে কাল আসছে।

শুনে সরস্বতী আম্মাল স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

'কী বললি? সূর্যর বিয়ে হয়ে গেছে? আমায় একবার না জানিয়ে সূর্য বিয়ে করল? এ কি কখনো হয়? কী রকম মেয়ে, জানলুম না, শুনলুম না— কী বলছিস তুই?'— সরস্বতী বিহ্বল হয়ে পড়েন।

ললিতা বললে—'আমিও আগে জানতুম না মা। খবরটা আমি আগেই শুনেছি! কিন্তু সত্যি বলে বিশ্বাস করিনি। এখন দেখছি সত্যিই।'

'একবার বলছিস জানতিস না। আবার বলছিস আগে শুনেছিস। ব্যাপারটা কী বল্ তো।'— মা জিজ্ঞেস করেন।

তখন ললিতা সব বলে— 'সূর্য যাকে বিয়ে করেছে, শুনছি সে মেয়েটা নাকি অঙ্গহীন। কেউ বলছে একটা চোখ নেই। আবার কেউ বলছে একটা হাত কাটা। সূর্যর সব কাজই এইরকম। তার মাথামুণ্ডু খুঁজে পাই না। তোমায় কী বলব বল। শুনে এস্তক আমার নিজেরই মন হতভম্ব হয়ে গেছে।'

'একী অন্যায় কথা। এরকম কাজ কোন ছেলে করে কখনো? বাপের জন্মে শুনিনি। হ্যাঁরে ললিতা, সত্যি? আমি কি মাথা খুঁড়ে মরব? পাঁচজনের সামনে মুখ দেখাব কি করে?' ললিতার মার গলা ধরে যায়। তিনি চোখে আঁচল চাপা দেন।

যথাসময়ে পট্টভি, সূর্য আর সূর্যর স্ত্রী গরুরগাড়ি থেকে নামে। ললিতা ছুটে যায়। তারিণীকে দেখার জন্য তার মন অধীর হয়ে ছিল। সে কষ্ট করে নিজের মনকে প্রবোধ দিচ্ছিল। তবু মন মানছিল না। আরো একটা অস্থিরতা তার মনকে অশান্ত করছিল। মা যদি বেঁকে বসেন, তখন কী হবে?

পট্টভি আর সূর্য আগে নামল। তারপরে নামল একজন মহিলা। একজনই মহিলা! ললিতা আশ্চর্য হয়ে গেল। তার আশঙ্কা অমূলক। তার প্রত্যাঘাত নিষ্ফল। দুহাতে দুটি বাক্স নিয়ে নামছে মহিলা। দুচোখ মেলেই তাকাচ্ছে। কোথাও কোন বিচ্যুতি দেখছে না তো! ব্যাপারটা কী? কানা-খোঁড়া-নুলো কিছুই তো নয়। সর্বাঙ্গে কোথাও নেই কোন সামান্যতম বিকৃতি! শুধু একটু বেশিমাত্রায় আধুনিক। সাজসজ্জায় পাশ্চাত্য প্রভাব। কে এ?— ললিতা আবার ভাবে তবে হয়তো তারিণী এখনো নামেনি। এইবার

নামবে। কিন্তু আর কেউ নামল না। ললিতা সবাইকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতর।

একফাঁকে সূর্যকে ললিতা ধরল— 'এই। এ মেমসায়েবটা কে রে? তুই যে লিখেছিলি...'

'মেমসায়েব কী রে? ঐ তো আমার বউ। দেওয়ান আদিবরাহ আচার্যের কন্যা— হুঁ বাবা! ওর নাম ভামা। এই তো সবে দু হপ্তা হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমরা 'মধুচন্দ্রিমা'—মানে 'হনিমুন' আর-কি— করতে এসেছি।'— ললিতার হাঁ করা মুখের ওপর সূর্য তার কথার চুবড়ি উপুড় করে দেয়।

নিরিবিলিতে ললিতাকে ডেকে সূর্য বলে— 'তুই বুঝি খুব নিরাশ হয়ে পড়েছিস? নিরাশ আমিও কম হইনি প্রথমটায়। তবে ধোঁকা তারিণী দেয়নি। জগৎশুদ্ধ লোককে এবার ধোঁকা দিয়েছে সুন্দর রাঘবন। তারিণী তাকে অনেক বুঝিয়েছিল। বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাঘবন কোন ওজর-আপত্তিতে কান দেবে না। তার এক কথা— সীতার অন্তিম নির্দেশ। মৃত্যুশয্যায় তার কাছে কথা দেওয়া হয়েছে, তার নড়চড় হবে না। বাধ্য হয়ে তারিণীকে মত দিতেই হল। কী আর করবে? সেও যে কথা দিয়েছিল সীতাকে। আসলে কী জানিস ললিতা! ওরা দুটোই পরস্পরকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসত। এটা বুঝতে পেরেই আমিও পথ থেকে সরে দাঁড়ালুম। ভাল করিনি? ওদের বিয়েটা দিয়েই এলুম। রাঘবন চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। বাসন্তীকে নিয়ে ওরা দুজনে রজনী-পুরে চলে গেছে। রজনীপুরের রাজ্য ভারত ইউনিয়নেই এসে গেলেও রানীর নিজের নামে মেলাই জায়গাজমি রয়ে গেছে। তারিণীকে রানীসাহেবা মেয়ের মতন ভালবাসেন। তিনি ওদের দুজনকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন— পাঞ্জাবের শরণার্থীদের সাহায্য করার কাজ করতে। ওদের সংসার পাতার পুরোপুরি সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন। বলছেন তাঁর জমিজায়গা সব নাকি তাদের নামে লিখে দেবেন।'

ললিতা বললে—'সে তো হল। তা এ মেয়েটাকে কোথায় বাগালি ?'

'আরে আগে আমি একে দুচক্ষে দেখতে পারতুম না। আমার খারাপ ধারণাটা বদলে দিল তারিণী। 1942 আন্দোলনের সময় ভামা সরকারী মহলে যাতায়াত-যোগাযোগ রাখত আর গোপনে বিপ্লবীদের প্রয়োজনীয় খবরাখবর দিত, সব রকমে সাহায্য করত। তারিণীকে বরাবর পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমি আগে জানতাম না। কেউ কিছু জানত না। সেবার যখন পুলিসপাহারা থেকে পালাই, তখনই জানতে পারি—পেছনে ভামারই হয়তো হাত ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, পাঞ্জাবের দাঙ্গার সময়ে সীতা আর তার মেয়েকে বাঁচাবার কাজে জীবন বিপন্ন করেছিল ও। পরে ওর সঙ্গে মেলামেশা করে বুঝলাম চিন্তাধারায় আমাদের অজস্র মিল। ঐ বাইরের খোলস দেখে ভুল করিসনি। মিশে দেখ্। তোর বৌদির গুণাগুণ তুই নিজে বিচার কর-না।'

বৈষয়িক কাজে প্যাটেল শ্যামসুন্দর বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে ভাই-ভাজকে দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল। বললে—'রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছ, না দুটো দিন থাকবার ইচ্ছে আছে ?'

সূর্য বললে— 'তুই মেরে না তাড়ালে আর নড়ছি না। দেশ মুক্ত হয়েছে। এখন দেশের প্রাথমিক সমস্যা— অন্নবস্ত্রের। কৃষি আর শিল্পের সেবায় এখন নামা দরকার। 'কাঠবেড়ালের ক্ষুদ্র সেবা' আমার গ্রাম থেকেই শুরু করব ভাবছি। তার প্রথম পদক্ষেপই হবে চাষীদের উৎসাহ দেওয়া।'

শ্যাম বললে— 'আজকাল এ অঞ্চলে কিষানদের উপদ্রব কমে গেছে। নেই বললেই হয়। কৃষক-আন্দোলনের নেতামশাই, কিষান সংঘের পাঁচ হাজার টাকা মেরে চম্পট দিয়েছেন। সেই থেকে আন্দোলন বন্ধ। এখন তুমি যদি আবার শুরু কর তো মাথা চাড়া দিতে পারে।'

সূর্য— কিষাণ আন্দোলন চাপা পড়ে গেছে বলে খুশি হয়ে ওঠার

কারণ নেই শুণ্টু। চাষীদের উৎসাহ দিতে হবে, তাদের পরি-পোষণের কাজ করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে তাদের মেহনতের ফল তারা ভোগ করতে পারছে। না হলে আজ নয় কাল আবার বিরোধ বাধবে। কৃষিব্যবস্থায় আমি কিছু নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখাব যে এটাও লাভজনক ব্যাবসা। তোর বৌদিও এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে। তুই কী বলিস?

শ্যাম— আমি কী বলব ছোড়দা? তুমি যদি বাড়িতে থাক, এখানে-ওখানে চলে না যাও, তবে তার চাইতে খুশির কী আছে বল? তুমি বল তো আজই আমার সমস্ত জমিজায়গা আমি চাষীদের বিলিয়ে দিতে পারি, আমি যে-কোন জায়গায় গিয়ে কিছু করে রোজগার করে চালিয়ে নেব।

সূর্য বললে— 'সম্ভবতঃ সে দিনও আসছে, যখন চাষীরাই জমির মালিক হবে। তার জন্যে আমাদের তৈরী থাকা উচিত। তাই অন্য হাতের কাজ শেখাও দরকার আমাদের।'

সরস্বতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন— 'আর কটা দিন সবুর করো। আমি চোখ বুজলে, যার যা খুশি কোরো।'

সূর্য বললে— 'আমরা নাহয় সবুর করলাম। ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান, প্রলয়— এরা তো সবুর করবে না মা!'

ললিতা বললে— 'প্রলয়ের কথা বললে সীতার কথা মনে পড়ে। কেবলই বলত— 'কানে ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনছি।' ওর কি কানে কোন দোষ ছিল?'

সূর্য বলে— 'কানের দোষ কি মনের ভুল জানি না। না কি বিপদের আগে কোন দৈবশক্তি তাকে ঐভাবে পূর্বাভাস দিত তাও বলতে পারি না। শেষবার চেনাব নদীতে ডুবে যাবার পর থেকে কানটা একেবারে ওর নষ্ট হয়ে যায়— দিনরাত ঢেউয়ের শব্দ শুনত। কিন্তু গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের পরদিন তার শ্রবণশক্তি ফিরে আসে। সব প্রথমে মহাত্মাজীর প্রিয় মীরার ভজন শুনতে শুনতে কানে সাড় আসে।'

ভাবলে মনে হয় এটাও শুভ সূচনা। নিজের মহাজীবন বিসর্জন দিয়ে, বলিদান দিয়ে সেই সর্বত্যাগী মহান দেশপ্রেমিক সম্ভবতঃ এ-দেশকে সম্ভাব্য সংকট থেকে, বিপত্তি থেকে শেষবারের মত রক্ষা করে গেলেন।

হে মহান দেশপ্রেমিক ত্যাগী পুরুষ, ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

—